কোয়ান্টাম ভাবনা

সাফল্যগাথা



কোয়ান্টাম ভাবনা সাফল্যগাথা
একটি সংকলন-গ্রন্থ।
দেশের বরেণ্য ও প্রাজ্ঞজনেরা
নানা সময়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যক্ত
করেছেন তাদের বিশ্বাস ও
উপলব্ধির কথা–যেখানে উঠে এসেছে
ধ্যান ধর্ম বিজ্ঞান লোকাচার নৈতিকতা
মূল্যবোধ এবং আমাদের চিরায়ত
ঐতিহ্য ও সামাজিক-অর্থনৈতিক-
জাতিগত সম্ভাবনাসহ
বিচিত্র সব বিষয়।

এর পাশাপাশি শূন্য থেকে
যাত্রা শুরু করে যারা ধাপে ধাপে
এগিয়ে যাচ্ছেন পূর্ণতার পথে–
সেইসব অদম্য মানুষের
বিস্ময়কর সাফল্যের গল্পও
স্থান পেয়েছে এ অনবদ্য সংকলনে।

বইটি পড়তে পড়তে আপনিও
ক্রমশ ঋদ্ধ হয়ে উঠবেন তাদের
জীবন-অভিজ্ঞতার আলোয়।
প্রাণিত হবেন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে।
বদলে যাবে আপনার জীবন।

কোয়ান্টাম ভাবনা
সাফল্যগাথা
২

সংকলন ও সম্পাদনা
ডা. আতাউর রহমান

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম ভাবনা
সাফল্যগাথা ২

সংকলন ও সম্পাদনা

ডা. আতাউর রহমান

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৯৩৫৫৭৫৬, ০৯৬১৩-০০২০২৫
০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
E-mail : info@quantummethod.org.bd

গ্রন্থস্বত্ব

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

প্রথম প্রকাশ

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬
(মহান ভাষাশহীদ দিবস স্মরণে)

প্রচ্ছদ

মাসুম রহমান

মুদ্রাকর

উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার
ইসলাম ভবন (২য় তলা)
৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য

২৩৫ টাকা

Quantum Bhabna Safalyagatha 2
(Quantum Life Lessons & Success Stories 2)

Published by

Quantum Foundation
quantummethod.org.bd

Price : $25

উৎসর্গ

কোয়ান্টাম সাফল্যযাত্রার দু-যুগে
জীবন বদলের বিজ্ঞানকে
যারা লক্ষ মানুষের কাছে
পৌঁছে দিয়েছেন,
তাদের উদ্দেশ্যে ---

সূচিপত্র

(এই বইয়ে প্রকাশিত সকল মতামত ও অনুভূতি আলোচকের নিজস্ব)

কোয়ান্টাম ভাবনা

ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম ॥ ১১
জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান ॥ ১৫
জাতীয় অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিক ॥ ১৭
অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান ॥ ২১
সৈয়দ শামসুল হক ॥ ২৩
অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ॥ ২৭
মুস্তাফা মনোয়ার ॥ ৩১
অধ্যাপক ড. জামাল নজরুল ইসলাম ॥ ৩৩
অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম ॥ ৩৬
অধ্যাপক আবু আহমেদ ॥ ৪০
কামাল লোহানী ॥ ৪৪
সৈয়দ আবুল মকসুদ ॥ ৪৮
কাজী আনোয়ার হোসেন ॥ ৫১
অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ ॥ ৫৫
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ॥ ৫৯
ডা. সামন্ত লাল সেন ॥ ৬৩
আনোয়ারা সৈয়দ হক ॥ ৬৭
বিচারপতি এম এ মতিন ॥ ৭১
আল্লামা ড. এম শমশের আলী ॥ ৭৪
মুস্তাফা জামান আব্বাসী ॥ ৭৮
ভূঁইয়া সফিকুল ইসলাম ॥ ৮১
অধ্যাপক ড. নূরুর রহমান খান ॥ ৮৫
অধ্যাপক ডা. এম ইউ কবীর চৌধুরী ॥ ৮৮
অধ্যাপক ডা. আবিদ হোসেন মোল্লা ॥ ৯২
অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ ॥ ৯৫
অধ্যাপক ডা. আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী ॥ ৯৯
অধ্যাপক ডা. জহির উদ্দিন আহমাদ ॥ ১০৩
অধ্যাপক ডা. সাহিদা আখতার ॥ ১০৭
ডা. হাসনাইন নান্না ॥ ১১১
কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা ॥ ১১৫
শিবানন্দ বাবা ॥ ১১৯

আমরা তাদের স্মরণ করি

১২৫ ॥ জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম
১৩১ ॥ নাজিম উদ্দিন মোস্তান
১৩৫ ॥ মোহাম্মদ জহিরুল হক
১৩৯ ॥ খালেদ খান
১৪২ ॥ আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল
১৪৬ ॥ কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমদ
১৫০ ॥ সর্দার মুহাম্মদ নূর-উজ-জামান
১৫৩ ॥ ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ূন কবীর
১৫৬ ॥ ডা. নূরুল হক
১৬০ ॥ সাবিয়া সিদ্দিকী
১৬৪ ॥ এস এম হাবিবুর রহমান

সাফল্যগাথা

১৬৯ ॥ নাজমা নিহার চৈতী
১৭৩ ॥ তোহফাতুর রাব্বি পিয়াল
১৭৭ ॥ এঞ্জেলা গোমেজ
১৮১ ॥ ফরিদা পারভীন
১৮৫ ॥ ফয়সাল রহমান
১৮৯ ॥ ড. সরকার আমিন
১৯৩ ॥ ড. মো. আজমত উল্লাহ
১৯৭ ॥ কবি নাসির আহমেদ
২০০ ॥ ইঞ্জিনিয়ার তৈয়বুর রহমান
২০২ ॥ সিদ্দিকুর রহমান
২০৫ ॥ ড. রুবাব খান

ভূমিকা

দু-যুগ আগের কথা। কোয়ান্টাম মেথড যাত্রা শুরু করেছিল প্রায় শূন্য থেকে। প্রয়োজনীয় অনেক উপকরণের স্বল্পতা যেমন ছিল, তেমনি দুর্লভ ছিল উদাহরণ বা প্রমাণ–যা দেখে মানুষ বিশ্বাস করবে মেডিটেশনের উপকারিতা ও কোয়ান্টাম মেথডের কার্যকারিতা।

কিন্তু বিশ্বাস ছিল প্রবল। আজকের মতো সেদিনও কোয়ান্টাম বলেছে– আসুন, আত্মনিমগ্ন হোন, প্রাণান্ত প্রয়াসে কাজে নেমে পড়ুন। সাফল্য আপনার, বিজয় আপনার, সুস্থতা আপনার।

এ অদম্য বিশ্বাসের অনুরণন একটু একটু করে ছড়িয়ে গেছে সমাজে। অল্প অল্প করে সমাজের হাজারো মানুষ এ বিশ্বাসের সাথে একাত্ম হয়েছেন। আস্থাশীল হয়েছেন জীবন বদলের বিজ্ঞানে। একের পর এক ঘটেছে প্রশান্তি সুস্থতা সফলতার ঘটনা। বলা যায়, কোয়ান্টাম আজ লাখো মানুষের জীবন বদলের উদাহরণে পরিপূর্ণ চেতনা।

দু-যুগ ধরে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়া হাজার হাজার মানুষের মধ্যে যেমন আছেন দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় গুণীজন, তেমনি আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিজ্ঞানী চিকিৎসক আইনজীবী প্রকৌশলী শিল্পপতি ব্যবসায়ী প্রশাসক অভিনয়শিল্পী কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক আলেম শিক্ষক ছাত্র তরুণ-তরুণী গৃহবধূ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। রোগ শোক ভয় উদ্বেগ হতাশা কাটিয়ে উঠে তারা লাভ করেছেন অভূতপূর্ব প্রশান্তি। পরিবার, পেশা ও কর্মক্ষেত্রসহ সামগ্রিক জীবনে এনেছেন এক নতুন ছন্দ।

দু-যুগের এ অক্লান্ত সাফল্যযাত্রায় অনুষ্ঠিত হয়েছে কোয়ান্টাম মেথডের ৪০০টি কোর্স! দেশ কালের সীমানা ছাড়িয়ে মেডিটেশনের বিশ্ব-ইতিহাসেও এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। কোয়ান্টাম হয়ে উঠেছে লাখো জীবন বদলের সার্বজনীন অনুঘটক।

ব্যক্তিমানুষের সম্ভাবনার পাশাপাশি জাতিগত সম্ভাবনাতেও একইভাবে বিশ্বাস করেছে কোয়ান্টাম। দেশ নিয়ে অনেকেই যখন হতাশায় ভুগছিলেন, জাতিগত লক্ষ্য নিয়ে ছিলেন বিভ্রান্ত–কোয়ান্টাম তখন বলেছে, এক অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। জ্ঞান প্রযুক্তি সভ্যতা ও নৈতিকতায় আগামীর

বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারে বাংলাদেশ। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান, কোর্সের প্রত্যয়ন এবং কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারে দেশের বিশিষ্ট গুণীজনবৃন্দও এ বিশ্বাসের সাথেই একাত্মতা পোষণ করেছেন।

গুণীজনদের এসব ভাবনা ও কোয়ান্টাম চেতনার অনুসারী একগুচ্ছ সফল জীবনের গল্প নিয়ে সংকলিত হয়েছে *কোয়ান্টাম ভাবনা ॥ সাফল্যগাথা* ২। উক্ত সংকলনের প্রথম খণ্ডের বিপুল পাঠকপ্রিয়তাই আমাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে।

এ সংকলনের প্রথম ভাগে আছে দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ চিকিৎসাবিজ্ঞানী সমাজতাত্ত্বিক ধর্মবেত্তা কবি লেখক শিল্পীসহ সমাজের প্রায় সকল মতের পথের বিশিষ্টজনদের অনুভূতি-উপলব্ধির কথা। পড়তে পড়তে আপনিও ঋদ্ধ হয়ে উঠবেন তাদের জীবন-অভিজ্ঞতার আলোয়।

কোয়ান্টাম পরিবারের সেইসব সেবাব্রতী সদস্য–যারা আমাদের ছেড়ে যাত্রা করেছেন মহাজাগতিক সফরের পরবর্তী ধাপে–তাদের কয়েকজনের কর্মময় জীবনভিত্তিক প্রতিবেদন সংকলিত হয়েছে বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে।

আর, শেষ ভাগে রয়েছে কোয়ান্টাম চেতনার সফল প্রয়োগকারী একদল কীর্তিমান মানুষের সাফল্যগাথা–যারা শূন্য থেকে জীবন শুরু করে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছেন পূর্ণতার পথে। এদের জীবন আপনাকে উজ্জীবিত করবে, সাহস যোগাবে। বিশ্বাস এনে দেবে যে, এদের মতো আপনিও পারেন যে-কোনো অবস্থা থেকেই জীবনের উত্থান ঘটাতে।

কোয়ান্টামের ২৪ তম বছরে বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা পরম করুণাময়ের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। কৃতজ্ঞতা কোয়ান্টাম পরিবারের সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীর প্রতিও, যাদের শ্রমে-ঘামে সম্ভব হয়েছে এ অনন্য সাফল্যযাত্রা।

করুণাময় আমাদের সহায় হোন।

কোয়ান্টাম ভাবনা



বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা, বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন গুরুত্বপূর্ণ ও সফল সংগঠক এবং বরেণ্য আইনজ্ঞ ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৯৮ ব্যাচে অংশ নেন। কোর্সের প্রত্যয়নে তিনি এ বক্তব্য দেন।

মানুষকে সমাজ-সচেতন করে তুলছে কোয়ান্টাম

ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম

পৃথিবীর বহু জায়গায় বহু বক্তৃতা আমি শুনেছি; কিন্তু এত জ্ঞান, এমন গভীরতা ও সামগ্রিকতা–এটা একসাথে পাওয়া খুব দুর্লভ একটি সুযোগ। সেই সুযোগটি পেয়ে আমি গর্বিত। আমি কৃতজ্ঞ।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে সকল ধর্মের মৌলিক দর্শন এবং নবীজী (স) ও অন্যান্য মহামানবদের জীবনাদর্শ, আধুনিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক তত্ত্ব ও নানা মনস্তাত্ত্বিক বিষয়, আমাদের সাথে প্রকৃতি ও সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্পর্ক, আমাদের দেহ মন ও এর কমান্ড স্ট্রাকচার–এই প্রতিটা ব্যাপার আপাত দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন হলেও সবই যে আসলে এক অভিন্নসূত্রে গাঁথা–সেটি গুরুজী যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা অতুলনীয়।

আমরা অনেক সময় যে ভয় ও আড়ষ্টতায় তলিয়ে যাই তা থেকে মুক্তি পাওয়ার ও নিজেকে উদ্ধার করার প্রক্রিয়াটা গুরুজী কোর্সের প্রথম দিনই আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। আমার খুব ভালো লাগল, তিনি শিক্ষার বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছেন গ্রামবাংলার চিরায়ত লোকাচার ও লোকজ গল্প। এর মধ্য দিয়েই গুরুজী একটি সুন্দর জীবনদর্শন তুলে ধরেছেন। এ সত্যিই এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা আমার জন্যে।

আর চার দিনের এ কোর্সের সমাপ্তিও তিনি টানলেন খুব চমৎকারভাবে–বান্দরবানের লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের সাফল্যের একটি ভিডিওচিত্র দেখানোর মধ্য দিয়ে। এর মাধ্যমে তিনি আসলে আমাদের বিশ্বজয়ের আমন্ত্রণ জানালেন।

কোয়ান্টামের সাথে আমার প্রথম পরিচয় আরো বছরখানেক আগে। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানে কোয়ান্টাম পরিবারের কয়েক শ সদস্যকে সম্মাননা জানানো হয়, যারা নিয়মিত রক্তদান করেন। আমি জেনেছি, দেশে স্বেচ্ছা রক্তদান সংশ্লিষ্ট যে-সব প্রতিষ্ঠান আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হচ্ছে কোয়ান্টাম।

সেদিন আমি বলেছিলাম, যে জাতির এত মানুষ অন্যের জন্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন, সে জাতির তো উন্নতি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। দেহের বিভিন্ন অসুখের ফলে যেমন রক্তক্ষরণ ঘটে, সমাজেও তেমনি আজ নানাভাবে রক্তক্ষরণ ঘটছে। কিন্তু এই রক্তক্ষরণ বন্ধ করার কার্যকর কোনো উদ্যোগ তেমনভাবে চোখে পড়ে না। এজন্যে চাই মানবিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন সমাজ-সচেতন মানুষ। আর এই সচেতনতাই একজন মানুষকে সত্যিকার 'মানুষ'-এ পরিণত করে। জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

আমরা প্রায়শই বলে থাকি যে, দেশে লোকসংখ্যা বাড়ছে। লোকসংখ্যা বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু কমে যাচ্ছে 'মানুষ'-এর সংখ্যা। এখানে এসে আমি সেই 'মানুষ'-ই দেখলাম।

কিছুদিন আগে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও সে-সময়কার স্মৃতি নিয়ে একটি বক্তৃতা করছিলাম। বক্তৃতা শেষে প্রশ্নোত্তরপর্বে একজন বললেন, 'মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আপনার সুখকর স্মৃতির কথা জানলাম, কিন্তু এর পরের বাংলাদেশ নিয়ে আপনার কোনো হতাশা আছে কিনা।'

তখন আমি একটা কষ্টের কথা ওদের বললাম। বললাম, মুক্তিযুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু যেদিন দেশে ফিরে এলেন–১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি–সেদিন তিনি সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'কবিগুরু বলেছেন–*সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,/ রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ কর নি*। কবিগুরুর কথা আজ মিথ্যা প্রমাণ হয়ে গেছে। আমার বাঙালি আজ মানুষ।'

সেদিন থেকেই আমি সুযোগ খুঁজছিলাম বঙ্গবন্ধুর সাথে একাকী হওয়ার জন্যে। দু-তিন দিন পর সুযোগ পেয়েও গেলাম। তাকে বললাম, "একটা

মুক্তিযুদ্ধ করলেই কিন্তু একটা জাতি 'মানুষ' হয়ে যায় না। 'মানুষ' হওয়ার জন্যে একটা প্রক্রিয়া লাগে এবং সেটা আপনিই করতে পারেন। আর আপনি যদি তা করে যেতে না পারেন, তাহলে এটা কী করে সম্ভব হবে জানি না।"

আমার খুব ভালো লাগছে যে, কোয়ান্টামে এসে আমি 'মানুষ' হয়ে ওঠার উপকরণগুলো খুঁজে পেলাম। আমি মনে করি, সর্বতোভাবে এটি একটি 'মানুষ' তৈরির প্রক্রিয়া। কোনো শিক্ষালয়ে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে আমি এমনটি খুঁজে পাই নি।

আমরা লামার 'কোয়ান্টামম'-এর কথা শুনলাম এবং ওখানকার বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জানলাম। সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে, এ যেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নেরই একটি নকশা। বার বার মনে হলো, ওখানেই আমার মনের বাড়ি। আমি আহ্বান করি–কোয়ান্টাম সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করবে এবং আশা করি, এর মধ্য দিয়ে আরো অনেক 'মানুষ' তৈরি হবে।

মুক্তিযুদ্ধের আরেকটি স্মৃতির কথা বলি। '৭১ সালের ২২ কিংবা ২৩ মার্চ। আমি তখন বঙ্গবন্ধুর লাইব্রেরি রুমে সারাদিন কাজ করতাম। সারা দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর নোট করে তাকে দিতাম। বঙ্গবন্ধু সে অনুসারে নির্দেশনা দিতেন।

একদিন কাজ করছি। একটা ফোন এলো আমেরিকান এম্বেসি থেকে। আমি ভাবলাম বোধহয় বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলতে চায়। কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে জানাল, আমার সাথে কথা বলতে চায়। দেখলাম যিনি ফোন করেছেন তিনি আমার নাম-পরিচয় সব জানেন।

তিনি আমাকে একটা রেস্টুরেন্টে ডাকলেন। আলাপচারিতায় আমাকে বোঝাতে চাইলেন–"তোমাদের হাজার হাজার লোকজন এত মিছিল মিটিং আন্দোলন করছে। এসব করে তো কোনো কাজ হবে না। পাকিস্তান মিলিটারি যখন তোমাদের আক্রমণ করবে, তখন কী করবে তোমরা? আমরা বুঝতে পারছি তোমাদের এখানে কী হচ্ছে এবং তোমাদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিও আমাদের আছে। কিন্তু ব্যাপার হলো, আমাদের পেন্টাগন সিআইএ কোথাও বিশ্বম্যাপে 'বাংলাদেশ' বলে কোনো রাষ্ট্র নেই।"

তার কথার মর্মার্থ ছিল, আমরা তোমাদের পরিস্থিতি বুঝতে পারছি, কিন্তু আমাদের ম্যাপে 'বাংলাদেশ' বলে কোনো রাষ্ট্র নেই বলে আমরা তোমাদের কোনোভাবে সাহায্য করতে পারছি না।

প্রত্যুত্তরে আমি তাকে বললাম, "দেখ, এই পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখনো কিন্তু 'বাংলাদেশ' বলে কোনো ভূমি ছিল না। নানা ছোট-বড় পাহাড়

পাথর ইত্যাদি ভেঙে গুড়ো হয়ে সমুদ্র থেকে উত্থিত পানির সংমিশ্রণে এই অপূর্ব দেশ তৈরি হয়েছে। ক্রমান্বয়ে এর উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে।

আর তুমি আজ যে মানুষগুলোকে দেখছ–মিছিল করছে, স্লোগান দিচ্ছে–তারা কিন্তু এ মাটি থেকেই উদ্ভূত। এরাও এ মাটির মতোই নানা চড়াই-উতরাই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে। এ দেশ অনেক বেশি উর্বর। এরকম মাটি পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

এছাড়াও সারা পৃথিবী থেকে বিচিত্র সব জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এখানে এসেছে। যেখানেই মানুষ দুর্ভিক্ষ খরায় ভুগেছে, আহার পায় নি এবং আমাদের দেশ নিয়ে গল্প শুনেছে যে, এখানে বীজ ছড়িয়ে দিলে ফসল ফলে, এখানকার পানি সুপেয়–তারা হাজার হাজার মাইল হেঁটে কিংবা সাগর পাড়ি দিয়ে চলে এসেছে। আর পৃথিবীর বহু জনগোষ্ঠী কিন্তু বিলীন হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে। কিন্তু এ মাটির মানুষেরা টিকে গেছে। তাদেরই বংশধর আমরা। অতএব এটা কিন্তু পরীক্ষিত যে, পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা আমাদের দেশের মানুষ রাখে।"

কথাটা সেদিন বিশ্বাস করেই বলেছিলাম। আজ নানা সমৃদ্ধির পথ ধরে জাতি হিসেবে সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। একটা উদাহরণ দিলেই কথাটা বোঝা যাবে।

যখন দেশ স্বাধীন হলো, আমাদের চিন্তা ছিল, মানুষকে খাওয়াব কী করে? সেটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা। সেদিন যা নিয়ে আমাদের এত দুশ্চিন্তা ছিল সেই খাদ্যে তো আজ বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দারিদ্র্যমুক্তি ঘটেছে। মানুষের গড় আয়ু ও জীবনমান বৃদ্ধিসহ নানা স্বাস্থ্যসূচকে আমরা অনেক এগিয়ে গেছি। আমরা আজ আর তলাবিহীন ঝুড়ি নই। পৃথিবীর সর্বত্রই আমাদের ছেলেমেয়েরা কী অসাধারণ মেধা ও সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছে!

আর এর পাশাপাশি এ কোর্সে গুরুজীর বক্তব্য ও লামার কথা শুনে আমার মনে প্রবল আশার সঞ্চার হচ্ছে। সবমিলিয়ে এ চার দিন ধরে যা শুনলাম ও দেখলাম তাতে বিশ্বাস করি, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তার সবরকম কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে মানুষকে সমাজ-সচেতন করে তুলছে। এরকম একটি উদ্যোগের সাথে আমার যোগসূত্র তৈরি হলো বলে নিজেকে ধন্য মনে করি।



বাংলাদেশে শিশু চিকিৎসার সূচনা ও বিকাশে জীবন্ত কিংবদন্তি জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান। বান্দরবান লামার কোয়ান্টামমস্থ কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী কোয়ান্টাদের উদ্দেশ্যে তিনি এ বক্তব্য দেন।

এই শিশুরাই একদিন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে

জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান

সেই ২০১১ সাল থেকে এই নিয়ে তিন বার আমি লামায় এলাম। আমার বয়স ৮০ পেরিয়ে গেছে যদিও, তবু লামার এই কোয়ান্টামম-এ যতবার আসি, আমি খুব অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ বোধ করি।

সবাই জানেন, আমি শিশুদের নিয়ে কাজ করি, ওদের ভালবাসি, ওরা-ও আমাকে ভালবাসে, আমাকে ওদের বন্ধু মনে করে। তাই এখানে এসে যখন ফুলের মতো এতগুলো শিশুকে একসাথে দেখি, আমার প্রাণটা সত্যিই ভরে যায়। খুব ভালো লাগে।

সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হলো, ধর্মবর্ণনির্বিশেষে একাধিক বিচিত্র জাতিগোষ্ঠীর শিশুরা এখানে একত্রে একটি আলোকিত পরিবেশে বেড়ে উঠছে। আমি মনে করি, মানবতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার একটি অনন্য উদাহরণ এটি।

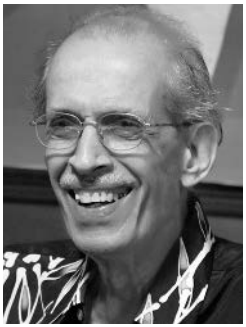
আমাদের সমাজ ও দেশের একটি সুন্দর ও উন্নত ভবিষ্যৎ আমি এই শিশুদের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। আলোকিত শিক্ষা ও সঠিক জীবনদর্শনে জেগে উঠে একদিন ওরাই তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। জাতিকে নেতৃত্ব দেবে।

প্রতিবারের মতো এবারও আমরা কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের (কোয়ান্টা) অনিন্দ্যসুন্দর প্যারেড ও ডিসপ্লে দেখলাম। সুনিপুণ দক্ষতায় ওরা প্যারেড করল, ঠিক যেমন সুপ্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সদস্যরা করে থাকেন।

এর পাশাপাশি আমি জানি, তারা দেশের বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজ ও প্রথমসারির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। শুধু তা-ই নয়, লেখাপড়ায় ভালো করার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তাদের ঈর্ষণীয় সাফল্য কোয়ান্টাম পরিবারের গৌরব বাড়িয়েছে। দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। এজন্যে আমি তাদের আমার আন্তরিক অভিবাদন জানাই।

আমি আশা করব, এ স্কুলের শিক্ষার্থীদের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক। এই মাঠের এক জায়গায় লেখা আছে *দেখছি–অলিম্পিকে সোনা আমরা জিতবই*। আমরা সেই প্রত্যাশাই করি–অলিম্পিকে আমরা একদিন আমরা অবশ্যই সোনা জিতব।

সত্যিকার অর্থেই এ স্কুলের শিক্ষার্থীরা সোনার মানুষ হোক। আলোকিত মানুষ হোক। ওরা যে যেই জাতিগোষ্ঠী থেকেই আসুক না কেন, সবাই একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পড়াশোনা, খেলাধুলা ও অন্যান্য সবক্ষেত্রে এগিয়ে যাক। আরো বড় সাফল্য অর্জন করুক। পরিবার, সমাজ এবং দেশের জন্যে সম্মান বয়ে আনুক। আমি ওদের জন্যে এই দোয়াই করি।



বাংলাদেশে আধুনিক হৃদরোগ চিকিৎসার পথিকৃৎ এবং ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও মহাসচিব জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগে. (অব.) ডা. আব্দুল মালিক। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩৭৫ ব্যাচে অংশ নেন। কোর্সের প্রত্যয়নে তিনি এ বক্তব্য দেন।

সৃষ্টির কল্যাণে কাজ করুন প্রশান্তি পাবেন

জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগে. (অব.) ডা. আব্দুল মালিক

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের এ চার দিন ধরে গুরুজী যে সমস্ত কথা বলে গেলেন তা পরম সত্য। এখানে বিভিন্ন বয়সের অংশগ্রহণকারী যারা রয়েছেন, প্রত্যেকের জন্যেই এটি প্রযোজ্য। আমি আশা করি, যারা এখানে এসেছেন তারা সবাই এ থেকে উপকৃত হয়েছেন। একজন আলোকিত মানুষ কীভাবে হওয়া যায়, তা-ই তিনি সুন্দরভাবে বলেছেন। এজন্যে তাকে আমার অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

মানুষ তার জন্মের জন্যে দায়ী নয়, কিন্তু সে তার কর্মের জন্যে দায়ী। আর প্রত্যেক মানুষই চায় জীবনে ভালো করতে। সফল হতে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, সবাই আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল হতে পারবেন না সত্যি; কিন্তু প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তার কিছু সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ চাইলে সে অনেক কিছু করতে পারে। এবং তা করতে হলে শারীরিক-মানসিকভাবে তাকে সুস্থ হতে হবে।

গুরুজী এই কয়েকদিনে খুব সুন্দর ও কার্যকরভাবে মানুষের ভেতরকার সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে এবং শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে কীভাবে কী করা উচিত, তা এক এক করে বলে গেছেন।

আমরা জানি, সব কাজের ক্ষেত্রেই মনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অর্থাৎ মানুষের মনই হলো আসল। এই যে একটা ভবনে আমরা সবাই বসে আছি, এর কথা একজনের মনের মধ্যে প্রথম এসেছে যে, এরকম একটা ভবন নির্মাণ করব। এভাবেই সবকিছু মানুষের মনের মধ্যে প্রথম আসে। আর এই মনের মধ্যে যে চিন্তাটা আসে সেটাকে যদি আমরা বিশ্বাস করি, এর পেছনে লেগে থাকি এবং মনে করি যে, এটা আমি পেয়েছি বা পাব তাহলেই তা বাস্তবে পরিণত হবে।

অর্থাৎ একটা ইতিবাচক মনোভাব সবসময় থাকতে হবে। কারণ, আমরা বার বার যে কথাটা চিন্তা করি আমাদের মন সেটিকেই প্রাধান্য দেয়। তা-ই বাস্তবে পরিণত হয় শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু আমরা ভুলটা করি কী? অনেক সময় বলি যে, এই তুমি আসতে দেরি কোরো না। অথচ আমাদের বলা উচিত যে, তুমি সময়মতো আসবে। 'দেরি কোরো না' বললে ওই দেরিটাই মনের মধ্যে থেকে যাবে এবং দেরি হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা। সুতরাং আমাদের সবকিছু চিন্তাভাবনা করতে হবে ইতিবাচকভাবে। এটা গুরুজী খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

এছাড়াও তিনি পারিবারিক বন্ধন নিয়ে আলোচনা করেছেন। জীবন সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত, তারা কী করবে না করবে তা খুব সুন্দরভাবে বলেছেন। গল্পচ্ছলে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তরুণদের জন্যে যা অনেক জরুরি।

তরুণদের উদ্দেশ্যে বলি, অনেক বিষয় প্রথম শোনায় স্পষ্ট না হলেও তোমরা যখন বই পড়বে এবং কথাগুলো নিয়ে যখন চিন্তা করবে, আস্তে আস্তে এগুলো স্পষ্ট হবে তোমাদের কাছে। স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর হবে। সৃজনশীল চিন্তা এবং নৈতিকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তরুণদের জীবনে।

আর বাবা-মা-অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলি, সবাই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে না। তার দরকারও নেই। কাজেই ছেলেমেয়ের কী ইচ্ছা তা আপনারা দেখুন। বোঝার চেষ্টা করুন। জোর করে কোনোকিছু ওদের ওপর চাপিয়ে দেবেন না। যদি ওদের সিদ্ধান্ত আপনার মনমতো না হয় তাহলে তাকে বলবেন, বোঝাবেন। তবুও যদি তার ইচ্ছা হয় তাহলে সে যা পড়তে চায়, করতে চায়, সেটাই তাকে করতে দিন।

কারণ যে-কোনো বিষয়ে সে যদি ভালো করতে পারে, তাহলে তার জন্যে মঙ্গল, পরিবারের জন্যে মঙ্গল। সমাজের জন্যে মঙ্গল। অর্থাৎ ছেলেমেয়ের ইচ্ছাটাকে গুরুত্ব দেবেন।

আরেকটা কথা গুরুজী বলেছেন, সেটা হলো, বয়স যখন কম থাকে তখন দুনিয়াটা মানুষ রঙিন দেখে। ছেলেমেয়েরা জানে না কে তাদের সাথে প্রতারণা করবে। সুতরাং এ সময়ে এসব ব্যাপারে সাবধান থাকা চাই। মা-বাবারাও খেয়াল রাখবেন। কারণ ছেলেমেয়ে একবার বিপথে চলে গেলে আবার ফিরে আসা মুশকিল হয়ে পড়ে।

কাজেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়তে হলে গুরুজী যেভাবে বলেছেন, সে নিয়মে ওদের শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ করে তুলতে হবে। এভাবেই আমরা আমাদের জাতির জন্যে অর্জন করব একটি উন্নত ভবিষ্যৎ।

আরেকটা ব্যাপারে গুরুজী বার বার বলেছেন–অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ চিন্তা। আমরা বেশিরভাগ সময় অতীত নিয়ে চিন্তা করি। গবেষণায় দেখা গেছে, সাধারণভাবে একটা লোক প্রায় ৬০ হাজার চিন্তা করে সারাদিনে। তার মধ্যে ৫০ হাজার অতীতকে নিয়ে, আর ১০ হাজার ভবিষ্যৎকে নিয়ে। তাহলে বর্তমানটা কোথায়? অর্থাৎ এটা বোঝে না যে, বর্তমান নিয়ে যদি না ভাবি, বর্তমানের কাজটা ভালোভাবে না করি তবে এই 'বর্তমান'টাও কিছুক্ষণ পর অতীত হয়ে যাবে। সম্ভাবনাটা নষ্ট হয়ে যাবে। কোনো কাজই হবে না।

আর এই যে ধ্যান, এটা কী? ধ্যান আপনার চঞ্চল মনকে প্রশান্ত করে। এবং যেই আপনি প্রশান্ত হলেন তখন মহাচেতনার সাথে আপনার একটা যোগাযোগ ঘটে যাবে। তখনই আসবে প্রজ্ঞা।

অধিকাংশ বই পড়ে যে জ্ঞান অর্জন হয়, সেই জ্ঞান বৃষ্টির পানির মতো। পড়লেন, যতক্ষণ মনে থাকল তো আছে, তারপর তা ভুলে গেলে চলে গেল। কিন্তু প্রজ্ঞা হলো একটা প্রস্রবণের মতো। একবার যোগাযোগ ঘটে গেলে এটা আসতেই থাকবে। আপনার কথা শেষ হবে না। আপনি যা বলতে চাইবেন তা-ই বলতে পারবেন। এই যে রবীন্দ্রনাথ নজরুল, এরা কি বই পড়ে বই লিখেছেন? না। ওই প্রজ্ঞার সাথে যোগাযোগটা তাদের হয়ে গিয়েছিল।

যা-ই হোক, গুরুজী যে বিষয়গুলো এ কোর্সে আমাদের শেখাতে চেয়েছেন, তা আমাদের প্রত্যেকের শেখা উচিত এবং অনুসরণ করা উচিত। তাই সবারই এটা চর্চা করা উচিত। আর এর মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যেকে যে যেই অবস্থানে থাকি না কেন, শুধু নিজের জন্যে ব্যস্ত না থেকে আমরা যেন সমাজের জন্যে, জাতির জন্যে, মানুষের জন্যে কিছু করি।

আরেকটা জিনিস, শরীর যদি সুস্থ না থাকে তাহলে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। সুতরাং শরীরকেও সুস্থ রাখতে হবে। গুরুজী নানা উদাহরণ দিয়ে সাইকোসোমাটিক ডিজিজগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের

শরীর এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, প্রত্যেকটা কোষের মধ্যেই একটা চেতনা আছে। প্রত্যেক কোষ এবং প্রত্যেক অঙ্গ সেভাবেই সুন্দরমতো কাজ করে।

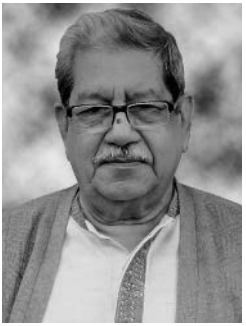
কিন্তু আমরা নিজেদের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার করি বলেই আমাদের রোগ হয়। যেমন, আজকালকার দিনে করোনারি হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস ইত্যাদি নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ বা অসংক্রামক রোগগুলোর প্রকোপ বাড়ছে। কেন? কারণ আমরা আমাদের জীবনযাপনের ধরন বদলে ফেলেছি। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে ফেলেছি। তাই সুস্থ থাকতে হলে কী করতে হবে, গুরুজী সে লক্ষ্যে সুন্দরভাবে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এটা অনুসরণ করলে সবাই সুস্থ থাকতে পারবে।

ধূমপান ও ড্রাগস ইত্যাদি ক্ষতিকর নেশা থেকে মুক্ত থাকার কথা বলেছেন গুরুজী। মেডিটেশনের মাধ্যমে এ থেকে বেরিয়ে আসার কার্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত উপায় বাতলে দিয়েছেন তিনি এ কোর্সে। মূল কথাটা হলো, সুস্বাস্থ্যের জন্যে আমাদের শারীরিক-মানসিকভাবে ফিট থাকতে হবে। সেইসাথে কাজ করতে হবে নিজের কল্যাণে ও সৃষ্টির কল্যাণে।

আমি আশা করি, যারা এখানে এলেন, শুনলেন, শিখলেন, তারা অন্যদের বলবেন এবং উদ্বুদ্ধ করবেন। গুরুজীকে অনুরোধ করব, আপনি আরো বিভিন্ন জায়গায় কোর্স পরিচালনা করুন। প্রত্যেক মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে 'মানুষ' হতে পারে, তাহলে দেশের জন্যে সেটাই আসল শক্তি, আসল সম্পদ।

মানুষই তো দুনিয়ার সবকিছু করে। আল্লাহও যা করেন মানুষের মধ্য দিয়েই করেন। কেউ যদি বড় কিছু করেন, তবে গর্ব করা উচিত নয়–গুরুজী এ কথাটাও বার বার বলছেন যে, গর্ব করবেন না। শুকরিয়া আদায় করবেন যে, কাজটা আপনার মাধ্যমে কাজটা হয়েছে।

সবশেষে বলি, ধর্ম হচ্ছে মানুষের মঙ্গলের জন্যে। প্রত্যেকে যদি আমরা নিজের ধর্ম পালন করি, মানুষের সেবা করি তাহলে দেশটা সুন্দর হয়, পৃথিবীটা সুন্দর হয়। আর কেউ যদি ধর্মে বিশ্বাস না-ও করে তবু আমি বলব, আপনি প্রকৃতির কাছ থেকে অক্সিজেন পাচ্ছেন, পানি পাচ্ছেন, আরো কত অনুগ্রহ লাভ করছেন–সেজন্যে হলেও সৃষ্টির মঙ্গলের জন্যে আপনি কাজ করুন। এতে আপনি প্রশান্তি পাবেন।



বরেণ্য শিক্ষাবিদ, লেখক, গবেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস ড. আনিসুজ্জামান। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'বাংলা বাচন পরিশীলন কর্মশালার' সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ বক্তব্য দেন।

প্রমিত বাংলাকে ছড়িয়ে দিতে কোয়ান্টামের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের আয়োজনে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'বাংলা বাচন পরিশীলন কর্মশালা', এবং এ উদ্যোগটি এতই ভালো যে, আমি যখন এ সম্পর্কে শুনলাম, এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছে হলো। কাজেই আমি এসেছি। একটি ভালো কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

আমি জেনে খুবই আনন্দিত হলাম যে, এ পর্যন্ত এর ১১টি কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতি কোর্সে প্রায় ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নিয়েছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতজনের কাছে বাচন পরিশীলনের বিষয়টি পৌঁছে দেয়া কম কথা নয়। আর এ কার্যক্রমের ভিডিওচিত্র দেখে অনুভব করলাম, এই শেখাটা খুব আনন্দময় হয়েছে। সকলের জন্যেই অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে।

বর্তমানে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হচ্ছে শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই এই কর্মশালায় সবাই যে খুশি মনে আনন্দের সাথে শিক্ষা নিতে পেরেছে, এটা খুব বড় ব্যাপার বলে আমি মনে করি। আমি এজন্যে প্রশিক্ষক গোলাম সারোয়ারকে অভিনন্দিত করি।

তিনি খুব নিষ্ঠার সাথে তার কাজটি করেছেন। খুব যত্নের সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের শেখানোর চেষ্টা করেছেন।

আমি প্রত্যাশা করি, এখান থেকে যারা প্রমিত ও শৈল্পিক বাচন শিখে গেলেন, তারা আবার অন্যদেরকে শেখাবেন। যেমন একটু আগেই শুনলাম, একজন প্রশিক্ষণার্থী তার স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে এই বাচন পরিশীলন কর্মশালার উদ্যোগ নিয়েছেন।

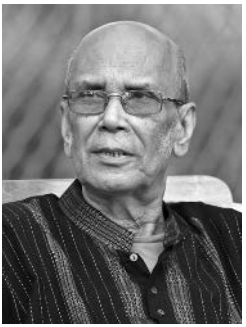
এভাবে যদি এটি ছড়িয়ে যায়, খুব ভালো হবে। কারণ, আমাদের মধ্যে এখন প্রমিত বাংলা নিয়ে একটা সংশয় দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ বলতে চান যে, যাকে আমরা প্রমিত বাংলা বলি, এটা প্রায় একশ বছর আগে গড়ে উঠেছিল, ভাগীরথী তীরের ভাষাকে কেন্দ্র করে। তাই তাদের প্রশ্ন, আমরা কেন এই ভাষাকে প্রমিত বলে গণ্য করি? বাংলাদেশের মানুষের আলাদা ভাষা হবে না কেন? এই কথাটা আরো একটু বেশি টেনে নিলে দেখা যাবে, আমরা বলতে শুরু করব যে, রবীন্দ্রনাথের ভাষা, শরৎচন্দ্রের ভাষা, নজরুলের ভাষা, প্রমথ চৌধুরীর ভাষা আমাদের ভাষা নয়। এটা খুব মারাত্মক ব্যাপার হবে।

কাজেই প্রমিত ভাষা, প্রমিত উচ্চারণ–এটা আমাদের শিখতে হবে। এটা পৃথিবীর সব জায়গায় হয়েছে। ইংরেজির যেটা প্রমিত উচ্চারণ, সেটাও ইংল্যান্ডের মধ্যাঞ্চলের একটা স্থানীয় ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। লন্ডনের যে খাস ইংরেজি, সেটাকে কেন্দ্র করে নয়। এবং এই প্রমিত ভাষার বিস্তার ঘটেছে ছাপাখানার সহযোগিতায়, বই, পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে এবং বেতারের সূত্রে। এখনো বিবিসির ইংরেজিকে বলা হয় প্রমিত ইংরেজি। এটাকে অনুসরণ করা হয়।

অতএব আমরা যদি বলি, প্রমিত বাংলা কেন ব্যবহার করব, এটা একটা জেদের কথা হতে পারে কিন্তু যুক্তির কথা নয়। কাজেই আমাদের প্রমিত বাংলা শিখতে হবে, বলতে হবে, সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে।

আমি খুব আনন্দিত যে, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এই পরিশীলিত বাচনভঙ্গি, শুদ্ধ উচ্চারণ সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তাদের রয়েছে যে, আমাদের দেশের বাইরেও যেখানেই বাঙালি আছে বা বাংলা ভাষায় যারাই কথা বলেন–সবার কাছে এটা পৌঁছে দিতে হবে। আমি এই প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করি।

এখান থেকে যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের আমি বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই। আমি আশা করব, কোয়ান্টামের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।



বাংলা ভাষার বরেণ্য কবি ও সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক সম্প্রতি (নভেম্বর ২০১৫) সপরিবারে বান্দরবান লামার কোয়ান্টামম সফর করেন। সেখানে 'সৈয়দ হক মঞ্চের' উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি এ বক্তব্য দেন।

আমার প্রাণ এখানেই রয়ে গেল

সৈয়দ শামসুল হক

যে মানুষের জন্যে সারাজীবন ভেবেছি, যাদের এতটুকু মঙ্গলের জন্যে ৬৪ বছর ধরে লিখছি, সেই মানুষের সামনেই যেন ৬৪টি ধাপ পেরিয়ে আমাকে একটি শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছে দিল আজকের এই ঘটনা–এই 'সৈয়দ হক মঞ্চের' উদ্বোধন।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দুটি সম্মাননাসহ অসংখ্য পুরস্কার জীবনে পেয়েছি। কিন্তু আমি পুরস্কারের জন্যে কাজ করি নি, করেছি মানুষের জন্যে। আমার মন যা স্বপ্ন দেখেছে তার বাস্তবায়ন যদি ঘটাতে পারি, যদি একটা কথাও কারো কাজে আসে তবে সেটাই আমার পুরস্কার।

একটু আগে যখন মঞ্চের নাম ঘোষণা করা হলো তখন আমি কেঁদে উঠেছিলাম। আমার চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়ছিল। আমার মনে হলো, এ-তো পুরস্কার নয়, মানুষ আমাকে স্পর্শ করল। জীবন আমাকে স্পর্শ করল। সত্য আমাকে স্পর্শ করল। বাণী আমাকে স্পর্শ করল।

যেন বলল, হাঁ, তুমি যা করেছ সত্যের জন্যে করেছ। দেশের জন্যে করেছ। এবং এই দেশ, এই মাটি, এই আকাশ, এই খোলা প্রকৃতি তোমাকে আজ পুরস্কৃত করছে।

কাল এখানকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এলো আমার সাথে কথা বলবার জন্যে। কবিতা শোনাল ওরা আমাকে। আমার নিজেরই লেখা সে কবিতা। আমি যেখানে বসে এই কবিতা লিখেছি সেই ঢাকা শহর থেকে কত দূরে এই পাহাড়ের কোলে বসে নৃ-জাতিগোষ্ঠীর একটি শিশুকন্যা আমাকে শোনাচ্ছে–*সূর্য ওঠার পূর্বদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ ...*। ভাবা যায়?

এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে একজন লেখকের জন্যে? আগামী দিনে যারা নেতৃত্ব দেবে তাদের কণ্ঠে আমি একটি-দুটি কথা তুলে দিতে পেরেছি–যা তার দেশকে চেনায়, ভাষাকে চেনায়, জাতিকে চেনায়। আজকের এই সম্মান আমার সে-কাজেরই স্বীকৃতি।

কিছুক্ষণ আগে যখন সন্ধ্যা হচ্ছিল তখন কোয়ান্টামম-এর রাহমাতান বাংলোতে বসে আমি দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা মনে পড়ছিল–

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা–
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

আমি কি সব পেয়ে গেছি? এ-তো সব পাওয়া নয়। এ সম্মান দেয়ার মধ্য দিয়ে যেন আমাকে বলা হচ্ছে–*এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ...।*

এর মানে হলো, যেতে হবে, যেতে হবে উড্ডীন হয়ে। মাটিতে পড়ে থাকলে চলবে না। আমাদের এই ভূখণ্ডেরই এক মহান কবি ইকবাল তার গজলে বলেছেন, *সিতারো সে আগে হ্যায়, জাঁহা আউর ভি ...।* এর বাংলা আমি করেছিলাম–*তারামণ্ডল পেরিয়ে জগৎ অনেক রয়েছে আরো ...।* অর্থাৎ এখানেই শেষ নয়।

ইকবাল বলছেন, *তু শাহীন হ্যায়, পরওয়াজ হ্যায় তেরা কাম।* তুমি তো ঈগল পাখি। তুমি মাটিতে কেন বসে থাকবে? তুমি ওঠো, ওড়ো ...। তুমি মহাকাশ ভেদ করো।

আমার ঐ যে কবিতাখানি আবৃত্তি করে শোনাল সেই ছোট্ট মেয়েটি, ওতে একটি চরণ আছে–*কবির দেশ বীরের দেশ ...।* এ সেই বীর, যে জয়

করেছে। যে বীর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। হিমালয়ও যে বীরের কাছে নিচু, সেই বীরের কথাই তো আমাদের প্রত্যেকের চেতনায় বপন করে দিয়েছেন আমাদের বিদ্রোহী কবি নজরুল–

বল বীর –
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি' আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রীর!

বঙ্গবন্ধু যখন কিউবা গিয়েছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো তখন বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখি নি, তাই বলে আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি।' আমারও বলতে ইচ্ছে করছে, আমি স্বর্গের কথা শুনেছি, চোখে দেখি নি। এই কোয়ান্টামম-এ এসে আমি সেই স্বর্গ দেখেছি। এর জয় হোক, কল্যাণ হোক। মঙ্গল হোক।

কেন একে স্বর্গ বলছি? এখানে অনেক গাছপালা আছে, কোনো কোলাহল নেই, দূষণ নেই–তার জন্যে কি? না, এ-তো একটা পটভূমি মাত্র। আসল ব্যাপারটি হলো, সকল ধর্মবর্ণের সন্তানেরা এখানে মিলেমিশে রয়েছে।

বাংলাদেশে আর একটি জায়গার কথা আমি বলতে পারব না, যেখানে বাঙালি, পাহাড়ি, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ ২০টি জাতিসত্তার মানুষ এভাবে একসাথে থাকছে। এ এক বিরল উদাহরণ। আসলে এই হচ্ছে বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশের স্বপ্নই দেখেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

লালন ফকিরের একটি কথা আমি খুব মানি–*এমন মানব জনম আর কি হবে // মন যা কর, ত্বরায় কর এই ভবে।* এই মানবজন্ম আর হবে না। যা করার আমাদের এই জীবনেই করতে হবে। আজ এখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, এই 'করা'-র অনেকটাই আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি।

আমি সত্যিই অভিভূত, আমার স্ত্রী ও আমি এরকম একটি মহামুহূর্তে এখানে উপস্থিত থাকতে পেরেছি। আমার আজ মনে পড়ছে আমার বহু বন্ধুজনের কথা–যারা ভালো কবি ছিলেন, ভালো লেখক ছিলেন, ভালো কথা বলেছেন, কিন্তু মানুষের ভালবাসা পাবার আগেই পৃথিবী থেকে তাদের বিদায় নিতে হয়েছে। তারা চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে। আমি আমার সেই বন্ধুদের স্মরণ করছি।

আমি স্মরণ করছি আমার গর্ভধারিণী মা-কে, যিনি অত্যন্ত সংগ্রামমুখর জীবন কাটিয়ে গেছেন আমাদের আট ভাইবোনকে মানুষ করতে। আমরা প্রত্যেকেই হয়তো জগতে আর দশজনের চোখে তেমন সফল হতে পারি নি,

কিন্তু কেউ চোর-বাটপার নষ্ট কোনো মানুষ হই নি।

আমার বাবা বলতেন, সবসময় নিজেকে জিজ্ঞেস করবে–'আমি এখানে কী করছি?' অর্থাৎ আমি কেন? এমন নয় যে, এই জীবনপ্রবাহের ভেতর দিয়ে আমি ভেসে চলেছি। আমাকে প্রতিমুহূর্তে জানতে হবে, জিজ্ঞেস করতে হবে নিজের কাছেই যে, 'আমি কে? আমি কী করছি?'

আমার বাবা এটা নিজে করেছেন। তিনি কলকাতায় ডাক্তারি করতেন, একপর্যায়ে সেটা ছেড়ে এ-দেশের প্রত্যন্ত একটা গ্রামে এসে সারাজীবন কাটিয়েছেন। মানুষকে চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন। আজ এই দূরবর্তী পাহাড়প্রান্তে আমার বাবার কথা মনে পড়ছে। আমার সেই পিতার মতো মহাজাতকও একটি দূরবর্তী জায়গায় এসেছেন, কেবল মানুষের জন্যে। তার যতটুকু সাধ্য আছে তা দিয়ে মানুষের জন্যে কিছু করবার লক্ষ্যে।

এই মঞ্চে বহু অনুষ্ঠান হবে। এই মঞ্চ এই খোলা আকাশের নিচে ঘুমিয়ে থাকবে না। এখানে প্রাণ জেগে উঠবে। এখানে সত্যের উচ্চারণ হবে। এখানে মানুষের কলকণ্ঠে জীবনের বন্দনা আমরা শুনতে পাব। আমি তার দিকে কান পেতে থাকলাম।

আমি যেখানেই থাকি আমার প্রাণ এখানেই রয়ে গেল। আপনাদের সবাইকে অভিবাদন জানাই। জয় হোক মানুষের। কল্যাণ হোক। ঈশ্বর আরো কাজ করবার শক্তি কোয়ান্টামকে দিন।



'আলোকিত মানুষ চাই' আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩০০ উচ্ছ্বাস-১৪ ব্যাচে অংশ নেন। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় তিনি এ ভাষণ দেন।

কাজই নেতিবাচকতা বিনাশ করে জীবনে সত্যিকার আনন্দ আনে

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

একটা বইয়ে পড়েছিলাম গল্পটা।

হঠাৎ দুর্ঘটনায় এক লোকের একমাত্র ছেলে মারা গেল। লোকটি সেই কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না। অসহ্য সে কষ্ট। তিনি ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছেন। এই যখন অবস্থা, তার ছোট মেয়েটা একদিন বলল, বাবা আমাকে একটা নৌকা বানিয়ে দেবে?

মেয়ের আবদার রাখতে তিনি নৌকা বানাতে বসলেন। এবং কয়েক ঘণ্টা ধরে কাঠ কেটে জোড়া দিয়ে একটা নৌকা বানালেন। তারপর মেয়ের হাতে দিলেন সেটা। সেই মুহূর্তে হঠাৎ তার মনে হলো, ছেলে মারা যাওয়ার পর এই প্রথমবারের মতো কয়েকটা ঘণ্টা তিনি দুঃখের হাত থেকে বেঁচে ছিলেন। অনেকটাই শান্তিতে ছিলেন।

তিনি এর উত্তর খুঁজতে চাইলেন এবং বুঝলেন, গত কদিনে এই কয়েকটা ঘণ্টাই কেবল তিনি তার ছেলেটার কথা ভাবেন নি। কেন ভাবেন নি? ভাবার কোনো সময় তিনি পান নি। কেন?

কারণ তিনি চিন্তা করে দেখলেন, মানুষ যখন কাজ করে তখন সে একসঙ্গে দুটো কাজ করতে পারে না। আমি কবিতাও লিখছি, আবার

রসগোল্লাও খাচ্ছি। দুটো কি একসঙ্গে হয়? সুতরাং যখন তিনি নৌকা বানাতে গেছেন, তিনি কাজের মধ্যে ঢুকে গেছেন, মগ্ন হয়ে থেকেছেন। ফলে সমস্ত দুঃখ-শোক-যন্ত্রণা তিনি ভুলে ছিলেন ওই সময়টুকুতে। ফলে সময়টা তার ভালো কেটেছে।

আর এই বাস্তব উপলব্ধিটাই লোকটিকে সে যাত্রায় বাঁচিয়ে দিল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমি কাজ করব। যতক্ষণ কাজ করব, অন্তত ততক্ষণ তো আমি শান্তি পাব। কষ্ট ভুলে থাকতে পারব। তিনি কাজ শুরু করলেন। একসময় ঠিকই পুত্রশোক তিনি কাটিয়ে উঠলেন।

সুতরাং দেখুন, কাজ মানুষকে কীভাবে বাঁচিয়ে দেয়। দেখবেন, যে যত বেশি কাজ করে সে তত ভালো থাকে। আনন্দে থাকে। সবরকম নেতিবাচকতা থেকে সে মুক্ত থাকে। একটা ইতিবাচক অনুরণন তাকে ঘিরে থাকে সবসময়।

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে আমাদের, সেটি হলো, যে কাজ করে সে-ই সফল হয়। ধরা যাক, একটা দিনে আমরা ২২টা কাজ করি। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হই কয়টাতে? আমার তো মনে হয়, এমন একেকটা দিন যায়–কোনো ব্যর্থতাই হয় না।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে কি আপনি ব্যর্থ হয়েছেন? আপনি কি নাশতা করতে ব্যর্থ হয়েছেন? আপনি কি অফিসে যেতে ব্যর্থ হয়েছেন? অফিসে বা কর্মক্ষেত্রে যতগুলো কাজ হাতে নিয়েছিলেন, তার কয়টাতে ব্যর্থ হয়েছেন? অধিকাংশই সুন্দরভাবে করতে পেরেছেন, হয়তো সবগুলোই।

অতএব, চিন্তা করে দেখুন, একটা দিনে প্রায় কোনো কাজেই আমরা ব্যর্থ হই না। তবু আমি ধরলাম যে, দিনে ২২টা কাজ যদি আমি করি, তাহলে অন্তত দুটো কাজে আমি ব্যর্থ হতে পারি। অর্থাৎ ২০টা কাজে আমি সফল হলাম। ২০টা কাজে আমি সফল হলাম মানে ২০টা আনন্দ আমার সেদিন হলো। ২০টা আনন্দ আমি পেলাম একদিনে।

তো, একদিনে যদি আমি ২০টা আনন্দ পাই, তাহলে এক মাসে কতগুলো আনন্দ পাব? ৬০০ আনন্দ। এক বছরে? ৭২০০ আনন্দ। ৬০ বছর যদি আমি বাঁচি, তাহলে কতগুলো আনন্দ হবে আমার সারাজীবনে? প্রায় পাঁচ লক্ষ আনন্দের সাগরে ভাসতে ভাসতে আমি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেব। সেদিন এ পৃথিবীর বিরুদ্ধে কি আমার কোনো অভিযোগ থাকবে? আমি পারি নাই, আমার হয় নাই, আল্লাহ আমাকে আর কয়টা দিন সময় দাও–এমন কোনো আক্ষেপ কিংবা অতৃপ্তি কি আসবে? আসবে না।

মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথ তার গানে লিখেছেন–

সমুখে শান্তিপারাবার–
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথি, লও লও হে ক্রোড় পাতি–
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার ॥
মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।
হয় যেন মর্তের বন্ধনক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়–
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজানার ॥

অর্থাৎ আমার সামনে শান্তির সমুদ্র, হে ঈশ্বর, আমার তরণী ভাসিয়ে দাও। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমি এখন তৃপ্তি আর আনন্দ নিয়ে চলে যেতে পারি।

কিন্তু আমরা সবাই কি সেটা পারি? মৃত্যু এলে কি বলতে পারি যে, আল্লাহ, আজ আমার বড় আনন্দের দিন, লক্ষ লক্ষ আনন্দের সাগরে ভাসতে ভাসতে আমি সুখে পরিপূর্ণ হয়েছি। আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা বলতে পারি না। কেন? কারণ, আমরা ফাঁকি দিয়েছি। আমরা সময়ের কাজ সময়ে করি নি। অসংখ্য কাজ আমাদের অসমাপ্ত রয়ে গেছে। জীবন পড়ে আছে অদগ্ধীভূত অবস্থায়।

একটা মোমবাতির সাফল্য কোথায়? শুধু দাঁড়িয়ে থাকায়? না, জ্বলে জ্বলে তার আলোয় চারপাশকে আলোকিত করায়। এটাই তো মোমবাতির সাফল্য। আমাদের জীবনের সাফল্য কী? কাজের ভেতর দিয়ে, কাজের আনন্দের ভেতর দিয়ে জ্বলে জ্বলে একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ায়।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন, আমি একজীবনে দুই জীবনের কাজ করে গেলাম। তাহলে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এই মানুষের দুঃখ থাকবে কীভাবে? দুঃখ তো আমরা যারা ফাঁকিবাজ, তাদের। আমরা যারা কাজ ফেলে রেখেছি। সময় চলে গেছে, কাজ করি নি। অনেক কিছু অসমাপ্ত, অনেক কিছু অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

মানুষ হিসেবে আমরা সবাই-ই তো অল্প সময় নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি। ষাট সত্তর আশি নব্বই, বড়জোর একশ বছর–এই তো। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, নিউটন, আইনস্টাইন, এমনকি রসুল (স), গৌতম বুদ্ধ, যিশু খ্রিষ্ট– তারা কি কেউ এর চাইতে বেশি সময় পেয়েছিলেন? আর দশজন সাধারণ মানুষের সাথে এঁদের পার্থক্যটা কোথায় তাহলে?

পার্থক্যটা হলো কাজে। এসব বড় মানুষেরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে প্রজ্জ্বলিত করে গেছেন। কাজের আনন্দে বেঁচে থেকেছেন। জীবনকে ব্যবহার করে গেছেন সুপূর্ণভাবে।

আমরাও যদি জীবনকে ওভাবেই ব্যবহার করি, জীবনকে প্রজ্জ্বলিত করি, জ্বালিয়ে রাখি, কাজ দিয়ে ভরিয়ে তুলি, কাজের আনন্দে মেতে থাকতে পারি তাহলে এই মানবজীবন ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। এবং মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আমরাও তখন হাসতে হাসতে চলে যেতে পারব পরকালে। আর যদি সেটা না করি, তবে নিশ্চয়ই তার শাস্তি থাকা উচিত। শুধু যে পাপের শাস্তি থাকা উচিত, তা তো না; আমি মনে করি, আলসেমিরও শাস্তি থাকা উচিত। সময়ের কাজ সময়ে না করার শাস্তি থাকা উচিত। আর সমস্ত আলসেমি, অক্ষমতাকে জয় করা যায় কেবল কাজ দিয়ে।

আমি বলি, কাজ হচ্ছে গঙ্গাজল। কাজই মানুষকে দুঃখের হাত থেকে বাঁচায়। হতাশা, বিষণ্নতা, ভয় ইত্যাদি নেতিবাচকতার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। কাজ এমনই এক আশ্চর্য জিনিস, যা মানুষকে ক্রমাগত এক ইতিবাচক কর্মশক্তি ও উজ্জীবনে আলোকিত করে রাখে।



বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বাংলাদেশে পাপেট শিল্পের পথিকৃৎ মুস্তাফা মনোয়ার। বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক মহাপরিচালক ও একুশে পদকে ভূষিত এ চিত্রশিল্পী কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৫০ ব্যাচে সস্ত্রীক অংশ নেন। কোর্সের প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে তিনি এ বক্তব্য দেন।

জানা কথাগুলোই পরিণত হলো নতুন সম্পদে

মুস্তাফা মনোয়ার

এখানে বলতে পারাটাই একটা দারুণ সৌভাগ্যের কথা। অনেকের সুস্থতা, রোগমুক্তি ও সাফল্যের কথা শুনলাম–এটা কীভাবে হয়েছে? কিছু কথা শুনে হয়েছে। কারণ এ চার দিন ধরে যিনি এখানে বলেছেন তার বলার ভঙ্গি, শব্দচয়ন, সুর এবং কথা বলার যে ছন্দ, গতি, তাল সবকিছু মিলে যা প্রকাশ করলেন–সেই প্রকাশের শক্তিটা একটা বিশাল ব্যাপার। আর কথা বলে যে মানুষকে কতখানি অনুপ্রাণিত করা যায় এবং তার দেহ-মনের শুশ্রূষা করা যায়, তা তো আমরা এই কদিনে দেখলাম। গুরুজীকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমরা সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা শিখলাম, তা হলো, জীবন চলার পথে নানা দুর্বলতা ও অশান্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে শিখলাম। আমরা আগেও এটা পারতাম কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে পারতাম। কিন্তু এখন কী শিখলাম? এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি।

একটি গাছ, তার বড় বড় পাতা। ডালপালা মোটামুটি শক্ত। একসময় ঝড় এলো। সব পাতাগুলো ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে ঝরঝর করে কিছু পড়ে যাচ্ছে। কিছু ডাল ভাঙছে। এভাবেই গাছটা ঝড়কে প্রতিহত করতে চেষ্টা করছে। মোটামুটি কিছুটা পেরেছে, কিছু পারে নি। এর মধ্যে অনেক পাতা

ঝরে গেছে। কিন্তু নীচের দিকে কয়েকটা ফুল রয়েছে, তারা পড়ল না, তেমনিই আছে সব।

এদিকে পাতারা ভীষণ চটে গেছে ফুলের ওপর যে, দেখ, তোমাকে বাঁচাতে আমরা এত লড়লাম আর তুমি কিছুই করলে না? তুমি বাধাও দিলে না ঝড়টাকে? তখন সেই ফুলগুলো বলল, এটা ঠিক যে, আমি এ ঝড়কে বাধা দেই নি। তবে আমি ভবিষ্যতের অনেক বড় বড় ঝড়কে বাধা দেবার চেষ্টা চালিয়ে গেছি। কীভাবে?

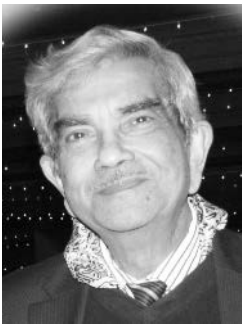
ফুলগুলো তখন বলল, আমার ভেতরে যে বীজ আমি তৈরি করেছি সেটা নীচে পড়ে একদিন এখানে অরণ্য তৈরি হবে। সেই সুবিশাল অরণ্য এর চেয়েও অনেক বড় বড় ঝড়কে প্রতিহত করবে। এই চার দিনে এ কোর্সের মধ্য দিয়ে গুরুজী আমাদের জন্যে সেই অরণ্যই তৈরি করলেন। কেবল একটি ঝড় নয়, যাতে আরো অনেক ঝড়কে আমরা ঠেকিয়ে দিতে পারি।

সেজন্যে আমরা বলতে পারি, ব্যক্তিগত ভালো লাগা, ব্যক্তিগত সুস্থতা, ব্যক্তিগত উপকার ও সাফল্য তো আমরা পেলামই, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হলো, সার্বিকভাবে এখান থেকে যা আমরা পেলাম, গুরুজী যা যা যেভাবে করালেন এবং বললেন, সেটা একটা বিরাট ঘটনা। এটা প্রত্যেকের অন্তরের মধ্যে গেঁথে রাখা উচিত। চর্চা তো করাই উচিত এবং একে আরো বিস্তৃত করা উচিত। বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গিসহ সবকিছু মিলিয়ে এটা একটা অসাধারণ ব্যাপার, এটা আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি।

আরেকটা ব্যাপার হলো, আমরা যে ছবি আঁকি সেখানেও একধরনের মেডিটেশন আছে। ছবি আঁকার সময় আমরা কিছু দৃশ্য দেখি, আবার দেখি না। প্রথমে কল্পনা করি, তখন হয়তো সেটা তৃতীয় নয়নে থাকে, তারপর সেটা মনে মনে গুছিয়ে নিই। এরপর আমরা তা আঁকি। এই যে গুছিয়ে নেয়ার যে ব্যাপার, এখানেও মেডিটেশনের একটা ভূমিকা রয়েছে। তাই জীবনকে গুছিয়ে নেয়া তো বটেই, ছবি আঁকার ব্যাপারেও এই মেডিটেশন বহু ভাবে কাজে লাগবে বলে আমি মনে করি।

আর সবশেষে বলি, এ কোর্সে আলোচিত অধিকাংশ বিষয় আমাদের অনেকের জানা ছিল কিন্তু এর মর্ম হয়তো আমরা ততটা বুঝতে পারি নি। সেই জানা কথাগুলোই যখন গুরুজী সাজিয়ে-গুছিয়ে দিলেন তখন মনে হলো, এ এক আলাদা রূপ। আর এ রূপে আমাদের জীবনে তা নতুন অর্থে নতুন সম্পদে পরিণত হয়েছে। আমরা এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি বটে, নিয়ে যাচ্ছি আমাদের জীবনের জন্যে বিরাট এক সম্পদ।

অধ্যাপক ড. জামাল নজরুল ইসলাম। প্রয়াত এই গাণিতিক-পদার্থবিজ্ঞানী মহাবিশ্বের উদ্ভব ও পরিণতি নিয়ে মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে ছিলেন বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি গবেষণা ও শিক্ষকতা করেছেন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি, ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্বখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। ১৯৮৩ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত ও বিজ্ঞানের জগতে বহুল সমাদৃত তার 'দি আলটিমেট ফেট অব দি ইউনিভার্স' বইটি অনূদিত হয় বিশ্বের একাধিক ভাষায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস ও একুশে পদকে ভূষিত ড. ইসলাম ২০০৯ সালের ৬ মে কোয়ান্টাম আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় এ বক্তব্য দেন।



ধ্যান ও শান্তির বাণী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে

অধ্যাপক ড. জামাল নজরুল ইসলাম

কারো কারো মধ্যে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, বিজ্ঞানীরা বুঝি ধর্মের বিরোধিতা করেন। এ ধারণার পেছনে কী যুক্তি আছে জানি না, তবে কথাটা সঠিক নয়। খোদ আইনস্টাইন বলেছেন–Religion without science is blind and science without religion is lame. অর্থাৎ বিজ্ঞান ব্যতীত ধর্ম অন্ধ আর ধর্ম ব্যতীত বিজ্ঞান পঙ্গু।

আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি না যে, আইনস্টাইন কেবল ভদ্রতার খাতিরে ধর্মের প্রশংসা করেছেন; বরং বলা যায়, তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি থেকেই তিনি এমনটি বলেছেন।

বিশ্বজুড়ে সমসাময়িক ঘটনাবলি দেখে একটি কথাই মনে হয় যে, মানুষ এখন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দৈত্য কিন্তু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বামন। মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালনা ও সুদূরপ্রসারী প্রয়োজনের তাগিদে একটি ব্যাপক আত্মিক ও ধর্মীয় মনোভাবের সূত্রপাত ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু যথেষ্ট কার্যকরভাবে আমরা এর বিকাশ ঘটাতে পারি নি।

যার ফলাফল হলো পৃথিবীজুড়ে আজকের এত সহিংসতা। আমি নিজে বিশ্বাস করি–ধর্ম এমন একটি চমৎকার কাঠামো ও ব্যবস্থা, যা মানুষের

নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নের দিকে নিয়ে যায়।

পবিত্র হাদীসের বাণীগুলো আমার খুব ভালো লাগে। যার মধ্যে একটি হলো, *দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করো।* এছাড়াও বলা হয়েছে, *জ্ঞান অর্জনের জন্যে প্রয়োজনে চীন দেশে যাও।* তৎকালীন চীনের ধর্ম, জীবনধারা ও সংস্কৃতি ছিল আরবের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে চীনে যাওয়ার আহ্বান নিঃসন্দেহে নবীজী (স)-এর উদার মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটায়। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমানরা সেই উদার মনোভাবের অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছিল।

একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, *আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে/ হেনেছে নিঃসহায়ে।* এই 'গোপন হিংসা' অতীতে এবং বর্তমানে বহু দেশে, বহু জনপদে মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে অশান্তি ও বর্বরতা।

শুধু বিংশ শতাব্দীতেই সংঘটিত দুই মহাযুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রায় পাঁচ কোটি নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। যার মধ্যে আড়াই কোটিই ছিল নারী ও শিশু, এবং এরা কোনোভাবেই যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না।

পবিত্র কোরআনে বার বার বলা হয়েছে, *আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।* কিন্তু আমরা প্রায় সবদিকেই যথেষ্ট সীমালঙ্ঘন করেছি এবং করছি। বিশ্বব্যাপী অস্ত্র বিক্রির জন্যে তথাকথিত উন্নত দেশগুলো আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। আর আমরা পরিণত হয়েছি তাদের নির্বোধ শিকারে। কিন্তু এ পরিস্থিতির পরিবর্তন দরকার। আর এজন্যে প্রয়োজন সচেতনতা।

আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এমন কিছু সমস্যা সৃষ্টি করেছে, যার সমাধান শুধু বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানীদের দ্বারা সম্ভব নয়। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে বিপুল পরিমাণে ভোগ্য ও বিলাসদ্রব্য এখন উৎপাদিত হয়, যা সমাজের চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি। এরই পরিণাম হচ্ছে মাত্রাজ্ঞানহীন অপচয় আর পরিবেশ দূষণ। ফলে আবির্ভাব ঘটেছে একটি ভোগবাদী সমাজের। শুধু তা-ই নয়, প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার এবং অত্যাচার-নিপীড়নের নানা পদ্ধতিরও উদ্ভব ঘটেছে।

এই অত্যাচার-নিপীড়ন আর শোষণের প্রক্রিয়া চলে নানান রকমে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দারিদ্র্যমোচনের নামে চলে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। চলে বিভিন্ন এনজিও-র মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্যের ছড়াছড়ি। বাংলাদেশেও তা-ই।

কিন্তু আমরা বিদেশি হস্তক্ষেপ চাই না। স্বাধীন দেশে মুক্তভাবে নিঃশ্বাস

নিতে চাই। বিদেশি সংস্থাগুলো একদিকে সাহায্য দেয়, আবার অন্যদিকে কনসালটেন্সি ও বিভিন্ন শর্তে তারাই এর বিরাট অংশ ভোগ করে। আর এভাবেই তারা শোষণ করে অনুন্নত দেশগুলোকে। তাই এ ভিক্ষাবৃত্তিক সংস্কৃতি থেকে যেভাবেই হোক বেরিয়ে আসা চাই আমাদের।

বিদেশি মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর কথায় আসি। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্য, জাতীয় অর্থনীতি এবং সেইসাথে জাতীয় কর্মঘণ্টার ওপর চরম আঘাতকে আমরা বিনা বাধায় গ্রহণ করে নিয়েছি।

এছাড়াও স্বাস্থ্যের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর বিভিন্ন খাবার ও কোমল পানীয়ের বিজ্ঞাপন আমাদের মিডিয়াগুলোতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে। আমরা প্রতিবাদ করছি না, করতে পারছি না। কিন্তু এসব বর্জন ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মানসিকতা সৃষ্টিতে আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে জনকল্যাণমূলক সচেতনতা সৃষ্টি করছে বলে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে আমি সাধুবাদ জানাই।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মেডিটেশন বা ধ্যানচর্চায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তুলছে। মেডিটেশন অত্যন্ত ইতিবাচক একটি বিষয়। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মেডিটেশনের চর্চা হয়ে আসছে। ধর্মের একটি অঙ্গ হচ্ছে এই চিন্তা বা ধ্যান। কারণ, প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে কোনো না কোনোভাবে রয়েছে ধ্যানের প্রভাব।

মেডিটেশন বা ধ্যানের গুরুত্ব রয়েছে প্রত্যেক মানুষের জীবনেই। কারণ, ধ্যানেই শক্তি, ধ্যানেই মুক্তি, ধ্যানেই সকল অর্জন। তাই আমাদের ধ্যান ও শান্তির বাণী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে।

বর্তমানে দেশে-বিদেশে সর্বোপরি সারা পৃথিবীজুড়ে এত যে অবক্ষয়, সন্ত্রাস আর দুর্নীতি–এজন্যে শুধু যে খারাপ লোকেরা দায়ী তা নয়; এর অন্যতম কারণ হলো, আমরা ভালো মানুষেরা সঙ্ঘবদ্ধ নই। তাই পরস্পরকে দোষারোপ করে নয়; বরং একত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ভালো কিছু কাজ করার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলতে পারি।

পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সেবার ক্ষেত্রে চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কোয়ান্টাম। এটি অবশ্যই সমাজে একটি ইতিবাচক প্রভাব রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আর সে কারণেই কোয়ান্টামের কাছে দেশের মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম। বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ 'বাংলাপিডিয়া' তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ও কর্মোদ্যোগের ফসল। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে স্যার যদুনাথ স্বর্ণপদকে ভূষিত ড. সিরাজুল ইসলাম বাংলাদেশের একমাত্র ইতিহাসবিদ, যিনি ব্রিটেনের রয়েল হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির সম্মানিত ফেলো মনোনীত হয়েছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন।



ইতিহাসের জ্ঞান আমাদের বর্তমানকে বুঝতে সাহায্য করে

অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম

তখন আমরা এশিয়াটিক সোসাইটিতে বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে একটি কাজ করছিলাম। পরবর্তীতে যা বাংলা ও ইংরেজিতে মোট ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। সেই কাজটি করতে গিয়ে ইতিহাসের অনেক নাম, স্থান, ঘটনার বিবরণ ও তারিখ ইত্যাদি জানার প্রয়োজন হচ্ছিল। দেখা যেত, ছোট্ট একটি তথ্য খুঁজে পেতে অনেক সময় চলে যাচ্ছে।

তখনই *এনসাইক্লোপিডিয়া*-র মতো আমাদের নিজস্ব একটি রেফারেন্স বইয়ের প্রয়োজনীয়তাটা অনুভব করলাম। মনে হলো, বাংলাদেশ বিষয়ে এমন সব তথ্যগুলোকে একসাথে গ্রন্থভুক্ত করতে পারলে বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়। আমাদের সেই চিন্তারই ফসল আজকের *বাংলাপিডিয়া*।

বিশ্বজুড়েই এশিয়াটিক সোসাইটি একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। এর প্রতি মানুষের একটি আস্থা আছে। তাই এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে আমরা যখন উদ্যোগ নিলাম তখন সরকারের পাশাপাশি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, বিভিন্ন ব্যাংক এবং বেসরকারি

প্রতিষ্ঠান এ কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। অনেকের সম্মিলিত সহযোগিতায় একসময় প্রয়োজনমাফিক পাঁচ কোটি টাকার পুরোটা জোগাড়ও হয়ে গেল।

আমরা কাজ শুরু করলাম। দেশে এবং বিদেশে বাঙালিদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যারা ছিলেন, তাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের প্রয়োজন আর কাজের ধরনটা বুঝিয়ে দিলাম। যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাকে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দের মধ্যে নিবন্ধ লিখে দেয়ার আহ্বান জানালাম। তারপর ২০ সদস্যের একটি অভিজ্ঞ সম্পাদকমণ্ডলী পুরো কাজটি সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করলেন। সবমিলিয়ে এতে কাজ করেছেন প্রায় দুশ জন কর্মী।

বিশ্বকোষের আঙ্গিকে সম্পূর্ণ নিজেদের এরকম একটি সংকলন তৈরি করার কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ছিল না। তাই বিশ্বের বিভিন্ন বড় বড় ও বিখ্যাত বিশ্বকোষ যেমন–*এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা*-তে কাজ করেছেন এমন পণ্ডিত ব্যক্তিদের আমরা আমন্ত্রণ জানাই। নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে তারা আমাদের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেন।

একসময় আমাদের ১০ বছরের চিন্তা-স্বপ্ন-শ্রম বাস্তব রূপ পেল। সৌভাগ্যই বলতে হবে, আমরা সফল হলাম। প্রকাশিত হলো বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়া।

প্রকাশের পর থেকেই *বাংলাপিডিয়া* বেশ সাড়া জাগিয়েছে। তথ্যের সহজলভ্যতার কারণে আইডিয়াটা সবারই পছন্দ হয়েছে। ফলে এটি বিক্রিও হয়েছে প্রচুর। প্রথম সংস্করণে বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই ১০ খণ্ডে এবং দ্বিতীয় সংস্করণে এটি ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও সিডিতে এবং অনলাইনেও *বাংলাপিডিয়া* পাওয়া যাচ্ছে। অনলাইন বিশ্বকোষ *উইকিপিডিয়া* এবং সার্চ ইঞ্জিন *গুগল* ইতোমধ্যেই আমাদের কাছ থেকে এটি নিয়েছে এবং রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করছে। এখন প্রতি মাসে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে শুধু আমাদের ওয়েবসাইটেই এটি খোঁজ করা হচ্ছে গড়ে ৩০ লক্ষ বারের চেয়ে বেশি। বলা যায়, বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিচ্ছে *বাংলাপিডিয়া*।

পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে নানা দিকে এগিয়ে আছে, এমন অনেক দেশ এখনো নিজস্ব জ্ঞানকোষ সংকলন করতে পারে নি। *বাংলাপিডিয়া*-র মতো এমন একটি ব্যাপক আকারের কাজে আমরা যে শেষ পর্যন্ত সফল হতে পেরেছি, তার প্রধান কারণ হলো, আমরা আমাদের সীমিত সুযোগ ও

সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পেরেছি। সেইসাথে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আমরা অনেকগুলো মানুষ একত্রিত হয়ে কাজ করেছি।

আর এ কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের একটি বাস্তব উপলব্ধি হলো, কোনো একটি লক্ষ্যের জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও একত্রিত হলে আমরা যে-কোনো কাজে সফল হতে পারি।

এই যে একত্রিতকরণ, এটা আবার করতে হয় একজনকে। আর এখানেই আসে নেতৃত্বের প্রশ্ন। সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্ব সবখানে আসলে এজন্যেই প্রয়োজন। এই নেতৃত্বটা আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন পরিমণ্ডলে এসেছে। ফলে শিল্পায়ন ও সামাজিক নানা ক্ষেত্রে এখন অনেক ভালো ভালো কাজ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

এদের সবাইকে একত্রিত করে একটি সম্মিলিত জাতীয় শক্তিতে রূপ দিতে চাইলে এখন আমাদের চাই একটি আস্থাপূর্ণ নেতৃত্ব। তাহলে সত্যিই আবার আমরা একটি সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত হতে পারব–যেমনটা আমরা একসময় ছিলাম।

আজকে পাশ্চাত্যের যে বৈষয়িক সমৃদ্ধি, সেটি এসেছে মূলত তাদের শিল্প-বিপ্লবের পথ ধরে। ১৮ শতকের শেষ সিকিতে ইউরোপে আর ১৯ শতকের প্রথম দিকে আমেরিকায়–এ দুটো শিল্প-বিপ্লবের পেছনে রয়েছে তাদের ঔপনিবেশিক বাণিজ্য। বিশেষত ভারতবর্ষ ও বাংলার সাথে বাণিজ্য। অর্থাৎ তাদের দেশে শিল্পায়নের মূল উপাদান ও পুঁজি সরবরাহ করেছি আমরা।

অর্থাৎ আমাদের সম্পদ নিয়ে তারা বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য করেছে, আমরা সেটা পারি নি। কারণ আমাদের সম্পদ ছিল ঠিকই, কিন্তু দায়িত্বটা আমরা নিতে পারি নি। আর এটি তখনই সম্ভব, যখন আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে পারব। ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের তা-ই বলে।

ইতিহাস আসলে এমন একটি বিষয়, যা জানা থাকলে মানবসভ্যতার উত্থান-পতন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার গতিপ্রকৃতিগুলো আমরা সহজেই বুঝতে পারি। বিশ্বসভ্যতার পরিবর্তনের ধারাগুলো সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাই। আর এর আলোকে আমরা বর্তমানকে তুলনামূলক ভালো বুঝতে পারি। বর্তমানকে ভালোভাবে মোকাবেলা করতে পারি।

উন্নয়ন আর প্রযুক্তিতে পাশ্চাত্য অনেকখানি এগিয়ে গেছে সত্যি। কিন্তু তা এখন এমন একটি অবস্থানে গিয়ে পৌঁছেছে, যা ধরে রাখার প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ আজ তাদের নেই। এ কারণে সারা পৃথিবী থেকে তারা লোক নিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের নিজেদেরকে এখন দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে তরুণদের যোগ্যতর করে গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দিতে হবে আমাদের।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে আমি গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছে, তরুণদের জন্যে অত্যন্ত অনুপ্রেরণামূলক একটি কার্যক্রম এটি। এতজন মানুষকে একত্রিত করে এরকম একটি কার্যক্রম পরিচালনা করা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি অনেক কিছু করতে না পারি, কিন্তু আমার সাধ্যমতো কিছু তো করতে পারি–এ ধরনের কার্যক্রম সবার মাঝে এ বোধটুকু জাগিয়ে তুলবে বলে আমার বিশ্বাস।

দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবু আহমেদ। অর্থনীতি ও পুঁজিবাজার বিষয়ে তার লেখা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য-প্রতিবেদনগুলো দেশের শীর্ষস্থানীয় বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, যা সাধারণ পাঠকসহ নীতি-নির্ধারণী মহলে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। অধ্যাপক আবু আহমেদ কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৩৯ ব্যাচে অংশ নিয়েছেন।



কোয়ান্টাম মেথড একটি মানবিক কার্যক্রম

অধ্যাপক আবু আহমেদ

খুব ছোটবেলায়, আমি যখন ক্লাস ওয়ানে পড়ি তখন আমার মা মারা যান। মা-কে বেশিদিন পাই নি বলে তার চেহারা বা কোনো স্মৃতিই আমার তেমন মনে নেই। এখনো গ্রামে গেলে আমি মায়ের কবরের কাছে যাই, নামাজ পড়ে তার জন্যে দোয়া করি। কিন্তু কখনো তাকে সেভাবে অনুভব করতে পারি নি।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের চতুর্থ দিন পারিবারিক মেডিটেশনে আমি বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম, খুব কেঁদেছিও আমি সেই মেডিটেশনে। কারণ, সেদিন আমি ভীষণভাবে অনুভব করেছি আমার মা-কে, আমার বাবা-কে। বাবা-মায়ের কাছে মাফ চেয়েছি তাদের সেবা করতে পারি নি বলে।

আমার এ অনুভূতি থেকে বলতে পারি, কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি সামগ্রিক অর্থে একটি মানবিক কার্যক্রম। যে-কোনো বয়সের প্রতিটি মানুষ এখানে এসে একটি অসাধারণ মানবিক অনুভূতিতে জেগে উঠতে পারেন। মনোদৈহিকভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারেন।

অনেকে বলেন, জীবন এখন অনেক কঠিন হয়ে উঠছে। কিন্তু জীবন আসলে কখনোই সহজ ছিল না। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত একটি গ্রামের খুব সাধারণ পরিবারে আমার জন্ম হয়েছে বলে জানি, অর্ধশতাব্দী কিংবা তারও

আগে কত কঠিন জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ দিনযাপন করেছে। স্পষ্টই মনে আছে, বাবার সামান্য কিছু জমি ছিল, যাতে কৃষিকাজ করে সারাবছর আমাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা হতো। এর মধ্যে খাদ্যের অভাব পড়লে বাড়তি কাজের জন্যে বাবাকে শহরে যেতে হতো। কখনো-বা রেশনের চালই ছিল ভরসা।

সবমিলিয়ে শৈশবের সে সময়টা দারুণ সংকটময় ছিল আমার জন্যে। একদিকে মা নেই, তার ওপর আর্থিক অনটন। বাবা প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন, আমার ছেলেটাকে যদি ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়াতে না পারি, তাহলে আর হাইস্কুলে ভর্তি করিয়ে কী লাভ?

এমন একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্য দিয়ে তখন আমাকে পড়াশোনা চালিয়ে নিতে হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত আমি পঞ্চম শ্রেণিতে মেধাতালিকায় বৃত্তি পাই। তা না হলে আমার পক্ষে আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াই সম্ভব হতো না। কোনোরকমে জীবন ধারণের জন্যে বাবা হয়তো আমাকে কোনো কারিগরি কাজে নিয়োগ করতেন। কিন্তু বৃত্তি পাওয়াতে পড়াশোনার খরচ নিয়ে আর চিন্তা করতে হয় নি বাবাকে।

একসময় হাইস্কুলে ভর্তি হলাম। তারপর বাড়ি থেকে বেশ দূরে লজিং থেকে পড়াশোনা করেছি। মাঝে মাঝে খারাপ লাগত, বাড়ির কথা মনে হতো খুব। অবশ্য পড়াশোনার ব্যাপারে আমার শিক্ষকরা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন আমাকে। আমার শিক্ষকদের প্রতি আমি তাই আজও গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করি। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি তাদের অবদান।

জীবনে ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্যে আমি একসময় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। সাফল্যের জন্যে আসলে পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। এর মাধ্যমে যে-কোনো কাজে দক্ষতা অর্জন সম্ভব। আর দক্ষ হলে প্রাচুর্য ও খ্যাতি আপনিই আসে। সেইসাথে চাই সততা।

ছাত্রদের সাথে দেখা হলে তাই বলি, আন্তরিক পরিশ্রম আর সততা দিয়ে তুমি তোমার কাজ করে যাও, রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা আল্লাহ করবেন। পদ ও ক্ষমতার দিক থেকে তুমি কত বড় তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তুমি কতটা সৎ ও পরিশ্রমী। আর আমি মনে করি, সব প্রাপ্তির জন্যেই স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কারণ, যে চিত্ত কৃতজ্ঞ সে সবসময় আরো পায়। স্রষ্টাই তাকে সাফল্যের পথ বাতলে দেন।

কথায় আছে, Every medicine is drug but all drugs is not medicine. আসলেই তাই। আমি নিজেও সবসময়ই চেষ্টা করি ওষুধ কম

খেতে। সুস্থতার জন্যে প্রাকৃতিক খাবার, শাকসবজি আর ফলমূল খাই। নিয়মিত হাঁটি, গ্রামে গিয়ে পুকুরে সাঁতার কাটি, বৃষ্টিতে ভিজি, কক্সবাজার গেলে সমুদ্রে সাঁতার কাটি।

কিন্তু বছর কয়েক আগে হঠাৎ একটু অসুস্থতা বোধ হলে ঢাকার একটি বড় 'ফাইভ স্টার' হাসপাতালে ভর্তি করা হলো আমাকে। ডাক্তাররা বিভিন্নরকম পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখলেন, তেমন জটিল কোনো রোগ নেই আমার। অথচ হাসপাতালে পাঁচ দিনে বিল হলো ৭৫ হাজার টাকা। তাতেও আমার কোনো দুঃখ ছিল না যদি সুস্থতার অনুভূতি নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারতাম। কিন্তু ফল হলো উল্টো–আমি আরো অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

সেই থেকে একটা রোগভীতি আমাকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে ফিরছিল। শরীর-মন ভেঙে যেতে লাগল। আমি যেন নিস্তেজ হয়ে গেলাম। ক্লাসে একসময় আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা করতাম, সেই আমি যেন ক্লাস নিতেই ভুলে গেলাম। ডিপার্টমেন্টেও তখন বলে দিয়েছিলাম–আমাকে ক্লাস না দিতে। সে-সময় আমি টিভি প্রোগ্রামেও খুব একটা যেতাম না।

এর মধ্যে ছাত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে কোয়ান্টামের কথা শুনলাম। মূলত তাদেরই পরামর্শে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম। এখানে এসে আমার উপলব্ধি হলো, আমার মূল সমস্যা অসুস্থতা নয়, বরং একটা অসুস্থতার বোধ-ই আমাকে এমন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল।

কোর্সের প্রথমদিন শেষে আমার মেয়ে জিজ্ঞেস করছিল, কোয়ান্টামে কী পেলে? আমি বলেছি, আমি বহুদিন একঘণ্টার কোনো মিটিংয়েও যাই না, সেই আমি যে ১০ ঘণ্টা ধৈর্য ধরে বসে কথা শুনছি–সেটাই তো একটা বিরাট অর্জন! মেয়েকে বলেছি, তুমিও কোয়ান্টামে যাও।

তারপর থেকে ওষুধের পরিমাণও আমি অর্ধেকে নিয়ে এসেছি, বাকিগুলোও ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিতে পারব বলে আমার বিশ্বাস। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে আমি আবার আমার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। আসলে যিনি অসুস্থ তার জন্যে শুধু নয়, যিনি সুস্থ তারও মনোদৈহিক সুস্থতা বজায় রাখার পাশাপাশি কর্মব্যস্ত সুখী জীবনযাপনের জন্যে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স একটি সুন্দর ও আদর্শ প্রক্রিয়া।

আমার একটি পরামর্শ হলো, কোয়ান্টামের উদ্যোগে একটি মনোরম হাসাপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হোক। বান্দরবান লামার নিবিড় প্রকৃতির মাঝে এটি স্থাপন করা যেতে পারে। বর্তমান সমাজের স্ট্রেস-আক্রান্ত ও নানামুখী চাপে ভারাক্রান্ত মানুষ কয়েকদিন ওখানকার আনন্দময় ও ধ্যানমগ্ন পরিবেশে

থাকবেন। নানারকম বৃক্ষ ফুল পাখি ও প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাবেন। এবং মেডিটেশন, কাউন্সেলিং, ব্যায়াম ও এ-জাতীয় অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে একটি স্নেহময় মনোদৈহিক শুশ্রূষার পর তারা সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন। আধুনিক সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা দিতে এটি এক কার্যকর পদক্ষেপ হবে বলে আমি মনে করি।

কোয়ান্টাম মানুষের চিন্তা ও জীবনযাপনের ধরন ইতিবাচকভাবে বদলে দিচ্ছে। আসলে এর মাধ্যমেই আমাদের সত্যিকারের কল্যাণ সম্ভব। কারণ, মানুষের ভুল চিন্তা, ভুল দৃষ্টিভঙ্গি আর ভ্রান্ত জীবনদর্শনই তো মানুষকে অশান্তির মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে। সমস্ত নেতিবাচকতার উৎপত্তিও এ থেকেই। এই যখন চারপাশের অবস্থা, কোয়ান্টাম তখন মানুষকে শুকরিয়া আর সবরের জীবনদর্শনে উদ্বুদ্ধ করছে। সুন্দর ও মানবিক এক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে তাই কোয়ান্টামকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে।

আমি সবসময়ই আশাবাদী একজন মানুষ। আমি বিশ্বাস করি, জাতি হিসেবে আমরা গরিব নই, গরিব থাকতে চেয়েছি বলেই আমরা গরিব রয়ে গেছি। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের তুলনায় আমাদের মোট জনসংখ্যার পরিমাণ এখন দ্বিগুণের চেয়ে বেশি। কিন্তু তারপরও তো মানুষকে না-খেয়ে থাকতে হচ্ছে না। সময়ের পথ ধরে এভাবে অনেকখানি এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ।

দেশের অর্থনীতিটা একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলে ধীরে ধীরে কর্মসংস্থান বাড়বে। এছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে আমাদের তরুণ প্রজন্ম দেশে-বিদেশে অনেক ভালো কাজ করছে। এখন প্রয়োজন তাদের নৈতিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ। আমি মনে করি, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।



প্রখ্যাত সাংবাদিক ও জাতীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী। প্রগতিশীল ছাত্রনেতা, ভাষাসংগ্রামী, বিপ্লবী রাজবন্দি, তেজোদীপ্ত সাংবাদিক–বহু পরিচয়ের বিরল সমাবেশ ঘটেছে তার অনন্য ব্যক্তিত্বে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন অকুতোভয় সাংস্কৃতিক যোদ্ধা হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তিনি পালন করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রাক্তন মহাপরিচালক কামাল লোহানী কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৪৮ ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন।

তরুণ প্রজন্ম আস্থা খুঁজে পাবে কোয়ান্টামে

কামাল লোহানী

১৯৪৬, দেশভাগের আগের বছর। কোলকাতায় তখন চলছে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ইতিহাসের জঘন্যতম হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ। ইতিহাসে যা 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে কুখ্যাত। ব্রিটিশ শাসকদের উসকানিতে সৃষ্ট সে দাঙ্গায় বহু হিন্দু মারা গেল মুসলমানের হাতে, অগণিত মুসলমান মারা গেল হিন্দুর হাতে। আক্রান্ত ও নির্যাতিত হলো অসংখ্য নিরীহ মানুষ। বাংলার হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও উদার মানবিক সংস্কৃতির ওপর ওটা ছিল এক ভীষণ আঘাত।

আমি তখন কলকাতায় ছোট ফুপুমা'র বাসায় থাকি। সে বছর আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। একদিন গড়ের মাঠের পার্শ্ববর্তী একটি এলাকায় দাঙ্গা হচ্ছে। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছি। একসময় শুরু হলো লুটপাট। সে এলাকায় তখন ছোট ছোট কিছু দোকান ছিল। যে যা পারছে দোকানগুলো থেকে জিনিসপত্তর হাতিয়ে নিচ্ছে। সবার দেখাদেখি আমিও দুটো লেমোনেডের বোতল নিয়ে নিলাম একটি দোকান থেকে।

বাড়িতে এলে পরে ফুপুমা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পেলি বোতলদুটো? ঘটনাটা বললাম তাকে। শুনে তিনি ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। রেগে গিয়ে

একসময় পেটাতেই শুরু করলেন আমাকে। প্রচণ্ড রাগের মাথায় ফুপুমা সেদিন কিছু কথা বলেছিলেন, যা আমাকে খুব নাড়া দেয়। আমি বুঝতে পারলাম, সাম্প্রদায়িকতা কী, আর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিণতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে!

শৈশবের এই একটি ঘটনা আমাকে প্রচণ্ড আলোড়িত করে। বলা যায়, এটি আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। মানুষের অধিকার ও আত্মমর্যাদাবোধের বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমি সচেতন হয়ে উঠি। সেদিন থেকেই আমি ধীরে ধীরে পরিণত হলাম একজন অসাম্প্রদায়িক চেতনাধারী মানুষে। খুঁজে পেলাম আমার জীবনের লক্ষ্য।

'৪৭-এ দেশভাগের পর দেশে চলে এলাম। ভর্তি হলাম পাবনা জিলা স্কুলে। ওখান থেকেই '৫২ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষার সপ্তাহ দুয়েক আগে ঘটল সেই ঐতিহাসিক ঘটনা। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আন্দোলনরত ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালাল পুলিশ। বেশ কয়েকজন ছাত্র-জনতা শহীদ হলেন। ঘটনার প্রতিবাদে সারা দেশ ফুঁসে উঠল।

এ-সময় দেশের অন্যান্য স্থানের মতো পাবনায়ও একটি বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। পাবনার সর্বস্তরের জনগণ অংশ নিয়েছিল তাতে। আমিও গিয়েছিলাম সে মিছিলে, যদিও রাজনীতির সাথে আমার কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা তখনো ছিল না। সে মিছিলে আমি কাউকে চিনি না, আমাকেও কেউ চেনে না। তবু গিয়েছিলাম, কারণ আমার শুধু একটা কথাই মনে হয়েছিল যে, ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদ করতে হবে।

পরবর্তীকালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে পড়ার সময় এক বন্ধুর প্রভাবে আমার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। একপর্যায়ে আমি রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠি। '৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হলে পাবনায় আমরা একটি কমিটি গঠন করেছিলাম।

এরপর '৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের আগে-পরে কয়েক দফা কারারুদ্ধ হই। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে একসময় সিদ্ধান্ত নিলাম–এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

সাহস করে চাচার কাছ থেকে পনেরোটা টাকা চেয়ে নিয়ে ঢাকা চলে এলাম। সেটা '৫৫ সালের কথা। সাংবাদিকতার প্রতি আগে থেকেই আগ্রহ ছিল। *দৈনিক মিল্লাতে* সাংবাদিক হিসেবে যোগ দিলাম। তারপর একে একে *দৈনিক আজাদ, সংবাদ, পূর্বদেশ, বার্তাসহ* বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছি। সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে একসময় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক

আন্দোলনের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে গেলাম।

এর মধ্যে '৬২-তে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-বিক্ষোভ হলো। সে ঘটনায় কয়েকজন সাংবাদিকের সাথে আমিও গ্রেফতার হলাম। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ২৬ নং সেলে সেবার আমি ছাড়াও ছিলেন সাংবাদিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ, রণেশ দাশগুপ্ত, তাজউদ্দীন আহমদ এবং শেখ মুজিবুর রহমান। ব্যক্তিগতভাবে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও, সেই সময় এবং পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাহচর্য ছিল আমার জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে একসময় কলকাতা চলে গেলাম। ওখানে আমি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বার্তা-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। সে সময়টা নিয়ে আমাদের অনেক স্মৃতি, অনেক ঘটনা।

১৬ ডিসেম্বর সকালবেলা। রেডিও-মনিটর করতে গিয়ে আমরা একসময় জেনারেল অরোরা-র সাথে জেনারেল নিয়াজী-র কথোপকথনটা ধরে ফেললাম। ওদের আলাপচারিতা থেকে বুঝলাম, সেদিন বিকেলেই পাক-বাহিনী আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম–যত দ্রুত সম্ভব এ সংবাদটা সবাইকে জানাতে হবে। আমিই লিখলাম ছোট্ট তিন লাইনের নিউজটা।

সবাই মিলে বললেন, আমাকেই পড়তে হবে খবরটা। নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ও গর্বিত মনে করি যে, সেদিন অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষ আর মুক্তিসেনাদের কাছে বহুল প্রতীক্ষিত বিজয়বার্তাটি পৌঁছে দেয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল।

আমাদের মুক্তিসংগ্রামে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারার অন্যতম কারণটি হলো, আমরা অধিকাংশ মানুষ সেদিন একত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হতে পেরেছিলাম। ফলে আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম। আসলে মানুষ সংগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়েই একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে। লক্ষ্য অর্জন করা তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আমি দেখেছি, মানুষকে ইতিবাচকতার শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে কোয়ান্টাম এই কাজটিই করছে। সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি মূলত বিজয়ের শক্তি। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া মানেই মানুষের কল্যাণ।

আমার মনে হয়েছে, কোয়ান্টাম মেথড একজন তরুণের জীবন গঠনে চমৎকার ভূমিকা রাখতে পারে। সে জীবনে যা-ই করুক, যে পথেই যাক, কোয়ান্টাম মেথড চর্চার মধ্য দিয়ে সে তার আসল শক্তির দিকটি খুঁজে পাবে

বলে আমি বিশ্বাস করি। সর্বোপরি বর্তমান হতাশাগ্রস্ত সময়ে মানুষ এখানে এসে একটি আস্থার জায়গা খুঁজে পাবে। শুধু তা-ই নয়, আজকের যুগের কনজ্যুমারিজম বা সর্বগ্রাসী পণ্যদাসত্বের ব্যাপারে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে কোয়ান্টাম মানুষের মধ্যে একটি উন্নত মূল্যবোধেরও জন্ম দিচ্ছে। আর কোয়ান্টাম মেথডের উদ্ভাবক শহীদ আল বোখারী মহাজাতকের সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের।

সাংবাদিক-জীবনে মহাজাতক ছিলেন আমার স্নেহভাজন সহকর্মী। যে মানুষটি একসময় খুব বেশি কথা বলতেন না, কোয়ান্টাম মেথডে এসে তাকেই দেখেছি–ধর্ম দর্শন বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয় থেকে উদ্ধৃত করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে চলেছেন, মানুষকে অসাধারণভাবে ইতিবাচক বিশ্বাসে জাগিয়ে তুলছেন।

আমার বিশ্বাস, তিনি নিজে আগে এই বিশ্বাসের শক্তিতে উজ্জীবিত হতে পেরেছেন বলেই তা অন্যদের মধ্যে সফলভাবে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। এ অনন্য উদ্যোগ ক্রমাগত আরো বিকশিত হোক, এই কামনা করি।



বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ। সমসাময়িক পরিস্থিতি, সংখ্যালঘু ও আদিবাসী অধিকার এবং বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা-সম্ভাবনা নিয়ে তিনি বরাবরই সরব ও সোচ্চার। এসব বিষয়ে জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত তার নিয়মিত কলামগুলো দারুণ পাঠকপ্রিয়। জনাব মকসুদ সম্প্রতি (অক্টোবর ২০১৫) সপরিবারে বান্দরবান লামার কোয়ান্টামম সফর করেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সার্থক বাস্তবায়ন ঘটাচ্ছে কোয়ান্টাম

সৈয়দ আবুল মকসুদ

পার্বত্য চট্টগ্রামে আমি প্রথম আসি ১৯৭২ সালে, তৎকালীন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সাথে। এরপর আরো অনেকবার এসেছি। পাহাড়িদের দেখে এবং ওদের সাথে কথা বলে আমার মনে হয়েছে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ওরা অনেক পিছিয়ে আছে। এ ভাবনা থেকেই আমি বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করি, ওদের নানা সমস্যা-সম্ভাবনা নিয়ে সাধ্যমতো কথা বলি।

আসলে সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর মানুষের বেদনাটা আমাদের বুঝতে হবে। মনে রাখতে হবে, ওদের প্রতি যে-কোনো অবহেলা কিংবা আগ্রাসন গুরুতর অপরাধ। একটি জনগোষ্ঠী, যত ক্ষুদ্রই হোক–তাকে নিয়েই আমাদের সামনে এগোতে হবে। সংহত জাতিগঠনে তার সংস্কৃতিরও একটা বিরাট মূল্য আছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এটাই ছিল আমাদের অঙ্গীকার–ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক একটি বাংলাদেশ।

আনন্দের বিষয় হলো, বান্দরবান লামার কোয়ান্টামম-এ এসে আমি সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপটি দেখতে পাচ্ছি। এখানে ধর্মবর্ণজাতিসম্প্রদায় নির্বিশেষে হাজার শিশু একসাথে বেড়ে উঠছে সমান সুযোগ-সুবিধা নিয়ে। একসাথে

তারা পড়াশোনা খেলাধুলা সংস্কৃতিচর্চা করছে। আবার যে যার ধর্মও পালন করছে। আমি মনে করি, এর মধ্য দিয়ে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সার্থক বাস্তবায়ন ঘটাচ্ছে কোয়ান্টাম।

আর এ বিপুল কর্মযজ্ঞের প্রাণপুরুষ মহাজাতকের সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। স্বাধীনতার আগে থেকেই আমি তাকে জানি। তিনি একজন আদর্শবান মানুষ। তার জীবনের একটি কল্যাণদর্শন আছে। তার নেতৃত্বে এখানে সুশিক্ষা ও উন্নত সংস্কৃতির যে পরিবেশ গড়ে উঠেছে, বঞ্চিত পরিবারের সন্তানেরা আলোকিত জীবনের পথে বড় হয়ে উঠছে, তা এককথায় অনন্য। দেশের মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা আসলে এরকমই হওয়া উচিত।

আমার একটি অভ্যাস হলো, দেশে-বিদেশে কোথায় কী ভালো কাজ হচ্ছে সেখানে গিয়ে তা দেখা। ছোটবেলা থেকে যে স্বপ্ন দেখেছি তা হয়তো আমি পারি নি, কিন্তু অন্য কেউ কাজটি করেছে, এটা আমার ভালো লাগে। সেটা আমি অন্যদের বলি এবং লিখি, যাতে তারাও উদ্যোগী ও উদ্বুদ্ধ হয়।

সে দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে পারি, কোয়ান্টাম এখানে যে কাজটি করছে তা আমাদের দেশে একটি বিরল দৃষ্টান্ত। এটি একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন। সবমিলিয়ে যা দেখলাম–আমার বুকটা সত্যিই ভরে গেছে!

এর মধ্য দিয়ে যে শুধু বাঙালি ও পাহাড়ি শিশুদের মধ্যে একটা সংহতি ও সমমর্মিতা গড়ে উঠছে তা নয়, বরং দেশের বিভিন্ন আদিবাসী গোত্রের শিশুদের মধ্যেও একটি সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, ভবিষ্যতে এটি একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

সরকার একা তো সব করতে পারবে না, সম্ভবও নয়, তাই ব্যক্তিকেও এগিয়ে আসতে হবে। আর শুধু টাকা দিয়ে সব হয় না। চাই স্বপ্ন, যা সব বাধাবিপত্তি প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে মানুষকে দেয় সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস ও অনুপ্রেরণা। স্বপ্নের বাস্তবায়ন তো এভাবেই ঘটে।

আমি বিশ্বাস করি, সময়ের সাথে সাথে আরো অনেক নিবেদিত মানুষ এ কাজের সাথে যুক্ত হবেন। এখানে যারা পড়াশোনা করছে, আত্মবিশ্বাসী ও সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে, তাদের মাধ্যমে এ কার্যক্রম একদিন আরো বিকশিত ও সমৃদ্ধ হবে। অগণিত মানুষের দান ও স্বেচ্ছাশ্রমে গড়ে ওঠা এ প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে এভাবেই আরো বড় হবে।

আমরা ছোটবেলায় দেখেছি, সমাজের কল্যাণে স্বেচ্ছাশ্রম স্বাবলম্বিতা ইত্যাদি বিষয়কে খুব গুরুত্ব দেয়া হতো। কিন্তু সত্তর দশকের শেষের দিক থেকে প্রচুর বৈদেশিক সাহায্য আসতে শুরু করল, অনেক এনজিও দাঁড়িয়ে

গেল। ফলে স্বেচ্ছাশ্রম ও স্ব-অর্থায়নে কোনো কাজ করা যেতে পারে, এ ধারণাটাই আমাদের নষ্ট হয়ে গেল।

অথচ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অন্যতম দিকটি ছিল আমরা স্বাবলম্বী হবো। আত্মনির্ভরশীল হবো। কোয়ান্টামের সব ধরনের সেবা-উদ্যোগে আমি এ আত্মনির্ভরশীলতার দর্শনটি খুঁজে পাই। হাজার হাজার মানুষের দানের অর্থ মাটির ব্যাংকে জমিয়ে কোয়ান্টাম যে-সব কাজ করছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

আমাদের দেশের অন্যান্য উন্নয়ন কাজগুলোও স্ব-অর্থায়নেই হওয়া উচিত। কারণ, দাতা সংস্থাগুলো সাহায্য দেয়ই নিজেদের প্রাধান্য ও গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে। এক ধরনের আধিপত্যবাদ বিস্তারের জন্যে। আর অন্যের কাছ থেকে নিতে গেলে তো সে খবরদারি করবেই।

আসলে বিদেশি দানের অর্থে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো শেষ পর্যন্ত বড় কোনো ভূমিকা পালন করতে পারবে না। বড় লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। বরং নিজেদের অর্থায়নে করা কাজগুলোই আদর্শ কর্মোদ্যোগ হয়ে টিকে থাকবে। বিদেশি সাহায্যে পরিচালিত কাজের মধ্যে আত্মগৌরবেরও কিছু নেই। জাতি হিসেবে আমরা নিজেদের ইতিহাস ভুলে গেছি বলেই এ কথাটা অনেক সময় বুঝতে পারি না।

বাঙালি কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন সভ্য জাতি। বাঙালি সংস্কৃতি একটি সমন্বয়ী সংস্কৃতি। আমাদের জাতিসত্তায় নানান সংস্কৃতির সমাবেশ ঘটেছে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে আমরা একটি গৌরবের জায়গায় ছিলাম। বস্ত্রশিল্পসহ আমাদের উৎপাদিত নানান পণ্যের উচ্চমর্যাদা ছিল সারা পৃথিবীজুড়েই।

অর্থনৈতিকভাবে একসময় আমরা ছিলাম আজকের অনেক উন্নত দেশের চেয়েও সমৃদ্ধ। কিন্তু নানা কারণে আজ আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে একটা হতাশা ও নেতিবাচকতা চলে এসেছে। এর প্রতিকার হিসেবে আমরা যদি আবার ইতিবাচক চেতনা ও ধারণায় উজ্জীবিত হতে পারি, তবে আবার আমরা সেই গৌরবের জায়গায় পৌঁছতে পারব। দরকার শুধু ইচ্ছা। কারণ মেধা যোগ্যতা দক্ষতায় আমরা কোনো জাতির চেয়ে পিছিয়ে নই।

বর্তমানে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনসহ নানা ক্ষেত্রে কিছু অস্থিরতা আছে তা সত্যি, কিন্তু সেটাও একেবারে নতুন কিছু নয়। প্রত্যেক জাতির জীবনেই এমন সময় কখনো না কখনো এসেছে। এটা একসময় কেটেও যাবে। সার্বিকভাবে আমি মনে করি, আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং জাতি হিসেবে আমাদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।



বাংলাদেশে আত্ম উন্নয়নমূলক সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিত্ব কাজী আনোয়ার হোসেন। 'বিদ্যুৎ মিত্র' ছদ্মনামে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম আত্ম উন্নয়ন ও মন-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত করেন। এদেশে রহস্য-রোমাঞ্চ ধারার উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ, মাসিক রহস্য পত্রিকার সম্পাদক, বৈচিত্র্যময় প্রকাশনা সংস্থা সেবা প্রকাশনীর রূপকার–এমনই নানা বিচিত্র ও বহুমুখী পরিচয় তার। পাঠকের কাছে 'কাজীদা' নামে জনপ্রিয় কাজী আনোয়ার হোসেন কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩য় ব্যাচে পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশ নেন।

কাজে লেগে থাকলে সাফল্য আসবেই

কাজী আনোয়ার হোসেন

শৈশব থেকেই আমি কিছুটা রহস্য-রোমাঞ্চপ্রিয় মানুষ। ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন হবো। সুবিশাল মহাসাগরে অতিকায় এক জাহাজ নিয়ে পাড়ি দেবো অজানা-অচেনা কোনো নির্জন দ্বীপে। সবরকম শাসন-বারণ উপেক্ষা করে ঘুরে বেড়াব সারা পৃথিবীময়। মনের গভীরের সেই সুপ্ত, দুরন্ত, রোমাঞ্চকর ইচ্ছেগুলোই হয়তো পরবর্তীতে প্রকাশ পেয়েছে আমার লেখার মধ্য দিয়ে।

পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশের সময় হলো যখন–আমার বয়স তখন ২৬। ভাবনা এলো, এখন কী করব? একটা কিছু পেশা তো দরকার। সেই সময়ে গান গাইতাম রেডিও-টিভি ও চলচ্চিত্রে, কিন্তু স্পষ্ট জানতাম–নেশার ঘোরে করছি বটে, কিন্তু ওটাকে আমি পেশা হিসেবে নিতে চাই না। শিক্ষকতায় হয়তো যেতে পারতাম, কিন্তু চাকরি করব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি অনেক আগেই। তাহলে?

বুঝতে চাইলাম, কোন কাজে আমার আগ্রহ আছে? কোন দিকে আমার ঝোঁক? কী করতে ভালো লাগে? কীসে সামান্য হলেও দক্ষতা আছে আমার? নিজের ভেতরে এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই চলে এলো : লেখালেখি।

ক্লাস সিক্সে পড়ি যখন, সেজ বোন আমাকে একটা ডায়েরি দিয়েছিলেন, শর্ত ছিল–যা লিখব তাকে দেখাতে হবে। কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে মনের আনন্দে লিখতাম। তাতে থাকত দুর্ধর্ষ আর রোমহর্ষক সব কাল্পনিক ঘটনার বিবরণ, ওসব পড়ে সেজদি বেশ ভয় পেয়ে যেতেন। তবে আমার লেখালেখির ব্যাপারে তার একটা স্নেহার্দ্র অনুপ্রেরণা সবসময়ই ছিল।

কিন্তু সেই যুগে, অর্থাৎ আজ থেকে ৫০-৫২ বছর আগে এদেশে শুধু লেখালেখি করে টিকে থাকা ছিল প্রায় অসম্ভব। চাকরি তো করব না, তাহলে আমার জন্যে একমাত্র পথ খোলা রইল ব্যবসা। তখনো জানতাম না, এ দুটোর সমন্বয় কী পরিমাণ খাটুনির কাজ হতে পারে। টের পেলাম যখন, ততদিনে আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই। অবশ্য পিছু হঠতে চাইও নি।

যা-হোক, বাবাকেই প্রথম জানালাম আমার সিদ্ধান্তের কথা। শুনে তিনি কিছুটা আশ্চর্য হলেন, কিন্তু অমত করলেন না। আমার বাবা অধ্যাপক ড. কাজী মোতাহার হোসেনের কাছ থেকে সবসময়ই আমরা সবরকম সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি। তিনি ছিলেন বিচিত্র প্রতিভাদীপ্ত ও উদার মানসিকতাসম্পন্ন একজন মুক্ত চিন্তার মানুষ।

গত শতকের গোড়ার দিকে বাংলার মুসলমান সমাজের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রার লক্ষ্যে সূচিত 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। স্বভাবতই তিনি চাইতেন তার সন্তানরাও নিজেদের ইচ্ছেমতো স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠুক। আমাদের কোনো কাজে তাই কখনো তিনি বাধা দেন নি। জোর করে নিজের মতামত চাপাতে চেষ্টা করেন নি, বরং সাহায্য করেছেন যথাসাধ্য।

১৯৬৩ সালের মে মাসে বাবার দেয়া ১০ হাজার টাকা নিয়ে কাজে নেমে পড়লাম। আট হাজার টাকায় একটি ট্রেডল মেশিন আর বাকিটা দিয়ে সীসার টাইপ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনলাম। সেগুনবাগানে আমাদের বাড়ির নিচতলায় যাত্রা শুরু হলো সেগুনবাগান প্রকাশনীর। বছর কয়েক পরে সেগুনের 'সে' আর বাগানের 'বা' নিয়ে এর নাম দাঁড়াল সেবা প্রকাশনী।

শুরু হলো আমার কর্মজীবন। সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রেসটিকে দাঁড় করাতে রীতিমতো কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে সে-সময়টায়। সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত প্রেসেই থাকতে হতো। তারও আগে-পরে দু-ঘণ্টা করে করতাম লেখা ও অনুবাদের কাজ।

সবমিলিয়ে অহোরাত্র পরিশ্রম করতে হয়েছে তখন। প্রথমে একটি বই লিখতাম, তারপর হাতে কিছু টাকা এলে সেটি প্রকাশ করতাম। এভাবে

১৯৬৪ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হলো *কুয়াশা-১*, এর মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ ঘটল সেবা প্রকাশনীর।

কুয়াশা প্রকাশিত হওয়ার পর এক বন্ধু ইয়ান ফ্লেমিং-এর *ডক্টর নো* বইটি আমাকে পড়তে দিলেন। ওটা পড়তে গিয়ে মনে হলো, রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী আর এডভেঞ্চার সাহিত্যে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। ঠিক করলাম, বাংলায় ওই মানের থ্রিলার লিখব। তাই বিদেশি থ্রিলার পড়ার পাশাপাশি অভিজ্ঞতা অর্জন ও কাহিনীর প্লট সাজানোর জন্যে মোটর-সাইকেলে ঘুরে বেড়ালাম চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, কাপ্তাই।

১৯৬৬ সালে প্রকাশ করলাম বাংলায় প্রথম মৌলিক স্পাই থ্রিলার মাসুদ রানা সিরিজের প্রথম বই *ধ্বংস পাহাড়*। বইটি প্রশংসা ও সমালোচনা দুটোই পেল। দ্বিতীয় বই *ভারত নাট্যম* প্রকাশিত হওয়ার পর তা লুফে নিলেন ছেলে-বুড়োসহ সব বয়সী পাঠক। এরপর নতুন বই বের হতে দেরি হলেই আসতে শুরু করল একের পর এক চিঠি। বাকিটা তো সবারই জানা।

অগণিত পাঠকের ভালবাসা আমি আমার পুরোটা লেখক-জীবন জুড়ে নানাভাবে পেয়েছি। বছর কয়েক আগে যেদিন আমার কাজের স্বীকৃতি দিয়ে এক তরুণ পাঠক ওয়েবসাইটে সুদীর্ঘ একটি লেখা প্রকাশ করল এবং আরো অনেকে তাকে সমর্থন জানাল—সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। ধন্যবাদ, তারেক অণু।

প্রতিষ্ঠিত ধারার বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে গিয়ে বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর যে অবস্থান ও সাফল্য, এর মতো ভিন্নধারার একটি প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলার পেছনে আমাদের মূলমন্ত্র ছিল একটাই—আশা করি তা আজকের তরুণদের, যারা নতুন কিছু করতে চায় তাদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে পারে—সেটা হলো পছন্দের কাজ বাছাই করা। অনেকটা না-বুঝেই ঝাঁপ দিয়েছিলাম সেদিন, কিন্তু ভালো লাগার কাজ বেছে নেওয়ায় টিকে গেলাম।

আমার ধারণা, নিজের মনের মতো কাজে লেগে থাকলে, দৃঢ়তার সাথে ক্রমাগত পরিশ্রম করে গেলে সাফল্য একসময় আসবেই। আর সেই কাজের ফলে যদি মানুষের উপকার বা আনন্দ হয়, তা হলে তো সোনায় সোহাগা। চাই শুধু ধৈর্য ধরে কিছুকাল টিকে থাকা, ব্যস্।

রহস্যোপন্যাস রচনার পাশাপাশি বাংলাদেশে আত্ম-উন্নয়নমূলক রচনা ও এ ধরনের বইগুলোও সাধারণের উপযোগী করে সহজ ভাষায় লিখতে চেয়েছি, যতটা সম্ভব সহজ ভাষায় লিখেছি, সম্ভবত কঠিন ভাষায় লেখার ক্ষমতা নেই বলেই। আর এ ব্যাপারে আমার অনুপ্রেরণা ছিল—আমি নিজে যা

পাঠ করে উপকৃত হয়েছি, আনন্দ পেয়েছি, পাঠককে তার ভাগ দেয়া।

এবং আমার বিশ্বাস, ঠিক এ কারণেই গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক আমাদের সবার প্রিয়। নিজের অর্জিত জ্ঞান ও বিদ্যা তিনি সুন্দরভাবে সবার সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন, কঠোর সংগ্রাম ও অদম্য পরিশ্রম করে গড়ে তুলতে চাইছেন সফল ও সার্থক মানুষ। সেইসাথে জীবনটাকে উপভোগ করছেন পরিপূর্ণভাবে।



বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, গবেষক, লেখক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে তিনি এ বক্তব্য দেন।

বাঁচতে হবে সবাইকে নিয়ে

অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ

যে ধরনের সমাজে আমরা বাস করি, চারদিকে কত রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় দিনের পর দিন। দারিদ্র্য সহিংসতা নৃশংসতা প্রতারণা জালিয়াতি–এগুলোর মধ্যে আমরা বাস করি। ফলে মানুষ অনেক সময় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, আশা হারিয়ে বসে। ভাবে, বোধহয় আর কোনো উপায় নেই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়ে–আমার সন্তানদের কোথায় রেখে যাচ্ছি।

মুক্তির একটা পথ হিসেবে তখন সে বিদেশে যাওয়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে। দালালদের খপ্পরে পড়ে জমি বিক্রি করে, সহায়সম্বল নষ্ট করে। সে আরেক অধ্যায়। ভূমধ্যসাগর, আফ্রিকার জঙ্গল কিংবা ইউরোপের কোনো গহীন জায়গায় এখনই যদি খোঁজ করা হয়, সেখানে বাংলাদেশের তরুণদের পাওয়া যাবে। তারা নানানভাবে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত কোথাও একটা পৌঁছায়।

সন্তান যদি ওখানে গিয়ে স্থায়ী হতে পারে অভিভাবকরা নিশ্চিন্ত হন। সবাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না, অনেকে ফেরত আসে প্রতারিত হয়ে। কিংবা আরো ভয়াবহ ঘটনাও ঘটে। অনেকের লাশ ফেরত আসে। কারো কারো লাশও ফেরত আসে না। সৌদি আরবসহ বেশ কয়েকটা দেশ লাশ ফেরতও দেয় না। ওখানে তারা কী করল তা জানা যায় না। মালয়েশিয়াতেও জেলের

মধ্যে পড়ে আছে অনেক বাংলাদেশি। এভাবে এত কষ্ট ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে থেকে তরুণরা বৈদেশিক মুদ্রা পাঠায়।

আজকে ঢাকা শহরে বিশাল বিশাল শপিং মল, হাউজিং আছে। কিন্তু যা নেই তা হলো প্রয়োজনীয় পাবলিক হাসপাতাল। প্রাইভেট হাসপাতাল আছে। টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনও দেখি, মোবাইলে শুধু একটা কল করবেন, এম্বুলেন্স আসবে, আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। আপনি সুস্থ হয়ে ফেরত আসবেন। বলা হয় না যে, এই কাজটা করার জন্যে অনেক অর্থ দিতে হবে। যার এই অর্থ নেই, তার চিকিৎসাও নেই। তার তখন ওঝার কাছে যেতে হবে, দোয়া নিতে হবে কিংবা কোনো ধরনের হেকিম কবিরাজ–যাদের অনেকেই নির্ভরযোগ্য নন তাদের ওপর নির্ভর করতে হবে।

অথচ, আজকে ঢাকা মহানগরে যা জনবল তাতে ঢাকা মেডিকেলের মতো অন্তত ১০টা হাসপাতাল হওয়া উচিত ছিল। হাসপাতাল সম্প্রসারিত করতে কত টাকা লাগে? কিন্তু বলা হয়, আমাদের যথেষ্ট টাকা নেই। অথচ প্রতি মাসে প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থের পরিমাণ একশ কোটি ডলার। তার মানে আট হাজার কোটি টাকা। প্রতি মাসে তারা যে টাকা পাঠায়, দেশের বাৎসরিক স্বাস্থ্য-বাজেট তার চেয়ে কম।

বাংলাদেশের গরিব মানুষ বিদেশে গিয়ে টাকা পাঠাচ্ছেন, এখানকার শ্রমিকরা গায়েগতরে খেটে গার্মেন্টস রপ্তানি করছেন, কৃষকরা কাজ করছেন। বাংলাদেশে তো অভাব নেই। কারণ, মানুষ দিতে কখনো কার্পণ্য করে না। এই যে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন নিয়ে কত কথা হলো–মানুষ তখনো বলেছে, ঠিক আছে দেবো। মানুষ তো দিতে চায়। দিতে কারো আগ্রহের কমতি নেই।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অনেক মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় অর্জিত হয় আমাদের দেশ। '৭২ সালে মানুষের এরকম স্পিরিট দেখেছি–তাকে যদি বলা হতো যে, তোমাকে কোদাল দিয়ে খুঁড়ে সমস্ত খাল খনন করতে হবে, রাস্তা বানাতে হবে, বিল্ডিং বানাতে হবে–সমস্ত কিছু করার জন্যে মানুষ প্রস্তুত ছিল। বিভিন্ন সময় আমাদের দেশের মানুষ এই স্পিরিটটা দেখিয়েছেন।

কিন্তু নানা কারণে এর বাস্তবায়ন ঘটে নি যদিও, তবু আমাদের দেশের এই যে সম্ভাবনা এবং মানুষের স্পিরিট-এর ওপরে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব ভরসা করি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশে আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে বেঁচে থাকাই একটা বড় কাজ।' এর পরের লাইনটা হলো, 'কিন্তু সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে সবাইকে নিয়ে বাঁচা।'

এককভাবে একজন বিশাল আয়োজন নিয়ে বেঁচে থাকল, আর চারপাশে ভয়ংকর পরিস্থিতি–একে আসলে বেঁচে থাকা বলে না।

অথচ কী ক্ষুদ্র চিন্তার মধ্যে আটকে থাকে কিছু মানুষ! কিছু ব্যাংক ব্যালেন্স, কয়েকটা গাড়ির মালিক হওয়ার জন্যে যে-কোনো কিছু করতে তারা প্রস্তুত। কী হবে এটা দিয়ে? সে যদি এটা থেকে বেরোতে পারত, মানুষ হিসেবে বাঁচার মধ্যে যে বিশালত্ব ও তৃপ্তি, তা সে অর্জন করতে পারত। এর যে আনন্দ, তার তো তুলনা নেই।

রক্তদান এমন মহৎ কাজেরই অংশ। মানুষ বিনা অর্থে কেন রক্ত দিচ্ছে? তার মধ্যে একটা তৃপ্তি ও আনন্দ আসছে যে, আমি আরেকজনের জন্যে রক্ত দিচ্ছি। অন্যের জন্যে অনুভব করেন যিনি, 'মানুষ' তো আসলে তিনিই।

রক্তদান নিয়ে ইউরোপে বড় পরিসরে একটি গবেষণা হয়েছিল বছর কয়েক আগে। খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ পল স্যামুয়েলসন পরে এ গবেষণা নিয়ে লিখেছিলেন। যে অর্থনীতি এখন সারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার মূল কথা হচ্ছে, অর্থ বা বিনিময়মূল্যই সমস্ত কিছু নির্ধারণ করে। তাই মানুষ টাকার জন্যেই সবকিছু করে। সুতরাং ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশন নির্ভর করে টাকার ওপরেই। অর্থনীতির এই তত্ত্ব আমি নিজে বিশ্বাস করি না।

তো, রক্তদানের সাথে এই তত্ত্ব মিলিয়ে গবেষণা করা হলো। দেখা গেল, টাকার বিনিময়ে দেয়া রক্ত এবং স্বেচ্ছা দানকৃত রক্তের গুণগত মানের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক! দানকৃত রক্তই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

তার মানে, মানুষ যখন টাকার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কোনো কাজ করে, সেই কাজটির সাথে তার মেধা সৃজনশীলতা মমতার সবটুকু যুক্ত থাকে না। কিন্তু যা তার ভালবাসা থেকে আসে, সামাজিক দায়বোধ থেকে আসে তার মধ্যে নিজের সর্বোত্তম অবদান যুক্ত হয়। সে-জন্যেই রক্তদানের ক্ষেত্রে এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে।

টাকার জন্যেই যদি সব মানুষ সব কাজ করত, তাহলে মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে হয়েছিল? কোনোকিছু পাওয়ার জন্যে তো মানুষ মুক্তিযুদ্ধে যায় নি। একটি বড় ধরনের অঙ্গীকার থেকে মানুষ সেদিন আত্মত্যাগ করেছে। ওইখানেই মানুষ হচ্ছে 'মানুষ', যেখানে সে বর্তমান ও ভবিষ্যতের অন্য অনেকের সাথে নিজেকে যুক্ত করে এবং তার জীবনকে অর্থবহ করে তোলে।

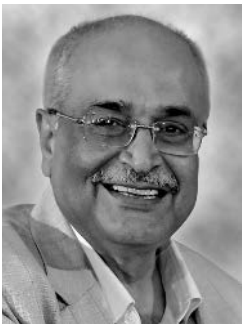
প্রত্যেকটা মানুষের মাঝেই সবাইকে নিয়ে বাঁচার তাড়না আছে। কিন্তু এই অনুভূতিটা চারপাশের নানা প্রলোভনে বিকশিত হতে পারে না। মানুষ তখন নিজেকেই হারিয়ে ফেলে। তাই স্বেচ্ছা রক্তদানের মতো যত উদ্যোগ নেয়া

হবে মানুষের অন্তর্গত এই শক্তি তত প্রকাশিত হবে।

আর আজ এখানে যারা স্বেচ্ছা রক্তদাতা হিসেবে সম্মাননা লাভ করছেন, তাদের মধ্যে সেই সম্ভাবনাটা অনেক বেশি বলে আমি মনে করি। বিশুদ্ধ রক্তদানের মধ্য দিয়ে সমাজের জন্যে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আপনারা পালন করছেন, আশা করি তা আরো অনেক বড় কাজ করার উপলব্ধি উৎসাহ প্রেরণা জোগাবে।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন যে উদ্যোগটি নিয়েছে এবং অনেক মানুষকে এর সাথে সংযুক্ত করেছে, আমার প্রত্যাশা–সঙ্গতিহীন মানুষের কাছে কোয়ান্টাম এই সেবা যথাযথভাবে পৌঁছে দেবে। তারাও আশ্বস্ত হবেন যে, কোয়ান্টামে এলে প্রয়োজন অনুসারে সংকট থেকে মুক্তির পথ পাওয়া যায়।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কাজ আমি দূর থেকে দেখেছি। এটা একটা বিস্ময় আমার কাছে। একইসঙ্গে অনেক আগ্রহও বোধ করি যে, এটা বাংলাদেশে সম্ভব! মানুষের মধ্যে যে সৃজনশীলতা আছে, সংগঠনের উদ্যোগ আছে, পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতার উপাদান আছে–এ সবগুলোকে একটা সুস্থ সংগঠিত ধারায় প্রস্ফুটিত করছে কোয়ান্টাম।



বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-এর সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে তিনি এ বক্তব্য দেন।

রক্তদাতারা প্রকৃত বীর

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশে এবং দেশের বাইরে আমার বিভিন্ন সভা সমিতি অনুষ্ঠান আলোচনা সম্মেলন ওয়ার্কশপ ইত্যাদি করার সুযোগ হয়। কিন্তু আমি আজ বলতে পারি যে, সে-সব অনুষ্ঠানাদির গুরুত্ব যা-ই থাকুক না কেন, আজকের এই অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে সে-সবের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক, অনেক বেশি জীবনধর্মী, অনেক বেশি বাস্তব।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, এখান থেকে আপনি ঘরে ফিরবেন বড় ধরনের একটি মানবতা প্রেমের অনুপ্রেরণা নিয়ে। এমন একটি উদ্যোগ নেয়ার জন্যে আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের এই রক্তদান কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ এখানে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত সম্মানিত ও অনুপ্রাণিত বোধ করছি।

ছোটবেলায় আমাদের সকলেরই রক্তদান নিয়ে বিভ্রান্তির কোনো অভাব ছিল না। সেই সময় আমরা শুনেছি, রক্ত দিলে মানুষ নাকি দুর্বল হয়ে যায়। রক্ত দিতে গেলে মানুষের অনেক ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিংবা রক্ত দিলে হয়তো খেলাধুলা করা যাবে না। রক্ত দেয়ার ফলে বিভিন্ন শারীরিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে ইত্যাদি নানান বিভ্রান্তি সে-সময় প্রচলিত ছিল।

কিন্তু আনন্দের কথা হলো, সে-সমস্ত দুর্ভাবনা, বিভ্রান্তি এবং বিভিন্ন

ধরনের কুসংস্কারগুলোকে কাটিয়ে আজকে বাংলাদেশে এবং পৃথিবীর বুকে তো অবশ্যই–রক্তদান কর্মসূচি একটা বড় সামাজিক আন্দোলন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আর মানবতার ইতিহাসে যত বড় বড় অবদান আছে, তার মধ্যে এটি সবচেয়ে মানবিক ও গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনগুলোর অন্যতম। এ ব্যাপারে আজ কোনো সন্দেহ নেই।

এই রক্তদানের ইতিহাস যদি বিশ্লেষণ করি আমরা, তাহলে দেখব এটি মানবসভ্যতার নানা অগ্রগতির সমান্তরালে উৎকর্ষ লাভ করেছে। একটা বড় অগ্রগতির জায়গা তো ছিল নিঃসন্দেহে চিকিৎসাবিদ্যা। চিকিৎসাবিদ্যার সাথে সাথে রক্ত একজনের শরীর থেকে সংগ্রহ করা, সেই রক্তকে আবার বিভিন্ন উপাদানে বিভাজন করা, সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তীতে তা অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করা। এই যে কতগুলো বড় বড় ধাপ আছে, তা সময় পরিক্রমায় নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পথ ধরে সম্ভব হয়েছে। শুধু আমরা চাইলাম আর দিলাম, সাথে সাথে এটা হয়ে গেল, ব্যাপারটা সে-রকম নয়। এর পেছনে চিকিৎসাবিদদের বৈজ্ঞানিক অবদান আছে, সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে।

একইভাবে সাধারণ বিজ্ঞানের অন্যান্য অবদানও এর পেছনে আছে। ধরুন, যদি ওই রকম একবার ব্যবহার্য সুঁইটিকে আমরা আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করতে না পারতাম অথবা যে প্লাস্টিক ব্যাগটার মধ্যে রক্ত সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে, সেটা যদি আমাদের না থাকত বা এর বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকত, তাহলে সাধারণ বিজ্ঞানের যুগান্তকারী উদ্ভাবন ব্যতিরেকেও কিন্তু এই রক্ত পরিসঞ্চালন কর্মসূচি এগিয়ে নেয়া সম্ভব হতো বলে মনে হয় না।

অর্থাৎ চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাশাপাশি প্রায়োগিক বিজ্ঞানেরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান এর সাথে যুক্ত হয়েছে। আর সামাজিক প্রয়োজন এবং সচেতনতা তো অবশ্যই এর পেছনে ছিল।

আমরা যদি দেখি, ইতিহাসে ব্লাড ব্যাংক বা ব্লাড ডোনার সার্ভিস কীভাবে চালু হয়েছে–প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো হয়েছিল, তার সমন্বয়ে ১৯২২ সালে লন্ডনে প্রথম ব্লাড ব্যাংক চালু হয়। আর রক্ত সংগ্রহ করা এবং সব জায়গাতে তা পৌঁছে দেয়ার যে নেটওয়ার্ক ফ্যাসিলিটি বা যোগাযোগের সুব্যবস্থা, সেটি প্রথম চালু হয় ১৯৩০ সালে, সোভিয়েত ইউনিয়নে স্ট্যালিনের আমলে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসাব্যবস্থার অধীনে।

দুই বিশ্বযুদ্ধের সময়কালের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞান, বায়োকেমিস্ট্রি এবং

অন্যান্য প্রায়োগিক বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটে এবং ততদিনে রাষ্ট্রের একটা কাঠামোও গড়ে ওঠে, যার মধ্য দিয়ে এ পুরো ব্যাপারটা একটা মোটামুটি রূপ লাভ করে।

অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিশ শতকের আবিষ্কার এবং একইসাথে বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তনই আধুনিক রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবস্থাকে আজকের এই জায়গাটাতে নিয়ে এসেছে।

এক ধরনের তৃপ্তি এবং প্রশান্তির সাথে বলতে পারি যে, এখনো যথেষ্ট না হোক তবু প্রভূত পরিমাণে এ আন্দোলন আমাদের দেশেও বিকাশ লাভ করেছে। আর এ আন্দোলনে আপনারা যারা অগ্রপথিক, আমি তাদের প্রতি সম্মান জানাতে আজ এখানে এসেছি।

আপনাদের স্মরণ আছে যে, নেতাজি সুভাষ বসু বলেছিলেন, 'আপনারা আমাকে রক্ত দিন, আমি আপনাদের স্বাধীনতা দেবো'। বাংলাদেশ সেই অর্থে রক্ত দিয়েই স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু রক্তের প্রয়োজন শান্তির সময়ে যুদ্ধের চেয়ে কম না। আর সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে যারা সবচেয়ে সচেতন মানুষ, তারাই বোধহয় আজ এখানে সমবেত হয়েছেন।

বীর আসলে তারাই, যারা নিজের শরীরের রক্ত স্বেচ্ছায় আরেকজন মানুষের উপকারে দান করে দেন। তার চেয়ে বড় বীর আর কে হতে পারে? এটিই হলো বীরত্বের লক্ষণ। সেই অর্থে আমি তো আপনাদের 'রক্তবীর' হিসেবে আখ্যায়িত করতে চাই। কারণ, যার রক্তের প্রয়োজন, মায়ের অশ্রু কিংবা বোনের কান্না তাকে বাঁচাতে পারবে না–তখন রক্তই কেবল তার জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে।

তাই আমি মনে করি, অশ্রু আবেগ বা আমাদের শরীরের ঘামের চেয়েও অনেক বড় ও দামি জিনিস হলো এই রক্ত। আর প্রত্যেক মানুষের শরীরের শিরা-ধমনিতে ওই যে লাল রক্তটি প্রবাহিত হয়, তা দিয়ে পুনরায় প্রতীয়মান হয় যে, এই পৃথিবীতে অখণ্ড মানবজাতি বসবাস করে। পৃথিবীর বুকে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে আমরা যে একটি অখণ্ড মানবসত্তা এবং একে অপরের প্রতি আমাদের যে মানবতাবোধ ও দায়িত্ব, সেটাই প্রকাশ পায় যখন আমরা একের রক্ত আরেকজনকে দেই।

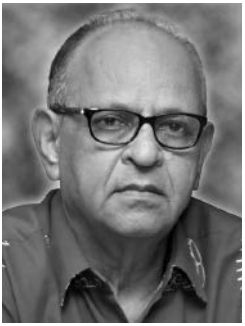
আরেকজনকে রক্ত দেয়ার সময় চিকিৎসকরা কি জিজ্ঞেস করেন যে, এটি স্ত্রীর রক্ত না পুরুষের রক্ত? তারা কি জিজ্ঞেস করেন যে, এটি মুসলিমের না খ্রিষ্টানের রক্ত? শুধুই দেখা হয় যে, ওই রক্তটার মধ্যে কোনো রোগজীবাণু আছে কিনা। সেহেতু পৃথিবীতে যদি মানবতার সবচেয়ে বড় সূচক কেউ খুঁজে

বের করতে চায়, তাহলে রক্তদান হলো তার সবচেয়ে বড় সূচক। আমার কাছে তা-ই মনে হয়।

আমরা শুনেছি, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন গত দুই দশক ধরে তাদের রক্তদান কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ করেছে। আর এ কর্মসূচিতে রক্ত দিয়েছেন প্রায় আড়াই লক্ষ রক্তদাতা। কিন্তু যে তথ্যটি আমাকে কিছুটা বিচলিত করেছে সেটা হলো, বাংলাদেশে বছরে মোট ছয় লক্ষ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন পড়ে, অথচ এর মাত্র ২৫ শতাংশ সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে আসছে।

এ থেকে বোঝা যায় যে, এ আন্দোলনকে আরো বিস্তৃত ও বলীয়ান করার কত বড় সুযোগ আমাদের এখানে রয়ে গেছে। তাই আজ আমি আপনাদের কাছে আহ্বান করব যে, আপনাদের এই মহান আদর্শ যেন সামাজিকভাবে আরো প্রচারিত হয়। নতুন প্রজন্ম যেন আপনাদেরকে দেখে গর্ববোধ করে, অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে আসে এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে যেন আরো বেশি পরিমাণ রক্ত সংগৃহীত হয়–আমরা সেই আশা করি।

আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আপনাদের জানাচ্ছি, আমি আজকে এখানে আসতে পেরে অত্যন্ত সম্মানিত এবং অনুপ্রাণিত বোধ করছি। আপনাদের সকলেরই মঙ্গল হোক।



ডা. সামন্ত লাল সেন। অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে তার ভূমিকা অগ্রগণ্য। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিশেষায়িত বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট মূলত তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল। বর্তমানে তিনি এর কো-অর্ডিনেটর এবং দেশের ১৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট সম্প্রসারণ কার্যক্রমের জাতীয় প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন।

সৎ নিয়ত আর ধৈর্য থাকলে সবকিছুই সম্ভব

ডা. সামন্ত লাল সেন

কিছুদিন আগের কথা।

সিএনজি ট্যাক্সি চড়ে বাসায় ফিরছিলাম। গন্তব্যে পৌঁছে ড্রাইভারকে ভাড়া দিলাম, কিন্তু তিনি ভাড়া নেবেন না। বললাম, কেন? তার বক্তব্য হলো, 'স্যার, আপনি মানুষের উপকার করেন আমরা জানি। পেট্রোল বোমায় আমাদের অনেক ড্রাইভার পুড়ে গিয়েছিল। আপনি ওদের চিকিৎসা করেছেন।' একজন চিকিৎসক হিসেবে সাধারণ মানুষের এই ভালবাসাটা আমাকে তৃপ্তি দেয়। আরো কাজ করার শক্তি যোগায়।

চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছেটা আমার ছিল ছোটবেলা থেকেই। শৈশবে ডাক্তারি ডাক্তারি খেলতাম, কলাগাছে ইঞ্জেকশন দিতাম। বাবাও চাইতেন আমি চিকিৎসক হই।

বাবা ছিলেন সরকারি চাকুরে। দেশের নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম তার সাথে। সিলেটে আমার জন্ম হলেও, কুষ্টিয়া ও দিনাজপুরে স্কুল-কলেজের পড়াশোনা শেষ করে ১৯৬৭ সালে ভর্তি হই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে।

১৯৭২ সালে ডাক্তারি পাশ করি। ইন্টার্নশিপ শেষ করে আমার পোস্টিং হলো হবিগঞ্জের বানিয়াচং থানা হেলথ কমপ্লেক্সে। একবছর ছিলাম ওখানে।

সে-সময় আজকের মতো এত রাস্তাঘাট ছিল না। প্রায়ই বৃষ্টিতে ভিজে নৌকায় আর সাইকেলে চড়ে কর্মস্থলে যেতাম।

কর্মজীবনের শুরুতে আসলে ডাক্তারদের গ্রামে যাওয়া উচিত, তাহলে বোঝা যায় ওখানকার মানুষের জীবনযাত্রার ধরন এবং ওদের সমস্যাটা কোথায়। এ অভিজ্ঞতাটা পরবর্তীতে অনেক কাজে লাগে।

যা-হোক, ১৯৭৫-এ বদলি হয়ে আসি ঢাকার সোহ্‌রাওয়ার্দী হাসপাতালে। ওখানে তখন একজন মার্কিন অর্থোপেডিক সার্জন ছিলেন–ডা. আর জে গাস্ট। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্যে বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন। তার অদম্য কর্মস্পৃহা দেখে সেই তরুণ বয়সে আমি ভীষণ অনুপ্রাণিত হই। পঙ্গু হাসপাতাল তৈরির সময় তাকে দেখতাম নিজেই বালির বস্তা টানছেন, কিছু একটা লিখতে হলে নিজে টাইপ করছেন।

ডা. গাস্ট একসময় ভারত থেকে একজন প্লাস্টিক সার্জনকে নিয়ে আসেন পঙ্গু হাসপাতালে। আমাকে বললেন, 'তুমি ওর সাথে কাজ করো'। আমি তখন নবীন চিকিৎসক। উৎসাহ নিয়ে কাজে লেগে গেলাম।

একপর্যায়ে মনে হলো, প্লাস্টিক সার্জারি বিষয়টা তো দারুণ! আমি বড় একজন প্লাস্টিক সার্জন হবো। মানুষের চেহারা সুন্দর করব। অনেক টাকাপয়সা রোজগার করব। এমন একটা স্বপ্ন নিয়ে প্লাস্টিক সার্জারিতে ক্যারিয়ার শুরু করলাম।

বছর কয়েক পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পোস্টিং হলো। সম্ভবত ১৯৮১ সালের কথা সেটা। প্লাস্টিক সার্জনদের কাজের একটা অংশ হচ্ছে অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসা করা। সেইসূত্রে খুব কাছ থেকে দেখলাম ওদের দুঃসহ কষ্ট আর যন্ত্রণা।

দেখেছি, কী নিদারুণ অবহেলার শিকার অগ্নিদগ্ধ রোগীরা। কয়েকটি মাত্র বিছানা ওদের জন্যে, অধিকাংশই পড়ে আছে মেঝেতে। কেউ টয়লেটের পাশে, কেউ-বা বারান্দায়। তেমন কোনো চিকিৎসাও হতো না ওদের। বেশিরভাগ রোগীই দরিদ্র আর অসহায়।

এই অগ্নিদগ্ধ রোগীদের সংস্পর্শে এসেই আমার মনটা পাল্টে গেল। মানুষের চেহারা সুন্দর করা আর অনেক টাকাপয়সা রোজগার করার স্বপ্নটা পুরোপুরি বিদায় নিল মাথা থেকে। তখন আমার একটাই চিন্তা–এদের জন্যে কিছু করতে হবে, কীভাবে তা করতে পারি।

সার্জারি বিভাগে তখন ছিলেন প্রফেসর ডা. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও প্রফেসর ডা. কবীর উদ্দিন আহমেদ। এ দুজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে সাথে নিয়ে কাজ শুরু

করলাম। ১৯৮৬ সালে সরকারের কাছে বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করার প্রস্তাব দেই আমরা।

২০০৩ সালে যাত্রা শুরু করে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট আজকের বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট। অবশ্য এর পেছনে রয়েছে আমাদের দীর্ঘ দেড় যুগের অক্লান্ত সংগ্রাম। অনেক ঘুরতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে অনেক গঞ্জনা তাচ্ছিল্য বাধাবিপত্তি। কেউ বিরক্ত হয়ে ফাইল ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন; কেউ-বা বলেছেন, 'উনি ঘুরছেন ধান্ধা নিয়ে, টাকাপয়সা মেরে দিয়ে ইন্ডিয়া চলে যাবেন'। আরো কত কী! কিন্তু এসব আমাকে কখনো বিচলিত করে নি।

আর আজকে যে জায়গাটার ওপর এই বার্ন ইউনিট, একসময় এখানে ছিল একটা বস্তি। আর ঢাকা শহরে বস্তি সরানো যে কী কঠিন কাজ! সে-সময় আমার জীবনের ওপর হুমকি পর্যন্ত এসেছিল।

তবু হাল ছাড়ি নি। সবার সহযোগিতায় শেষপর্যন্ত আমরা সফল হয়েছি। আজ এখান থেকে শত শত রোগী যে চিকিৎসা পাচ্ছেন এবং সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছেন, এটাই আমার সবচেয়ে বড় শান্তি।

আমি একা কতগুলো অপারেশন করতে পারতাম? আর আমি তো চিরকাল থাকবও না, তাই সবসময় মনে হতো যদি একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারতাম, বহু রোগী চিকিৎসা পেত। আজ এখানে এত জন ডাক্তার কাজ করছেন, অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসায় একটা ভরসাস্থলে পরিণত হয়েছে এই বার্ন ইউনিট, এটি যে দেখে যেতে পারছি তা-ই আমাকে তৃপ্তি দেয়। একটা শান্তি দেয়।

আসলে নিয়ত যদি ভালো থাকে এবং সেইসাথে ধৈর্য থাকে তাহলে স্রষ্টাই সাহায্য করেন। তখন সবই সম্ভব। সেই বিশ্বাস থেকেই বলতাম–একদিন এটা করেই ছাড়ব।

আমরা শূন্য থেকে শুরু করেছিলাম। শুরুর দিনগুলো সহজ ছিল না। ছুটির দিন বা অবসর বলে কিছু ছিল না আমাদের। মোটামুটি রাতদিন পুরোটা সময় এখানে কাটাতে হয়েছে কখনো কখনো। আসলে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পথ ধরেই একেকটা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমও এমনই একটি প্রতিষ্ঠান। শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে মানুষকে যে সেবাটা তারা আজ দিচ্ছেন, তা এককথায় অভূতপূর্ব এবং প্রশংসনীয়।

অগ্নিদগ্ধ রোগীর ক্ষেত্রে যে রক্তক্ষরণ হয় তা সাধারণ রক্তক্ষরণের মতো দেখা যায় না, কিন্তু রক্ত দিয়েই (প্লাজমা) সে ক্ষয় পূরণ করতে হয়।

আমাদের বার্ন ইউনিটে দিনে গড়ে ৪০-৫০ ইউনিট রক্ত লাগে, আর এ রোগীদের অধিকাংশই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা গরিব অসহায় মানুষ। বিশুদ্ধ রক্তের জন্যে আমরা তাদের কোয়ান্টামে পাঠাই। ওখান থেকে তারা রক্ত নিয়ে আসেন। অনেক সৎ মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলেই এ সেবাদান সম্ভব হয়েছে।

কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে না গেলে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। কোয়ান্টামের অনুষ্ঠানে না গেলে আমারও তেমনি অনেক কিছুই অজানা থেকে যেত। বাংলাদেশে বহু জায়গায় বহু অনুষ্ঠানে আমি গিয়েছি, কিন্তু এরকম ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক সময়ে অনুষ্ঠান শুরু হতে কোথাও দেখি নি।

একটি জাতি আসলে কখনো এগোতে পারে না, যদি না তারা নিয়ম ও সময়-সচেতন হয়। আমি মনে করি, নিয়মানুবর্তিতা ও সেবার ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে কোয়ান্টাম। এটি সবাই অনুসরণ করলে আমাদের দেশ অনেকদূর এগিয়ে যাবে।

আমাদের দেশের মানুষ আদতে খুব ভালো। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেখেছি গ্রামেগঞ্জে মানুষ কীভাবে মানুষকে সাহায্য করেছে। এখানে যে-কোনো জাতীয় দুর্যোগে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাউকে ডাকতেও হয় না। আমাদের দেশটাও খুব ভালো। অনেক সম্ভাবনার একটা দেশ। অনেক ভালো কাজ হচ্ছে এখানে। সবার সম্মিলিত চেষ্টায় এ দেশ আরো অনেকদূর এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।



প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক। উপন্যাস, ছোটগল্প, আত্মজৈবনিক রচনা, শিশুতোষ গ্রন্থ–সবমিলিয়ে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় তার সাহিত্যকর্ম। এর পাশাপাশি তিনি দেশের একজন প্রথিতযশা মনোচিকিৎসক। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাইকিয়াট্রির প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বর্তমানে ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজের (বারডেম) অধ্যাপক ডা. আনোয়ারা তার দীর্ঘ পেশাজীবনে নানাভাবে দেখেছেন মানুষের মন ও সমাজের নানা দিক। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৩৪ ব্যাচে অংশ নেন।

নৈতিক জাগরণই সামাজিক অনাচার রুখবে

আনোয়ারা সৈয়দ হক

আমাদের জীবন এখন হয়ে পড়েছে প্রযুক্তিনির্ভর। সর্বক্ষেত্রে নিত্যনব প্রযুক্তির ছোঁয়া জীবনকে অনেক সহজ করে তুলেছে সত্যি, কিন্তু এর যথেচ্ছ ব্যবহার আমাদের জীবন থেকে লুপ্ত করে দিয়েছে সব রহস্যময়তা আর রোমাঞ্চকর অনুভূতিগুলো। সবাই মিলে যেন ঢুকে পড়েছি একটা উৎকট হাস্যকর বাস্তবতার যুগে। কিন্তু জীবন তো রহস্যময়। সে রহস্যময়তা অনেক আনন্দেরও বটে।

এই কিছুদিন আগেও একটা সময় ছিল, যখন ছেলে পড়াশোনা বা চাকরিসূত্রে হয়তো দূরে থাকত–মা ছেলেকে চিঠি লিখতেন, ছেলে অপেক্ষা করে থাকত সেই চিঠির জন্যে। পোস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজ নিত চিঠি এলো কিনা। চিঠি পেলে মা-র হাতের লেখাটা দেখত, চিঠিতে হাত বুলাত, চিঠির গন্ধ শুঁকত। মা-র চিঠি! পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কী একটা রোমাঞ্চ!

সন্তান এ কালেও দূরে থাকে। কিন্তু চিঠি লেখার আর প্রয়োজন হয় না। সকালে স্কাইপ, বিকেলে স্কাইপ। সবকিছুই দৃশ্যমান। উধাও হয়ে গেছে জীবনের সকল রহস্য। সেইসাথে ক্ষীয়মাণ হয়ে গেছে পারস্পরিক স্নেহ-ভালবাসা-মমতার সম্পর্কের মধ্যকার সহিষ্ণুতা আর মানবিক আবেগগুলো।

এ সবই এখন আছে কেবল ফেসবুকে।

এ যুগে সামাজিক অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতার একটি বড় কারণ ফেসবুক। ব্যক্তিগত সম্পর্কের জটিলতা ও টানাপোড়েনের জন্যেও এটি কম দায়ী নয়। বন্ধুতে বন্ধুতে মন-কষাকষি আর মান-অভিমান আগেও হতো। এ কষ্টটুকু সে কাছের কাউকে শেয়ার করত, না হলে চেপে রাখত। আবার কিছুদিন পর বন্ধুর কাছ থেকে কোনো ভালো আচরণ পেলে কষ্টটা সে ভুলেও যেত।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখন কী হচ্ছে? যেই কারো সাথে কিছু হলো–কাছের কিংবা দূরের, পরিচিত বা সামাজিকভাবে চেনা–অমনি সে তার নামে একটা নেতিমন্তব্য করে দিল ফেসবুকে। মুহূর্তেই সেটি জেনে গেল আরো অনেক মানুষ। বহুদিনের সম্পর্ক, এক মন্তব্যেই শেষ!

আমার বন্ধু আমাকে ভালবাসে–এটা জেনে যদি আমি মরেও যেতাম, শান্তিতে মরতাম। কিন্তু ফেসবুক কী করল? ফেসবুক আমাকে জানিয়ে দিল–'ওরে, তোর ২৫ বছরের বন্ধু তোকে ভালবাসে না। ঘৃণা করে।' দিল শান্তিটা নষ্ট করে। এই বাস্তবতা জেনে আমার লাভ কী হলো?

আগে জীবনে ফেসবুক ছিল না। শান্তি ছিল। এখন ফেসবুক না দেখে আমরা দু-দণ্ড শান্তিতে বসতে পারি না–কে কী লিখল, কে কার বদনাম করল, তার উত্তর না দিলে আমাদের রাতে ঘুম পর্যন্ত আসতে চায় না!

বুঝে না-বুঝে এভাবে আমরা প্রযুক্তির অপরিণামদর্শী ব্যবহার করছি দিনের পর দিন। ক্রমাগত নিজেদের শান্তি নষ্ট করছি আমরা। সমাজে বৈরিতা বাড়ছে, প্রতারণা বাড়ছে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে। ঘৃণা, অবিশ্বাস বাড়ছে। প্রতিহিংসাপরায়ণতা জন্ম দিচ্ছে অদ্ভুত সব হিংস্রতা ও বীভৎসতার। কারণ আমাদের স্বাধীনতা বেড়েছে, কিন্তু সচেতনতা বাড়ে নি। ফলে একধরনের অস্থিরতার মধ্য দিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের মানবিক গুণগুলো।

সবমিলিয়ে আমরা তৈরি করে ফেলছি অসহনীয় এক অনৈতিক পরিবেশ, যেখানে মানবীয় মূল্যবোধ, নীতিবোধ এমনকি চিরন্তন ধর্মাচারগুলো পর্যন্ত এসব থেকে আমাদের বিরত রাখতে পারছে না।

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আগে অন্তত কিছু ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের চর্চা ছিল, আধুনিকতার নামে সেগুলোও আমরা জীবন থেকে বিদায় করে দিয়েছি। আমরা যে এত ধর্মের কথা বলি, সেই ধর্মও তো আমাদের জীবনে আজ অনুপস্থিত। যা আছে সেটুকু কেবল কথায়।

শিশু ও নারীনির্যাতনসহ কুৎসিত যে-সব ঘটনা সমাজে আজ আমরা

দেখছি একের পর এক, তা মূলত এই অনৈতিকতা আর ধর্মহীনতারই পরিণাম। মানুষ মানুষকে মারছে মৃত্যুযন্ত্রণাকে রীতিমতো উপভোগ করতে করতে! কেন? কারণ, তার শাস্তির ভয় নেই, সামাজিক প্রতিরোধের ভয় নেই, ধর্মের ভয়ও নেই।

আজ জীবনের এ পর্যায়ে এসে একটা কথা আমার মনে হয়–এই যে এতদিন ধরে দেশ-বিদেশ ঘুরে এত বই, স্যুভেনির, শাড়ি, জামা এত জিনিসপত্র আমার জমা হলো–মানুষের জীবনে আসলে এসবের কিছুই দরকার নেই। মানুষের দরকার কেবল শান্তি, ভ্রাতৃত্ব আর ধর্ম।

এই শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষায় একজন মানুষকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করে তার পরিবার। তাই দায়িত্বটা প্রথম নিতে হবে পরিবারকেই। শৈশব থেকেই তাকে নীতিজ্ঞান, সুস্থ মূল্যবোধ ও ধর্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। গুরুজনদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ছোট-বড় সবাইকে সম্মান করতে শেখাতে হবে।

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হলো, এসব আচরণ আগে নিজেদের চর্চা করতে হবে। বাবা-মা অভিভাবকরা কী করছেন, কীভাবে করছেন, সন্তানরা মূলত সেটাই দেখে। এবং তা-ই শেখে। তাই সন্তানদের সময় দিতে হবে, সপ্তাহে অন্তত একটি দিন হলেও।

পরিবারকে সময় দেয়া, পরিবারের সবার প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেয়া আমাদের নৈতিক কর্তব্যগুলোর একটি। কারণ, সুখী জীবনের জন্যে পারিবারিক বন্ধনটা খুব জরুরি। অথচ হরেক রকম বিনোদন আর প্রযুক্তির আগ্রাসনে এই পারিবারিক বন্ধনটাই আজ একটু করে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

একটা সময় ছিল যখন দিনশেষে বাড়ি ফিরে পরিবারের সবাই একসাথে বসত, স্কুলে কিংবা অফিসে সারাদিন কী হয়েছে না হয়েছে সে-সব গল্প হতো। আর এখন? সন্ধ্যার পর মা বসলেন হিন্দি সিরিয়াল দেখতে, ছেলে বসল ফেসবুকে, বাবা ল্যাপটপ নিয়ে বসলেন, আর মেয়ে ছুটল এসএমএস করতে। কিন্তু শেষপর্যন্ত এসবের ফলাফল কী? আমরা বুঝতেই পারছি না–কীভাবে আমরা নিজেদের জীবনকে ক্রমশ জটিল করে তুলছি।

নতুন নতুন প্রযুক্তি আমরা ব্যবহার করব ঠিকই, কিন্তু তা যেন হয় যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই। কারণ, আধুনিক প্রযুক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার আমাদের নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, অশান্তি বাড়াচ্ছে। প্রযুক্তি কখনো মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। তা-ই যদি পারত, তবে আমেরিকানরা হতো পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী জাতি–সেখানে তো ফেসবুক-ইন্টারনেটসহ সব ধরনের

প্রযুক্তি আরো সহজলভ্য; কিন্তু আজকে হাজার হাজার ডলার খরচ করে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে সবচেয়ে বেশি যাচ্ছে আমেরিকানরাই।

আরেকটি বড় দুঃখের বিষয়, সন্তানদের আমরা আজ মানুষ করছি একটা সাহিত্যহীন পরিবেশে। ছোটবেলায় আমরা কত ধরনের বই পড়তাম–রূপকথা, ঈশপের গল্পসহ আরো কত কী! এখন এসব কিছুই নেই। অথচ সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্য-সচেতনতার মধ্য দিয়ে শৈশব থেকেই মানুষের ভেতরে উন্নত জীবনবোধ গড়ে ওঠে।

শিশুদেরকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে যেতে হবে। ফুল কীভাবে ফোটে, পাখি কীভাবে বাসা বাঁধে ইত্যাদি বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এর মধ্য দিয়ে ওদের চেতনাটা বড় হবে।

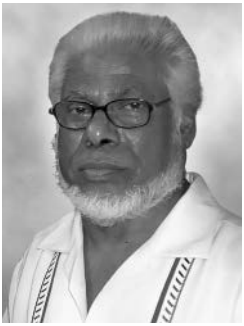
আর এটা পেতে হবে, ওটা করতে হবে, ওর হলো তোমার হলো না কেন–সন্তানকে এসব প্রতিযোগিতার মধ্যে ঠেলে দেয়াতে কোনো সুস্থতা নেই। অসুস্থ প্রতিযোগিতার পথ ধরেই সমাজে অন্যায় মিথ্যা প্রতারণা ধোঁকাবাজি চরিত্রহীনতার প্রকোপ বাড়ে। সমাজ একদিনে তলিয়ে যায় না, দিনের পর দিন একটু একটু করে এটি কলুষিত হয়।

তাই নৈতিকতার গুরুত্ব এখানে অনেক বেশি। একজন মানুষকে পানিতে ফেলে দিলেও সে ভেসে থাকতে পারে, যদি সে সাঁতার জানে। নৈতিক শক্তিও ঠিক তেমনি, জীবনে যত কঠিন সময়ই আসুক মানুষ আবার উঠে দাঁড়াতে পারে যদি সে নৈতিক গুণাবলিতে দৃঢ় ও শক্তিমান হয়।

আমার খুব ভালো লাগে যে, কোয়ান্টাম এসব ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করে তুলছে। একজন মনোচিকিৎসক হিসেবে আমি যে কাউন্সেলিং করি, গুরুজী সেটাই করছেন আরো বড় পরিসরে। অনেকেই আমাকে বলেছেন, কোয়ান্টামে গিয়ে তিনি আগের চেয়ে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন।

জীবনে চলার পথে ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন উত্থানপতন এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ, বিষণ্ণতা এগুলো খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু এর মধ্যেও মানুষকে একটু শান্তি দিতে পারা, ভালো থাকার সাহস যোগানো–এ-তো অনেক বড় ব্যাপার। কোয়ান্টাম সে কাজটিই সুন্দরভাবে করে যাচ্ছে।

ব্যক্তিমানুষের উপকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম মানুষকে সামষ্টিক কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করছে। আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতের বাংলাদেশ একদিন অবশ্যই এ কাজের মূল্যায়ন করবে।



বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি ও প্রশাসনিক আপীলাত ট্রাইবুনাল-এর সাবেক চেয়ারম্যান এম এ মতিন। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৫৬ ব্যাচে অংশ নেন।

চার দিন প্রাণখুলে হেসেছি

বিচারপতি এম এ মতিন

একালের জার্মান লেখক ও খ্যাতিমান বক্তা একার্ট টলি-র লেখা একটি বই পড়ছিলাম–*দি পাওয়ার অব নাউ*। নিউইয়র্ক টাইম বেস্ট সেলার তালিকায় স্থান পাওয়া এ বইটি তিনি শুরু করেছেন চমৎকার একটি গল্প দিয়ে।

এক লোক, রাস্তার ধারে বসে সে ভিক্ষা করছিল। সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক সাধক। ভিক্ষুকটি তার কাছে ভিক্ষা চাইলে সাধক বললেন– 'তুমি কি জানো, তুমি কীসের ওপর বসে আছ? বাক্সটি খুলে দেখ।' ভিক্ষুক একটি ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত কাঠের বাক্সের ওপর বসে ছিল। সে বলল, এর ওপর বসে আমি ৩০ বছর ধরে ভিক্ষা করছি, এটা খুলে দেখার কী আছে?

তবু সাধকের কথায় ভিক্ষুক একসময় বাক্সটি খুলল। দেখা গেল, নিতান্ত অবহেলায় পড়ে থাকা যে বাক্সটির ওপর বসে ভিক্ষুকটি এতদিন পথিকদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিল, সেটি রাশি রাশি সোনায় ভর্তি!

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে গল্পটি আমার বার বার মনে পড়ছিল। কোরআনের একটি আয়াত আমি গত ৪০ বছর ধরে পড়ছি–*নামাজ শেষ করে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো। আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো।*

ঢাকার মিন্টো রোডে আমার বাসা, আর তার খুব কাছেই কোয়ান্টাম মেথডের এমন কর্মচাঞ্চল্যমুখর পরিবেশ–সবমিলিয়ে এত চমৎকার একটি আয়োজন। কিন্তু আমি একদিনও খুঁজে দেখি নি যে, এমন অভূতপূর্ব একটি

অনুগ্রহ আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছিল। এ চার দিন আমি সত্যিই প্রাণখুলে হেসেছি।

কোয়ান্টামের পরিবেশটা এমন পারিবারিক আবহপূর্ণ যে, এখানে এলেই মনে হয় সবাই যেন বলছেন–এটা আপনার পরিবার, আপনার বাড়ি। কোর্সের চার দিনই পারিবারিক হৃদ্যতার এই অনুরণন আমরা সবাই অনুভব করেছি।

দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন, শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞচিত্ততা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কোয়ান্টাম কোর্সে চার দিন ধরে যে আলোচনা করা হয়েছে–সেগুলো আসলে চিরন্তন ধর্মবাণীরই প্রতিধ্বনি। কোয়ান্টাম এভাবে মানুষকে একটি সুন্দর, আলোকিত ও কর্মময় জীবনের দিকে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করে তুলছে।

আসলে কর্মময় জীবনই তো সার্থক জীবন। আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগের কথা। আমার একজন নিকটাত্মীয় দেশের একটি সম্মানজনক প্রতিষ্ঠানে একাউন্টস অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। একপর্যায়ে হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিয়ে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় তিনি মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমালেন। গিয়েই বুঝলেন যে, ভুল করেছেন।

ওখানে তার আয় বেশি হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু সে তুলনায় কাজের পরিবেশটা ছিল বেশ কঠিন। তপ্ত মরুভূমিতে কাটাতে হতো দিনের অনেকটা সময়। এ দুরবস্থার কথা জানিয়ে তিনি আমাকে একটি চিঠি লিখলেন–ওখানে তার আর ভালো লাগছে না, আবার দেশেও চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন, এখন কী উপায়? কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সূরা বালাদ-এর *লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি কাবাত* আয়াতটি উদ্ধৃত করে আমি তাকে লিখলাম–স্রষ্টা মানুষকে শ্রমনির্ভর করেই সৃষ্টি করেছেন। তুমি কাজ চালিয়ে যাও এবং এর পাশাপাশি তোমার পছন্দসই কাজের জন্যে চেষ্টা করতে থাকো।

পরবর্তীতে ঠিক তা-ই হলো। একসময় সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা যখন জানতে পারলেন যে, তিনি একজন কমার্স গ্রাজুয়েট–তখন একই প্রতিষ্ঠানেই তিনি একাউন্টেন্ট পদে নিয়োগ পেলেন।

এর বছর কয়েক পর তিনি ছুটিতে দেশে এসেছিলেন। তখন বললেন, 'আমি যদি তখন দেশে ফিরে আসতাম তবে একূল-ওকূল দুই কূলই হারাতে হতো। সেই হতাশাচ্ছন্ন দুঃসময়ে আপনার চিঠিখানি আমাকে কাজের শক্তি আর সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যুগিয়েছে।'

সেই চিঠি যদি আমি আজ লিখতাম তবে 'কর্মব্যস্ত সুখী জীবন' কথাটি

অবশ্যই উল্লেখ করতাম। কারণ আমি মনে করি, কোয়ান্টাম মেথডের এ সূত্রটি মূলত *সূরা বালাদ*-এর উক্ত আয়াতটির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ জীবনে কর্মটাই আসল; যে কারণে কর্মহীন ইবাদতও কবুল হয় না।

আমি দেখেছি, জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় এমন বিষয়গুলো গুরুজী তার আলোচনায় চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস-এর একটি কথা আছে–'তোমার খাবারই তোমার ওষুধ, তেমনি তোমার ওষুধ হলো তোমার খাবার'। সুস্থ জীবনের জন্যে সঠিক খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে গুরুজীর আলোচনা শুনে একথাটিই আমার বার বার মনে পড়েছে।

এককথায় বলা যায়, কোয়ান্টাম মেথড একটি জীবন-বিজ্ঞান; যিনি যে কারণেই এখানে আসুন বা এ কোর্সে অংশ নেন না কেন, প্রত্যেকেই তার কাজটি সুন্দর ও কার্যকরভাবে করার এবং সেইসাথে মনোদৈহিক সুস্থতা অর্জনের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা এখানে পাবেন।

পবিত্র কোরআনের সূরা ফজর-এ আল্লাহ মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলছেন– *হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে চলো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার (সৎকর্মশীল) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো*। অর্থাৎ যারা প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী তাদেরকেই আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশের আহ্বান জানাচ্ছেন। এটি আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় বান্দার মধ্যকার এমন একটি অবস্থা–যখন আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট এবং বান্দাও তার প্রভুর প্রতি পূর্ণ কৃতজ্ঞচিত্ত বা শোকরগোজার।

এ আয়াতের মর্মার্থ থেকেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি–প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী শোকরগোজার মানুষেরাই পরম করুণাময়ের সন্তুষ্টি অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করবেন। কোয়ান্টাম কোর্সে গুরুজীর আলোচনায় কোরআনের এই চিরন্তন ও সার্বজনীন শিক্ষার মূল সুরটাই ধ্বনিত হয়েছে।

তাই, এ কোর্স থেকে শুকরিয়া আর প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার যে বাস্তব শিক্ষা আমরা পেলাম তা যেন আমরা কেবল নিজেদের মধ্যেই সীমিত করে না রাখি, এটি যেন আমরা আমাদের চারপাশে ঘোষণা করি, ছড়িয়ে দেই মানুষের কল্যাণে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এম শমশের আলী। তিনি একাধারে শিক্ষাবিদ গবেষক লেখক ও টিভি-ব্যক্তিত্ব। বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন ব্যাখ্যায় তার পাণ্ডিত্য সর্বজন-প্রশংসিত। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-উপাচার্য, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পরিচালক এবং বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্স-এর প্রেসিডেন্টসহ বিভিন্ন সময়ে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লামা শমশের আলী কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৫০ ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন।



আল্লাহ মানুষকে ধার্মিক হতে বলেছেন, ধর্মান্ধ নয়

আল্লামা ড. এম শমশের আলী

পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আমার পড়াশোনার শুরুটা বেশ মজার। বাবা আমাকে বলেছিলেন ইংরেজি আর গণিতে ডাবল অনার্স নিয়ে পড়তে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম যেদিন গেলাম, কৌতূহলবশত কার্জন হলে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে উঁকি দিচ্ছিলাম। ভেতর থেকে একজন গুরুগম্ভীর হাঁক ছাড়লেন–কী চাই? বললাম, কার্জন হলটা একটু ঘুরে দেখছিলাম।

বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছি শুনে তিনি আমার কাগজপত্র দেখতে চাইলেন। তারপর বললেন, কাল সকালেই এসে ফিজিক্সে ভর্তি হয়ে যাও। কথাটা তিনি এমন আদেশের সুরে বললেন যে, ইংরেজি আর গণিতে ডাবল অনার্স করার চিন্তাটা মাথা থেকে উবে গেল। পরে জেনেছি, তিনিই পদার্থবিজ্ঞানের খ্যাতনামা অধ্যাপক ড. ইন্নাস আলী।

পরের দিনই পদার্থবিজ্ঞানে ভর্তি হয়ে গেলাম। বাবাকে লিখে জানালাম– বিজ্ঞানের ভাষা যেহেতু গণিত, তাই পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়লে গণিত তো পড়া হবেই, আর ইংরেজি আমি নিজেই পড়ে নেব। সত্যিই তা-ই করেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্কলারশিপের টাকা পেয়েই শেলী, কীট্স, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিনে পড়তে শুরু করলাম।

একজন বিজ্ঞানী গণিতবিদ চিকিৎসক প্রকৌশলী সংগীতজ্ঞ খেলোয়াড় সবাই যার যার পেশা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নিজ নিজ অঙ্গনে জীবনটা কাটিয়ে দেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, জীবন আসলে অনেক বড়, অনেক ব্যাপক। অনেক কিছুর সমন্বয়েই একটা পরিপূর্ণ মানবজীবন। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে এখানে মনুষ্যত্বের আরাধনা করতে হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গিই আমাকে জীবনের নানা পর্যায়ে একাধিক বিষয়ে উৎসাহী করে তুলেছে–পদার্থবিজ্ঞান সাহিত্য ধর্ম সংগীত খেলাধুলা।

প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাশাপাশি বিচিত্র বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠার পেছনে কয়েকজন শিক্ষকের উৎসাহ আমি পেয়েছিলাম। ড. কাজী মোতাহার হোসেন তাদের অন্যতম। পরিসংখ্যানশাস্ত্র বাংলাদেশে যাদের হাত দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল তিনি তাদের একজন।

ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও ছিল তার সুগভীর পাণ্ডিত্য। ভালো দাবা খেলতেন, টেনিস খেলতেন, গান গাইতেন। ছিলেন জাতীয় কবি নজরুলের একনিষ্ঠ বন্ধু। আমি তার খুব প্রিয় ছাত্র ছিলাম। খুব ভালবাসতেন আমাকে। আমার জীবনে তার অবদান অনেক।

আরেকজন মানুষের সাহচর্য আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি পাকিস্তানের নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনায় স্রষ্টার যে প্রজ্ঞাপ্রসূত পরিকল্পনা–এর নানা দিক নিয়ে বিশ্লেষণ তিনি আমাকে বলতেন।

বিভিন্ন সময়ে শোনা তার এ কথাগুলো আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। ইতালির ট্রিয়েস্টে-তে তার প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স (আইসিটিপি), এখন যেটি তার নামে নামকরণ করা হয়েছে, নানা গবেষণা-কর্মের সূত্রে এ প্রতিষ্ঠানের সাথে ৪০ বছর ধরে আমার সম্পৃক্ততা ও নিয়মিত যাতায়াত।

এরকমই একবার আইসিটিপি-তে গেলাম। ৭৮ সালের কথা সেটা। থাকি প্রফেসর গ্লাউকো ইয়েরেনেত্তি'র বাসায়। যেদিন ফিরে আসব–আমার ফ্লাইট ভোর পাঁচটায়। নাছোড়বান্দা ইয়েরেনেত্তি আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে।

সেদিন ভোরে উঠে ফজরের নামাজ পড়ছি, এমন সময় দেখি–রুমের আরেক পাশে ইয়েরেনেত্তি হাত তুলে প্রার্থনা করছে। যা-ই হোক, সে যথারীতি আমাকে পৌঁছে দিল। প্লেনে উঠে হঠাৎ মনে হলো–আচ্ছা, আমি মুসলমান, আমি কার কাছে হাত তুলছিলাম; আর ইয়েরেনেত্তি খ্রিষ্টান, সে কার কাছে হাত তুলছিল? একটা অদ্ভুত অনুভূতিময় শিহরণ হলো আমার।

সেদিন গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম–এক স্রষ্টার অধীনেই আমরা সবাই পরিচালিত হচ্ছি, পৃথিবীর সবকিছু চলছে। তাই, আমরা সবাই যদি স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাস করি, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হই, মানুষকে ভালবাসি আর যার যার ধর্মের অমিল না খুঁজে মিলগুলো খুঁজে বের করি, তবে পৃথিবীটা সত্যিই একটা সুন্দর জায়গা হয়ে ওঠে। কারণ ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলোই তো একমাত্র বিষয় নয়, বরং প্রত্যেক ধর্মের কল্যাণচেতনা আর নির্যাসটাই সবচেয়ে বড় কথা।

একসময় ইসলাম সম্পর্কে পড়তে গিয়ে বুঝলাম–এ এক অপূর্ব খনি। আমরা নৈতিক মূল্যবোধের কথা বলি। অথচ নৈতিকতার একটি বড় উৎস হলো ধর্ম। আর ধর্মের ব্যাপারে ইসলামে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে মধ্যপন্থি হতে বলা হয়েছে। আল্লাহ মানুষকে ধার্মিক হতে বলেছেন, ধর্মান্ধ নয়। কোরআনের শিক্ষা অনুসারে, কোনো মুসলমান সাম্প্রদায়িক হতে পারে না, আবার কোনো সাম্প্রদায়িক লোক মুসলমান হতে পারে না।

শুধু তা-ই নয়, ইসলাম ধর্মে মানুষের প্রতি যে সচেতনতা দেখানো হয়েছে, সেটি এককথায় অসাধারণ। সব ধর্মের, সব বর্ণের এবং দুস্থ নিগৃহীত নিপীড়িত মানুষের প্রতি যে ভালবাসা ও দায়িত্বের কথা এখানে বলা হয়েছে তা অভূতপূর্ব। কোরআনে বার বার বলা হয়েছে, সৃষ্টির সেবাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ এবং এর মাঝেই আছে প্রকৃত সুখ। উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আর অসাম্প্রদায়িক চেতনার একটি অনন্য উদাহরণ এটি।

পৃথিবীর বহু দেশে আমি গিয়েছি। আল্লাহ আমাকে তাঁর জমিনের একটা বড় অংশ দেখার সুযোগ দিয়েছেন। দেখেছি, অঞ্চলভেদে মানুষের ভাষা ভিন্ন, জীবনাচার ভিন্ন; কিন্তু শেষপর্যন্ত সব মানুষ এক। সব মানুষের চাহিদা এক, হৃদয়ের ভাষা এক, একইরকম তার কল্যাণকামিতা। পৃথিবীর যে জায়গাতেই তার জন্ম আর বেড়ে-ওঠা হোক না কেন, সব মানুষের মধ্যেই একটা অপূর্ব ঐক্য আর অভিন্ন ঐকতানের সুর।

কোয়ান্টামের প্রতি আমার যে আকর্ষণ, তার মূল কারণও এটাই–গুরুজী তার আলোচনায় কোরআনে যে শাশ্বত সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে তা তুলে ধরেছেন। সততা আর চিরায়ত মূল্যবোধের কথা বলেছেন। মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও ভালবাসার কথা বলেছেন। এর মধ্য দিয়ে একটি উন্নত মানসিকতার পরিচয় আমি কোয়ান্টামে খুঁজে পাই।

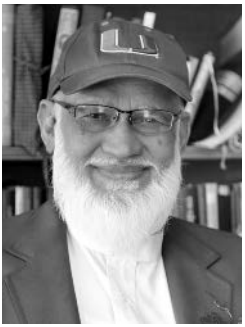
কোয়ান্টামের মূল কথাই হলো শুকরিয়া। আসলে এই শুকরিয়াই

মানবজীবনে সমৃদ্ধির মূল কথা। শুকরিয়া হলো বিশ্বজাহানের মূল কথা। আর কোরআনে বার বার বলা হয়েছে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি নজর দিতে, বলা হয়েছে ভেবে দেখতে, চিন্তা করতে। কিন্তু আমাদের জীবন এখন হয়ে পড়েছে ওঠ্ ওঠ্ ওঠ্, ছোট্ ছোট্ ছোট্, দৌড় দৌড় দৌড়; আর এই অস্থিরচিত্ত ছুটে চলা আর বিশ্বচরাচরের এত বিচিত্র কোলাহলের মধ্যে এ নজর দেয়া সম্ভব হয় না। তাই এর জন্যে চাই তাফাক্কুর বা মেডিটেশন।

অন্তরের ধ্বনি শুনতে হলে, ভেতরের কথা শুনতে হলেও চাই গভীর আত্মনিমগ্নতা। মেডিটেশনের নীরবতা ও আত্মনিমগ্নতায় আমরা আমাদের সেই ভেতরের ডাক শুনতে পাই। এজন্যেই মেডিটেশন এত গুরুত্বপূর্ণ। আত্ম-উদ্‌ঘাটনের জন্যেও প্রয়োজন মেডিটেশনের এই নীরবতা।

জীবন একটাই। এই এক জীবনে যতটা সম্ভব কাজ করে যেতে হবে আমাদের। মানুষকে ভালবাসা আর স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাধ্যমতো সুযোগও এই একটাই। নখ্‌শবন্দীয়া তরীকায় একটা কথা আছে–Hands on the work, Heart on the creator. অর্থাৎ হৃদয়টা প্রভুতে সমর্পিত করে নিরন্তর কাজ করে যাওয়া। কথাটা আমি নিজেও গভীরভাবে বিশ্বাস করি।

আবার শুধু নিজের জন্যে কাজ করে মানুষ কখনো সুখী হতে পারে না। সুখী হতে হলে তাকে অন্যের কথাও ভাবতে হয়। অন্যের জন্যে কাজ করতে হয়। এটাই সত্যিকার সুখের পথ। নবী-রসুল ও মহামানবরা সকলেই তা-ই করেছেন। কোয়ান্টামও সবাইকে অন্যের কল্যাণে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করছে। মানুষকে সুখী সমৃদ্ধ আলোকিত জীবনের পথ দেখাচ্ছে।



বাংলা লোকসংগীতের পুরোধা পুরুষ ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুস্তাফা জামান আব্বাসী। গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ভাটিয়ালি জারি সারি দেহতত্ত্ব ভাওয়াইয়া মারফতি মুর্শিদি ইত্যাদি লোকগীতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে তিনি রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সুসাহিত্যিক ও সংগীত-গবেষক শিল্পী মুস্তাফা জামান আব্বাসী কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২৫৫ ব্যাচে অংশ নেন।

কোয়ান্টাম মেথড হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে

মুস্তাফা জামান আব্বাসী

রবীন্দ্রনাথ তার গানে বলেছেন, *ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো ...*। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই তো কিছু ব্যর্থতা, না-পাওয়ার বেদনা আছে। কিন্তু তারপরও জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দময় হওয়া চাই। তাহলেই কেবল জীবনটা সার্থক হয়ে উঠতে পারে। আর এটি তখনই সম্ভব যখন আমরা জানব–জীবনের লক্ষ্য কী, কিংবা লক্ষ্য কী হওয়া উচিত।

আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি কিছুদিন পড়িয়েছি। একদিন ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের জীবনের লক্ষ্য কী? প্রশ্ন শুনে ওরা একজন আরেকজনের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। একজন বলল, আমরা তো কখনো এভাবে ভেবে দেখি নি।

আমি ওদের বলেছি, মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া চাই আমাদের আত্মাকে পবিত্র করা। প্রতিদিন পবিত্র থেকে পবিত্রতর করা। তুমি কারো দিকে তাকালেই যেন সে তোমার দৃষ্টির মধ্যে একটা পবিত্রতার স্নিগ্ধ স্পর্শ পায়। তোমার পাশে এলেই যেন লোকে একটা পবিত্রতার গন্ধ অনুভব করে। আর এজন্যে সবাইকে ভালবাসতে হবে। চারপাশের সবাইকে মূল্য দিতে হবে।

জীবনের লক্ষ্য আসলে আমার কাছে এটাই। যখন আমি পরিপূর্ণভাবে পরিশীলিত হবো, ধৌত হবো, আমার হৃদয় পবিত্র হয়ে উঠবে কেবল তখনই চিরন্তন পবিত্রতার যিনি প্রতিমূর্তি, তাঁর করুণাধারা লাভ করার সৌভাগ্য আমি অর্জন করব। তিনি আমার হৃদয়ে আসন পাতবেন, আমার অনুভূতিতে ধরা দেবেন। আমি তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারব।

ভারতবর্ষের অন্যতম আধ্যাত্মিক সাধক শ্রী অরবিন্দ। আমেরিকার বড় বড় লাইব্রেরিতে বসে আমি তার বই পড়েছি। স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়েছি। রুমির কবিতা পড়েছি। আমি নবীজী (স)-এর জীবনী পড়েছি, পরবর্তীতে নিজে লিখেছি। ভারতের পন্ডিচেরিতে শ্রী অরবিন্দের আশ্রমে গিয়েছি, তুরস্কের কনিয়া-য় রুমির সমাধিতে গিয়েছি। নবীজীর রওজা মোবারকে গিয়েছি, তাঁকে হামদ্-নাত শুনিয়েছি।

আমি উপলব্ধি করেছি–তাঁরা সবাই প্রেমের কথা বলেছেন, মিলনের কথা বলেছেন। মানুষকে ভালবাসার কথা বলেছেন। যে মানুষ প্রেমকে, মমতাকে মূল্য দেয় সব থেকে বেশি, সে-ই শ্রেষ্ঠ।

আমি অনুভব করেছি–তাঁরা কেউই বিরোধের কথা বলেন নি, কাউকে কষ্ট দেয়ার কথা বলেন নি। কাউকে ছোট করার বা অসম্মান করার কথা বলেন নি, বরং সবাইকে হৃদয়ের উষ্ণতায় বুকে টেনে নিয়েছেন।

আজকে আমেরিকাসহ পুরো পাশ্চাত্যে সবচেয়ে বেশি পঠিত কবিদের একজন হলেন মওলানা জালালুদ্দিন রুমি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর এই মহান সুফিসাধককে তাঁর শিষ্যরা একবার প্রশ্ন করলেন–এমন কিছু কি আছে যা নামাজের চেয়ে উত্তম? রুমি বললেন–'আছে, সেটি হলো নামাজের আত্মা'। এখানেই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব। মনকে সুন্দর করার জন্যে, আত্মাকে পবিত্র করে তোলার জন্যে এটিই দরকার।

এই যে জীবন, একে আমাদের সর্বোচ্চভাবে ব্যবহার করতে হবে। আর এটি সম্ভব কাজের মধ্য দিয়ে। অনেকে বলেন, এত কাজ, কোনোভাবেই সামলাতে পারি না। আমি তখন বলি, তুমি এত বেলা করে উঠলে কেন? সূর্যদেব সেই কখন থেকে তোমার জানালার পাশে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন।

কেউ কেউ আবার বলেন, ভোরে তো উঠতেই চাই, কিন্তু পারি না। আমি ওদের বলি, সব মানুষই এক। কেবল স্বভাব-চরিত্রই তাদের আলাদা করে। স্বভাব পরিবর্তন করা মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। শুধু চাই আন্তরিক ইচ্ছা।

রাতারাতি বদলানোর চেষ্টা নয়, বরং প্রথমে দু-একটি স্বভাবের দিকে মনোযোগী হোন। নিদেনপক্ষে একমাসের কর্মসূচি হাতে নিন। কাজটি কেন

করতে চান, সে বিষয়ে আগে নিজের মনকে বোঝান। মনকে উদ্বুদ্ধ করুন। এটি করতে আপনার বাধা কী, বাধাগুলো কীভাবে অতিক্রম করা যায় তা একটি কাগজে লিখুন। এবার শুরু করুন। বার বার চেষ্টা করুন। আপনি পারবেন। আপনার জীবন সত্যিই একসময় ইতিবাচকভাবে বদলে যাবে।

আর মেডিটেশনই হতে পারে এক্ষেত্রে মোক্ষম ও কার্যকর একটি উপায়। এ কারণে প্রতিটি ধর্মে মোরাকাবা, ধ্যান, মেডিটেশন, আত্মনিমগ্নতা, মৌনতার কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। মেডিটেশন জীবন থেকে নেতিবাচক সমস্ত কিছু দূর করে আমাদেরকে ইতিবাচক শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলে।

আমেরিকাতেও দেখেছি যে-কোনো কাজে বা চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ওরা মেডিটেশন-করা লোকজনকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এর কারণ হলো, এসব মানুষের স্থূলতা ও ভোগবাদিতার দিকে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা কম। এবং এরা তুলনামূলক ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে ও বেশি কাজ করতে সক্ষম।

আমার খুব ভালো লাগে যে, কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের মধ্য দিয়ে মহাজাতক সবার সামনে এই বিষয়টিই তুলে ধরছেন। এ কোর্সে আমি নিজে অংশ নিয়েছি এবং প্রভূত উপকার পেয়েছি।

আমি দেখেছি, কোয়ান্টাম আমাদের জীবনকে সুন্দর করার কথা বলে, সুন্দর জীবনের দিকে পথনির্দেশ করে। মানুষকে একটা কর্মময় জীবনের পথে উদ্বুদ্ধ করে। সবমিলিয়ে বলতে পারি, কোয়ান্টাম মেথড আমাদের হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে।



বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সচিব ভূঁইয়া সফিকুল ইসলাম। এছাড়াও তিনি একাধারে কবি, গীতিকার, সুরকার, লেখক হিসেবে সুপরিচিত। কবিতা, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৩টি। এছাড়াও তার রচিত ও সুরারোপ করা গান নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ১১টি অ্যালবাম। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৬৯ ব্যাচে অংশ নেন।

মানুষের ভেতরকার বিশুদ্ধ সত্তার বিকাশ ঘটায় কোয়ান্টাম

ভূঁইয়া সফিকুল ইসলাম

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আমি এসেছিলাম ধ্যান শিখতে। কিন্তু গুরুজী আমার মধ্যে জাগিয়ে দিলেন ধ্যান জ্ঞান কল্পনা ইচ্ছা মানবতা। সায়েন্স ও আর্টস–এ দুয়ের সমন্বয়ে এত চমৎকার বক্তব্য ইতঃপূর্বে আমি শুনি নি। আমার মনে হয় আমার সাথে এ কোর্সে যারা অংশ নিয়েছেন, তাদেরও এই একই বোধ।

আর কল্পনা তো আমরা প্রায় হারিয়েই ফেলেছি। মানুষ আমরা এখন বড় কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু গুরুজী আমাদেরকে কোথায় নিয়ে গেলেন! রবীন্দ্রনাথ যেখানে যেতে না পারার জন্যে আফসোস করেছেন–

যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে?
সোনার ঘটে সূর্য তারা নিচ্ছে তুলে আলোর ধারা,
অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে ॥
যেথায় তুমি বস দানের আসনে,
চিত্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে।
নিত্য নূতন রসে ঢেলে আপনাকে যে দিচ্ছ মেলে,
সেথা কি ডাক পড়বে না গো জীবনে?

সেই অনন্ত প্রাণময় জগৎ, যেখান থেকে সূর্য তারা গ্রহ নক্ষত্র প্রতিনিয়ত আলোকধারা নিয়ে সমৃদ্ধ হচ্ছে, সেখানে প্রাণ যেতে পারে না বলে রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ ছিল। গুরুজী আমাদের সেখানে, সেই আলোর জগতে নিয়ে গেছেন!

কল্পনা আসলে শুধুই কল্পনা নয়। দার্শনিক হেগেল-এর একটা কথা আছে, Whatever is rational is real. সত্যিই তো। চারপাশে যা-কিছু আজ বাস্তব, তার সবকিছু তো একদিন এই কল্পনাই ছিল। মহাকাশযানে চড়িয়ে গুরুজী আমাদের মহাবিশ্বের কেন্দ্রে নিয়ে গেলেন, সেটা কল্পনা বটে, কিন্তু এমন কল্পনাই তো একদিন বাস্তব হয়েছে।

গুরুজী আমাদের সাগরতলে নিয়ে গেছেন; বিচিত্র শৈবাল, প্রবাল আর সমুদ্রতলের অশেষ মণি-মুক্তা দেখিয়ে এনেছেন। কী আশ্চর্য কল্পনা! আমি যেন সমুদ্রের একটা জলবিন্দু হয়ে গেলাম, যার মধ্য থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল– 'আমিই সমুদ্র'।

আসলে আমরা প্রত্যেকেই কি এমন একেকটা জলবিন্দু নই? মহাবিশ্বে যা-কিছু আছে, মানুষের মধ্যেও ঠিক তা-ই আছে। এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ হচ্ছে মানুষ। প্রতিটি মানুষই একেকটি অণুবিশ্ব।

কোরআন যখন নাজিল হয় তখন পাহাড়-পর্বত কারোরই সে যোগ্যতা ছিল না একে ধারণ করার। কিন্তু মানুষ পেরেছে। কারণ, সে যে একটা অণুবিশ্ব। আর এ অণুবিশ্বই কেবল পারে মহাবিশ্বকে ধারণ করতে। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে মেডিটেশনের সময় আমি যেন সেই অসীমকে অনুভব করতে পেরেছি। একাকার হয়ে গেছি মহাবিশ্বের সবকিছুর সাথে– রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, *বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো/ সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও*।

সুফিজমের মূল কথাও এটাই–মানুষের মধ্যে আছে একটা অসীমের বোধ। অন্য কোনো প্রাণী কিংবা অস্তিত্ব, যত শক্তিশালীই সে হোক, আর কারো মধ্যে এটা নেই।

এভাবে বিজ্ঞান ধর্ম দর্শন সাহিত্য ইতিহাস–অনেকগুলো বিষয়ই উঠে এসেছে এ কোর্সে। এত জ্ঞানময় শিক্ষা, এত হাসি-আনন্দের ভেতর দিয়ে পরিবেশন করা যায়, এটা সত্যিই আশ্চর্য! কখনো কখনো হেসে উঠেছি শিশুদের মতো। অনেকদিন বোধহয় এভাবে হাসি নি। আসলে একজন ভালো শিক্ষককে একজন ভালো আর্টিস্টও হতে হয়।

একজন মানুষ কীভাবে তার ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে, সে-কথা

বার বার ঘুরেফিরে এসেছে গুরুজীর আলোচনায়। লক্ষ্য অর্জনের জন্যে চিত্তকে সুতীক্ষ্ণ করার কথা বলেছেন গুরুজী। এজন্যে একটি প্রক্রিয়া তিনি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। তার নাম মনছবি।

আসলে যে-কোনো বড় অর্জনের জন্যে চাই সুতীক্ষ্ণ চিত্ত। এ না হলে কখনো লক্ষ্যভেদ করা যায় না, সমস্যাকে জয় করা যায় না। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা কিশোর সুকান্তের কবিতা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছি। তিনি লিখেছিলেন–

বন্ধু তোমার ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি, বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।

ওই সময়কার একটা ঘটনা খুব মনে পড়ে। আমাদের স্কুলেই ছিল মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। একরাতে আমাদের ক্যাম্প আক্রান্ত হলো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বারা। সারা গ্রামের মানুষ সেদিন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল যে, আমরা শেষ পর্যন্ত ক্যাম্প রক্ষা করতে পারব কিনা। প্রচণ্ড ভয়াবহ ছিল তাদের আক্রমণ–মুহুর্মুহু গুলি উড়ে যেতে লাগল আমাদের মাথার ওপর দিয়ে। আমরা জানতাম, এর যে-কোনো একটি এসে বিঁধতে পারে আমাদের শরীরে। তবু আমরা হাল ছাড়ি নি।

একসময় মুক্তিবাহিনীর প্রাণান্ত প্রতিরোধের সামনে টিকতে না পেরে ওরা পিছু হটে। শত্রুপক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছিল যে পাকিস্তানি মেজর, সে মারা পড়ে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় ওদের। ওরা পালিয়ে যায়।

মুক্তির জন্যে এই যুদ্ধ আমাদের এখনো শেষ হয় নি। তাই আমি বলি, আমি আজও একজন মুক্তিযোদ্ধা। কারণ মুক্তিযুদ্ধের প্রধান লক্ষ্যই ছিল, মানুষের মাঝে সাম্য স্থাপন করা। মানুষকে বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেয়া। কিন্তু আমাদের সে লক্ষ্য কি পূরণ হয়েছে?

দেশের গণমানুষ আজও সাম্য পায় না, শক্তিমানরা এখানে প্রচণ্ড প্রবল, দুর্বলেরা ঠিক ততটাই অসহায়। এ অবস্থার পরিবর্তন হলেই কেবল আমাদের স্বপ্ন সার্থক হবে। আমি আমার কর্মজীবনে এবং সৃজনশীলতার জগতেও সে লক্ষ্যেই কাজ করে চলি।

আমি আমার কবিতা, গান ও সুরে মানবতার কথা বলি। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে মানুষকে ভালবাসার কথা বলি। আজ নানা প্রশ্নে এমনকি ধর্মের নামেও দেশে-বিদেশে এত হানাহানি। অথচ জন্মই কিন্তু ধর্ম নির্ধারণ করে। *জগত পিতা দেন তারে ঠাঁই মানব পিতার ঘরে* ।

আমি ভূঁইয়া সফিকুল ইসলাম কালিপদের ঘরে জন্মগ্রহণ করলে মা কালীই হতেন আমার উপাস্য। এ কথা আমরা কেন ভুলে যাই? একটা গানে আমি লিখেছি–*এক ফুলে বাগান জমে না, লাগে নানান গাছ/ নানান ফুলে নানান কুসুম ফোটে বারো মাস*।

সেই দৃশ্যটিই আমি দেখেছি কোয়ান্টাম শিশুকাননের একটি ভিডিওচিত্রে। আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। এত বিচিত্র ও ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর শিশুরা একটা উদাত্ত মানবিক আবহাওয়ায় একসাথে বেড়ে উঠছে। এই যে সব ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে একই ছায়াতলে আনা, জ্ঞান ও ধ্যানের আলোয় আলোকিত করা, এ সত্যিই অনন্য। এ আলো প্রেম মানবতা লক্ষ প্রাণে ছড়িয়ে পড়ুক।

মানবতা আর ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে আমরা আমাদের মননকে যত বিকশিত ও ঋদ্ধ করতে পারব, তত সবার জীবনেই এমন অনন্য সফলতা আসবে। আর এখানে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারে কোয়ান্টাম। কারণ, মানুষের ভেতরকার যে 'অথেনটিক সেল্ফ' বা বিশুদ্ধ সত্তা, তার বিকাশ ঘটায় কোয়ান্টাম। তাই আমি বিশ্বাস করি, তরুণদের আশাবাদী ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে পারে কোয়ান্টাম মেথড।



অধ্যাপক ড. নূরুর রহমান খান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ও সংস্কৃত বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অধ্যাপক নূরুর রহমান কোয়ান্টাম মেথডের ২২৩ ব্যাচে অংশ নেন।

চিত্তের বিকাশ ও সমাজের কল্যাণে কাজ করছে কোয়ান্টাম

অধ্যাপক ড. নূরুর রহমান খান

১৯৯৬ সালের কথা। আমার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তার চিকিৎসার জন্যে রক্তের প্রয়োজন হলো। রক্ত দিলেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের নিবেদিতপ্রাণ সদস্য সুরাইয়া রহমান এবং আরেকজন সদস্য। তখন কোয়ান্টামের নিজস্ব কোনো ল্যাব ছিল না, কারো রক্তের প্রয়োজন হলে কোয়ান্টাম পরিবারের সেবাব্রতী সদস্যরা বিভিন্ন ক্লিনিক-হাসপাতালে গিয়ে রক্তদান করে আসতেন।

ইতঃপূর্বে আমার স্ত্রী ফিক্‌রিয়া বেগম (সেন্ট্রাল উইমেন্'স ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন অধ্যাপক), কন্যা সুমাইয়া ফারাহ্ খান (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ও বর্তমানে স্কটল্যান্ডের এবার্ডিন ইউনিভার্সিটিতে পি-এইচ.ডি গবেষণারত) ও পুত্র ড. রুবাব মো. ইমরোজ খান সৌরভ (বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে অবস্থিত নাসা-য় পোস্ট ডক্টরাল গবেষণায় নিয়োজিত) এবং নিকটাত্মীয়রা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়েছিলেন। মূলত তাদেরই অনুপ্রেরণায় আমিও কোর্সটি করি। এবং বেশ চমৎকৃত হই।

হাজার বছর আগে আমাদের এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চর্চিত একটি বিষয় ছিল এই ধ্যান। সাধনার প্রাচীন এ পদ্ধতিটি আমাদের জীবন থেকে অবলুপ্ত

হয়ে গিয়েছিল প্রায়। একে আবার নতুন করে প্রাণদান করল কোয়ান্টাম। আধুনিক মানুষের মনোদৈহিক ও সার্বিক কল্যাণার্থে একে সঞ্জীবিত করেছেন আমাদের গুরুজী। একটি বড় লক্ষ্যকে সামনে রেখে ধ্যান বা মেডিটেশনকে তিনি করে তুলতে চাইছেন আমাদের একটি নিত্য-অভ্যাস।

প্রায় দু-দশক ধরে আমি দেখেছি, কোয়ান্টাম যে শুধু ব্যক্তিমানুষের কল্যাণ ও জাগরণের প্রতিই মনোযোগী, তা নয়; এর পরিধি বাড়ার সাথে সাথে সমাজের নানা প্রয়োজনে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে এসেছেন কোয়ান্টাম পরিবারের সর্বস্তরের সদস্যরা।

নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের জন্যে সবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে অত্যাধুনিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা, প্রসূতি মায়েদের জন্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা এবং বান্দরবানের লামায় স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিত্তহীন পরিবারের শিশুদেরকে সুশিক্ষা, খেলাধুলা ও উন্নত জীবনের আলোয় আলোকিত করার চেষ্টা ইত্যাদি কার্যক্রমগুলো সত্যিকার অর্থেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বছর কয়েক আগে লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজে আমি গিয়েছিলাম। সে-বছরের ভর্তি পরীক্ষাটা দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। সুযোগ ঘটেছিল ওখানে ভর্তিচ্ছু পাহাড়ি-বাঙালি শিশুদের দেখার এবং ওদের বাবা-মা-অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অনেক কিছু জানার।

সেবার দেখেছিলাম, অধিকাংশ দরিদ্র দুস্থ বঞ্চিত পরিবারের শিশুদের পাশাপাশি ওখানে ভর্তি হতে এসেছে সচ্ছল পরিবারের শিশুরাও। তেমনি এক শিশুর অভিভাবক আমাকে এসে বললেন, স্যার, আমার ছেলেটাকে আপনাদের স্কুলে ভর্তি করে নিন। জানতে চাইলাম, তিনি কেন এত দূর থেকে এখানে এসেছেন। চাইলে তো পয়সা খরচ করে শহরের স্কুলে ভর্তি করাতে পারেন সন্তানকে।

তিনি বললেন, 'আমাদের এলাকায় একটি হতদরিদ্র পরিবার আছে, নোংরা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে ওদের বসবাস। তাদের একটি সন্তান গত বছর এ স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তিন/ চার মাস পর যখন সে প্রথম বাড়ি গেল, দেখি, বেশ পরিপাটি পরিচ্ছন্ন সুন্দর একটি শিশু। তার আচার-আচরণ চলাফেরা সবকিছুর মধ্যেই অনেক পরিবর্তন! আমার বাচ্চাটা এ স্কুলে ভর্তি হতে পারলে ওর জীবনটাও বদলে যাবে স্যার।'

তার আকুতি দেখে খুব অবাক হলাম। আমার মনে হলো, সন্তানদের পড়াশোনা ও সুন্দর বিকাশের জন্যে সব অভিভাবকই চায় এমন একটা পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গা। কোয়ান্টাম সেটাই দিতে পেরেছে।

এর কিছুদিন পর আবার যাওয়ার সুযোগ হলো ওখানে। ইচ্ছে ছিল, আগের বার যে শিশুদের ভর্তি করেছিলাম তাদের দেখব–ওরা কেমন আছে, কী করছে।

একদিন সকালে স্কুলের মাঠে বসে আছি। বাচ্চাদের খেলাধুলা দেখছি। এমন সময় এক ক্ষুদে শিক্ষার্থী আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। একটু একটু করে এগিয়ে এসে বসল প্রায় আমার কোল ঘেঁষে। বলল, 'স্যার, আপনি কোত্থেকে এসেছেন?' বেশ সপ্রতিভ আর সাহসী সেই ছেলেটি। তার সাথে অনেক কথা হলো। ক্লাস টু-তে পড়ে সে। বাবা রিকশা চালায়, মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে। বললাম, কেমন লাগে এখানে? সে বলল, খুব ভালো।

একপর্যায়ে আমাকে বেশ অবাক করে দিয়ে ছেলেটি বলল, 'স্যার, আপনার ছেলে আছে?' বললাম, 'আছে, কেন?' সে বলল, 'ওকে এখানে ভর্তি করে দেন স্যার। আমাদের স্কুলে অনেক আনন্দ। সবকিছুই খুব সুন্দর। ও এই স্কুলে ভর্তি হলে আমাদের সাথে অনেক আনন্দে থাকবে।'

তার কথা শুনে হেসে ফেললাম। বললাম, ভর্তি তো করতেই চাই, কিন্তু এখন তো আর ভর্তি করা যাবে না। সে যে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে!

ছেলেটির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস দেখে একটা আশাবাদ অনুভব করেছিলাম নিজের ভেতরে। শৈশব থেকেই কল্যাণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত এই ছেলেটিই যখন একদিন বড় হবে; সমাজ ও দেশের জন্যে কাজ করবে তখন এই দেশ তো আর আজকের দেশ থাকবে না। পরিবর্তন আসবেই।

উন্নত বিশ্বে এ কাজগুলো করে রাষ্ট্র কিংবা সমাজের বিত্তবান মানুষেরা। আমাদের সমাজেও বিত্তবান অনেকেই আছেন বটে, কিন্তু চিত্তবান সকলেই নন। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তার সব ধরনের কাজ ও উদ্যোগের মধ্য দিয়ে মানুষকে চিত্তবান করে তুলছে। চিত্তের শুশ্রূষা করছে। ধ্যান ও সেবার পথ ধরে মানুষকে জাগিয়ে তুলছে। সবমিলিয়ে বলতে পারি, চিত্তের বিকাশ ও সমাজের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে কোয়ান্টাম।



এম এইচ শমরিতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও দেশের প্রখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. এম ইউ কবীর চৌধুরী। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৪১ তম ব্যাচে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

নিরাময় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে কোয়ান্টাম মেথড

অধ্যাপক ডা. এম ইউ কবীর চৌধুরী

আমি তখন অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা জেনারেল হাসপাতালে চর্মরোগের ওপর উচ্চতর পড়াশোনা করছি। এলার্জির সমস্যা নিয়ে একজন রোগী ভর্তি হলেন হাসপাতালে। নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করা হলো তার, কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনোভাবেই এলার্জির কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

প্রফেসর নিবাওয়ার ছিলেন সে হাসপাতালের একজন বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসক। ১৯৪৭ সালে যিনি প্রথম দেখান যে, মানুষের ত্বক ও শরীরে আর্সেনিক-বিষক্রিয়া হতে পারে। তার সাথে একদিন রাউন্ডে আমরা যখন সেই রোগীটিকে দেখছিলাম, এমন সময় সেখানে রোগীর স্ত্রী এলেন। স্ত্রীকে দেখামাত্রই তার চেহারা হঠাৎ অন্যরকম হয়ে গেল এবং মুহূর্তেই সারা শরীর চাকা চাকা হয়ে চুলকাতে শুরু করলেন রোগী।

আমরা তখন খুব সহজেই বিষয়টি বুঝতে পারলাম। প্রফেসর নিবাওয়ার বললেন, রোগী তার স্ত্রীকে পছন্দ করেন না, আর স্ত্রীর সাথে এই দ্বন্দ্বমুখর সম্পর্কই তার এলার্জির মূল কারণ। এটা হলো সাইকোজেনিক এলার্জি।

আমার প্রায় চার দশকের চিকিৎসক-জীবনে দেশে-বিদেশে এমন অসংখ্য ঘটনা আমি দেখেছি। আসলে আমাদের যত রোগ-ব্যাধি তার একটা বড়

অংশই সাইকোসোমাটিক অর্থাৎ মনোদৈহিক। আর আর্টিকেরিয়া, লাইকেন প্ল্যানাস, সোরিয়াসিস ইত্যাদি চর্মরোগের সাথে টেনশন বা স্ট্রেসের সম্পর্ক তো একেবারে সরাসরি।

সোরিয়াসিসের কথাই ধরা যাক। দুরারোগ্য এ চর্মরোগটির মূল কারণ স্ট্রেস। বংশগতভাবে একজনের জিন-এ হয়তো সুপ্ত অবস্থায় এটি ছিল, রোগটা হয়তো তার কখনোই হতো না, কিন্তু জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে যেই তিনি স্ট্রেস-আক্রান্ত হলেন, তখনই সোরিয়াসিসের লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করল। এ ধরনের রোগীরা যদি স্ট্রেসমুক্ত জীবনযাপন করতে পারেন তবে এরা দিব্যি সুস্থ থাকতে পারেন। এ থেকে পূর্ণ নিরাময় লাভ করতে পারেন।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এসব দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত রোগীরা মেডিটেশন ও অটোসাজেশনের মাধ্যমে স্ট্রেসমুক্ত ও সুস্থ জীবনযাপন করতে পারেন। যে-সব রোগী টেনশন ও স্ট্রেসজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন তাদের আমি এখন বলি, কোয়ান্টামে যান। মেডিটেশন করুন, আপনি ভালো থাকবেন।

আমার ছাত্র ও সহকর্মীদের অনেকেই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সদস্য। অনেকদিন ধরে তারা এ কোর্সে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করছিল আমাকে। এর মধ্যে আমার এক ছাত্রী–যে অত্যন্ত ধার্মিক ও নামাজী–সে বলল, মেডিটেশন করে তার নামাজে মনোযোগ আগের চেয়ে বেড়েছে। বিষয়টি আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করল।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে দেখলাম, এ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ। মনে হলো, আমার তো এখানেই থাকার কথা, এটা তো আমারই জায়গা। আমি চাই, কিন্তু কী চাই তা আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না; এখানে এসে বুঝলাম– আমি আসলে কী চাই।

আমার ভেতরের শূন্যতাটুকু এখানে এসে পূরণ হলো। মেডিটেশনের মাধ্যমেই এটি সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও আমার দৈনন্দিন ক্লান্তিটুকু ঘুচিয়ে মেডিটেশন আমাকে সতেজ করে তুলছে। ইদানীং চেম্বারে রোগী দেখা শেষ করে ডাক্তারদের সবাইকে নিয়ে একসাথে বসে মেডিটেশন করি। তাতে ক্লান্তিটা খুব সহজেই কেটে যায়।

দেশে-বিদেশে আমি অনেক সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অংশ নিয়েছি, কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের মতো এমন মনোযোগী শ্রোতা আমি আর কোথাও দেখি নি। আমি নিজেও আমার শিক্ষাজীবনে এত মনোযোগ দিয়ে কোনো

ক্লাস করি নি, যতটা মনোযোগী এখানে ছিলাম। আমার বিশ্বাস, এটা কোনো হিপনোটিজম বা সম্মোহনী শক্তির জন্যে নয়, এটা সম্ভব হয়েছে গুরুজীর সত্যভাষণের কারণে, যার উৎস তার অবিচল বিশ্বাস–এ বিশ্বাস স্রষ্টার প্রতি, এ বিশ্বাস মানুষের প্রতি।

বর্তমানে আমি যে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছি–এখন বুঝতে পারি, তা আসলে কোয়ান্টামের ভাষায় 'মনছবি'রই বাস্তব উদাহরণ। শৈশবে দেখেছি আমার নানীর চর্মরোগ ছিল, তখন থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল, চর্মরোগের চিকিৎসক হবো। স্কুলের পরীক্ষায় 'জীবনের লক্ষ্য' রচনা লিখতে গিয়েও লিখেছি–চিকিৎসক হয়ে মানুষের সেবা করতে চাই।

চিকিৎসক-জীবনের শুরুর দিকের একটি ঘটনা আমার এ মানসিকতাকে আরো পোক্ত করেছে। '৮০ সালের কথা। আমি তখন ইরানের খুর্‌রামাবাদ স্কিন হসপিটালে চাকরি করি। প্রতিদিনের মতো সেদিনও হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রায় ৩০০ জন রোগী। কিন্তু আমরা চার জন ডাক্তারের মধ্যে তিন জনই সেদিন অনুপস্থিত। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমাকেই সব রোগীর চিকিৎসা দিতে হলো।

পাহাড়ের ওপর সেই হাসপাতাল, শীতকাল, বরফ পড়ছে, আমার বাসাও বেশ দূরে। রোগী দেখা শেষ করে বেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বাচ্চা কোলে নিয়ে এক মহিলা এল। কম্পাউন্ডার দৌড়ে এসে বললো, স্যার এ বাচ্চটাকে একটু দেখে দিন। বিরক্ত হয়ে বললাম– পারব না, কাল আসতে বলো।

আমারই বয়সী সেই কম্পাউন্ডার গোলাম জাদে তখন বলল, স্যার, ধরুন, আপনার স্ত্রী এভাবে আপনার অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলেন আর ডাক্তার তাকে ফিরিয়ে দিলেন, তখন কেমন লাগত আপনার?

চমকে উঠলাম! কথাটা ভীষণভাবে নাড়া দিল আমাকে। সেদিন বাচ্চাটাকে চিকিৎসা দিয়ে পরে আমি বাসায় যাই। এটি আমার চিকিৎসক-জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা, যা আমি আজও ভুলতে পারি না। তারপর থেকে যত ব্যস্ততাই থাকুক, কোনো রোগীকে আমি কখনো ফিরিয়ে দেই না।

আমার ছাত্রদেরও বলি, কখনো বিরক্তি নিয়ে রোগীর চিকিৎসা করবে না, এতে ডাক্তারের প্রতি রোগীর বিশ্বাসটুকু নষ্ট হয়ে যায়। আর ভালো ডাক্তার হতে হলে আগে ভালো মানুষ হতে হবে। রোগীর কষ্টটাকে অনুভব করতে হবে। এর পাশাপাশি চাই প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা।

দেশে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ এবং কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে

পোস্টগ্রাজুয়েট ছাত্রদের আমি পড়াই। কিন্তু এর বিনিময়ে আমি কোনো পারিশ্রমিক নিই না।

অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসপ্রতি ৫০০ ডলার নিতে না চাইলে তারা খুব অবাক হয়; কিন্তু আমি বলি, এটা আমার ব্রত। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, আমার কোনো জ্ঞান নেই, আল্লাহ আমাকে এই জ্ঞান দান করেছেন। আর আমি যে ছাত্রদের পড়াচ্ছি তারা মানুষের চিকিৎসা করবে, অন্যদের পড়াবে। এভাবেই এ জ্ঞানের ধারা বহমান থাকবে এবং মানুষ এ থেকে উপকৃত হবে। আমি মনে করি, এটা আমার জন্যে সদকায়ে-জারিয়া।

আমাদের দেশ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি দেশ। আমাদের অভাব শুধু প্রকৃত শিক্ষা আর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির। আমার বিশ্বাস, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মানুষকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে উজ্জীবিত করার পাশাপাশি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলছে।

দেশের বিশিষ্ট শিশু-চিকিৎসক ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিওন্যাটোলজি-র বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. আবিদ হোসেন মোল্লা। সম্প্রতি (২৩ জুলাই ২০১৫) মাগুরায় একটি রাজনৈতিক সহিংসতায় গুলিবিদ্ধ হন একজন মহিলা ও তার গর্ভস্থ শিশু। জন্মের দুদিন পর সংকটাপন্ন অবস্থায় শিশুটিকে ঢা.মে.ক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক আবিদ। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩২৮ ব্যাচে অংশ নেন।



আত্মিক সুখের জন্যে অন্যের কল্যাণে কাজ করতে হবে

অধ্যাপক ডা. আবিদ হোসেন মোল্লা

২৩ জুলাই মাগুরা সদর হাসপাতালে জরুরি অপারেশনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় মাতৃগর্ভে গুলিবিদ্ধ এ শিশুটি। মাতৃগর্ভে ৪০ সপ্তাহ (ন্যূনতম ৩৭ সপ্তাহ) সময়কাল পার করলে আমরা তাকে ফুল-টার্ম বেবি বলে থাকি। কিন্তু এ শিশুটির গর্ভকালীন বয়স ছিল ৩২ সপ্তাহ। অর্থাৎ প্রি-ম্যাচিউর বেবি। স্বাভাবিকভাবেই তাই নানান জটিলতা দেখা দিয়েছিল। এছাড়াও গুলির জখম তো আছেই!

স্থানীয়ভাবে চিকিৎসকরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেন শিশুটিকে বাঁচাতে, দুদিন বাদে পাঠিয়ে দিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। আমাদের নিওন্যাটোলজি ইউনিটে ওকে ভর্তি করা হলো। গুলির ক্ষত সারাতে মোট ২১টি সেলাই পড়ল ওর ছোট্ট শরীরে।

এ ধকল সামলে ওঠার আগেই মারাত্মক জন্ডিস দেখা দিল শিশুটির। শরীরে পানি জমে গেছে, যেখানে হাত দেই দেবে যাচ্ছিল। এছাড়াও রক্তের প্লাটিলেট কমে যাচ্ছে, উপরন্তু হার্টে একটি ছিদ্র ধরা পড়ল এবং সেইসাথে অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন। সবমিলিয়ে অবস্থা রীতিমতো সংকটাপন্ন। সাথে যুক্ত হয়েছে নানারকম চাপ–গণমাধ্যমের চাপ, মানুষের প্রত্যাশার চাপ ইত্যাদি।

অবশ্য এ সময়টাতে সবাই খুব সহযোগিতা করেছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও নার্সরা তো ছিলেনই, সাথে অন্যান্য হাসপাতালের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাও আমাদের পাশে ছিলেন তাদের সাধ্যমতো।

সময়টা ছিল ভীষণ কঠিন। একে তো অপরিণত শিশু, ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক, তার ওপর একটার পর একটা সমস্যা প্রতিদিন দেখা দিচ্ছিল। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। একদিন কোয়ান্টামের একজন অর্গানিয়ারকে ফোনে বললাম, 'গুরুজীকে বিষয়টা জানিও, দোয়া করতে বোলো।' সে বলল, 'স্যার, আমি জানাব গুরুজীকে। আর আপনি যেহেতু বাচ্চাটার দায়িত্ব নিয়েছেন, আপনি একটু বেশি করে দোয়া করবেন।'

এর মধ্যেই একদিন অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে গেল। রাতে বাসায় গিয়েও দুশ্চিন্তায় ছটফট করছি। আমার স্ত্রী বললেন, 'কী হয়েছে?' কিছুটা হতাশার সুরেই বললাম, 'বাচ্চাটার অবস্থা বিশেষ ভালো না, সকালে হাসপাতালে গিয়ে কী শুনতে হয় জানি না।' উনি বললেন, 'তুমি নামাজ পড়ো।'

নামাজ পড়ে গভীর আকুতি নিয়ে দোয়া করলাম। মনে হলো, আমরা আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছি, এখন সিদ্ধান্ত তাঁর হাতে। একটা শান্তি অনুভব করলাম দোয়ার পর। এমন একটি অনুভূতি হলো যেন আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন!

আল্লাহর অশেষ রহমত, পরদিন থেকেই অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করল। সংকট কেটে গেল একসময়। অবশেষে ২০ আগস্ট আমরা শিশুটিকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি। এটি আমাদের জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে বিশেষ সাহায্য। এজন্যে সবসময় তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

এ ঘটনাটি আমাকে এক অন্যরকম উপলব্ধিতে সিক্ত করেছে। কারো জন্যে আন্তরিকভাবে কিছু করা এবং মানুষকে দেয়ার মধ্য দিয়েই আমরা আসলে সত্যিকার সুখ ও আত্মিক পরিতৃপ্তি লাভ করি, যা অর্থবিত্ত প্রশংসা যশ হাততালি কখনোই দিতে পারে না। আর এগুলো বেশি হলে বরং মানুষ বেহিসাবি হয়ে পড়ে। স্খলন ঘটে নানাভাবে।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের একটা লেখা পড়েছিলাম। তিনি বলেছেন– 'আমাদের দুই টাকা হলে আমরা চার টাকা চাই, চার টাকা পেলে আট টাকা, আট টাকা পেলে ১৬ টাকা। আমাদের চাওয়াটা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে। কোথায় এর শেষ আমরা নিজেরাই জানি না। আর এ নিদ্রাহীন চাওয়ার মধ্যেই অধিকাংশ মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায়। সুখ আর মেলে না।'

সুখী হওয়ার জন্যে তাই তিনি বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যাখ্যান করতে শেখো। অর্থাৎ আমার বেঁচে থাকার জন্যে এর বেশি আর দরকার নেই। বেশি যা আছে সেটা দিয়ে দাও।'

কথাটা আমি নিজেও গভীরভাবে বিশ্বাস করি। এই যে কোয়ান্টামের উদ্যোগে এত ছেলেমেয়ে লামায় পড়াশোনা করছে, এ কাজটা তো গুরুজী ঢাকায়ও করতে পারতেন। কিন্তু করেন নি, কারণ তিনি প্রচার চান নি। দুর্গম পাহাড়ে যারা শিক্ষা ও ন্যূনতম সুযোগসুবিধা বঞ্চিত–তিনি চেয়েছেন তাদের জন্যে কাজ করতে। ওদের সন্তানদের গড়ে তুলতে। তিনি চেয়েছেন আত্মার সুখ–নিজের জন্যে, কোয়ান্টাম পরিবারের সবার জন্যে।

আত্মার এ সুখটা পায় বলেই একজন মানুষ পরার্থে কাজ করে, দিয়ে দিতে পারে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবটুকু। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান স্যার তার পেনশনের পুরো অর্থই জনকল্যাণে ব্যয় করেছেন। হাসপাতাল নির্মাণ করেছেন তার জন্মস্থান সাতক্ষীরাতে। একদিন গেলাম তার কাছে।

স্যারকে বললাম, পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় পেশাগত ও বৈষয়িক অনেক অর্জন আছে আমার জীবনে। এ সবকিছুই আমাকে বাহ্যিক সুখ দেয় সত্যি, কিন্তু একটা অন্তর্জ্বালা প্রায়ই ভেতরে কাজ করে–মানুষকে আসলে আমি কতটুকু দিতে পেরেছি?

স্যার বললেন, যে মাটিতে তুমি বেড়ে উঠেছ সে মাটির ঋণ শোধ করো। তোমার আয়ের শতকরা ২.৫ ভাগ যাকাত তো দিচ্ছ। আরো ২.৫ ভাগ সেবামূলক কাজে দান করো। আর প্রতি মাসে তোমার মোট কর্মঘণ্টার শতকরা ২.৫ ভাগ সময় ওখানে সেবামূলক কাজে ব্যয় করো।

স্যারের কথামতো আমি এটি অনুসরণ করছি এবং যশোরে নিজ গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছি। আসলে সুস্থ সুন্দরভাবে সমাজে বাস করতে চাইলে এ-কাজগুলো আমাদের সবাইকেই করতে হবে। কারণ, একা ভালো থাকা যায় না। সম্ভবও নয়।

ধরা যাক, আপনি ভালো ড্রাইভ করেন, কিন্তু ওপাশ থেকে যে আসছে সে যদি ভালো ড্রাইভার না হয় তাহলে তো দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়। তাই তাকেও প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতায় যোগ্য করে তুলতে হবে।

আর এজন্যে নিজেদের চাওয়াপাওয়ার গণ্ডি ছেড়ে বাইরে আসতে হবে। দাঁড়াতে হবে মানুষের প্রয়োজনের পাশে। অন্যের কল্যাণে কাজ করার মধ্য দিয়েই মিলতে পারে আমাদের আত্মিক সুখ ও সত্যিকার পরিতৃপ্তি।



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার-এর প্রকল্প সমন্বয়ক অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২২৭ ব্যাচে অংশ নেন। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাপ্তাহিক আলোকায়ন কার্যক্রমে তিনি এ বক্তব্য দেন।

পরার্থে কাজ জীবনকে সার্থক করে

অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ

বছরখানেক আগে সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ারের উদ্যোগে বিএসএমএমইউ-তে আমরা একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম। প্রায় ৮০ জন চিকিৎসকের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত দুদিনব্যাপী এ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল *স্পিরিচুয়াল ডাইমেনশন অব হেলথ কেয়ার*। বাংলায় আমরা যাকে বলতে পারি 'স্বাস্থ্যসেবার আধ্যাত্মিক দিক'।

অর্থাৎ রোগীর অসুস্থতার সময় প্রথাগত চিকিৎসাসেবা দেয়ার পাশাপাশি তার আত্মিক দিকটারও কি কোনো যত্ন নেয়া প্রয়োজন? নিরাময়-অযোগ্য রোগে আক্রান্ত একজন মানুষ যখন মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করতে বাধ্য হয়, সেই সময়টায় একজন চিকিৎসক কীভাবে রোগীর আত্মাকে খানিকটা স্বস্তি দিতে পারেন?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই আরো কিছু প্রশ্ন আমাদের সামনে চলে আসে। যেমন, মন ও আত্মা বলতে আসলে আমরা কী বুঝি? বিষয়টা আসলে কী?

মনোবিজ্ঞান তো বটেই, এর পাশাপাশি ধর্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র এবং যুক্তিবিদ্যার একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে মন। মন ছাড়া আর অন্য কোনো

বিষয়ের ওপরে বিজ্ঞানের এতগুলো শাখায় আলোচনা হয়েছে কিনা তা আমি জানি না। এরিস্টটল প্লেটো দেকার্তে থেকে শুরু করে বহু দার্শনিক মন নিয়ে চিন্তা করেছেন। তাদের কেউ বললেন, আমরা যেখানে ইচ্ছা পোষণ করি সেটাই হলো মন; কেউ-বা বললেন, মন হচ্ছে আমাদের স্মৃতিশক্তি; আবার কেউ বললেন, আমরা যা চাই তা-ই হলো মন।

মন কি শুধুই স্মৃতির জায়গা? আপনি দেখছেন, এক বছরের মধ্যে ঢাকা শহরে একটি ফ্ল্যাট কিনবেন। কোথায় দেখলেন? মনে মনে। কিন্তু কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, ভাই, মনটা কী? পরিষ্কার উত্তর পাওয়া যাবে না।

তবে একটা কথা বোধহয় বলা যায়। আমি আপনি প্রত্যেকে একান্ত গোপনে যার সাথে কথা বলি, সে-ই হচ্ছে আমার মন। সেই কথা কখনো অতীত নিয়ে বলি, কখনো ভবিষ্যৎ নিয়ে বলি, কখনো ইচ্ছা নিয়ে বলি। কিন্তু সে-কথা একদম আমার ব্যক্তিগত। এই একান্ত সত্তাই আমার মন। অন্য কারোরই ক্ষমতা নেই তার সাথে যোগাযোগ করার।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, একজন সাধারণ মানুষ–যার বিশেষ চর্চা বা দক্ষতা নেই–সে কোনো একটি বিষয়ে আট সেকেন্ডের বেশি মনকে স্থির রাখতে পারে না। আর এই সদাচঞ্চল মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যেই মেডিটেশন প্রয়োজন। এ কারণেই বলা হয়, আপনি যখন উপাসনালয়ে ঢুকবেন তখন জুতাটা যেভাবে বাইরে রেখে যান, সেভাবে আপনার দেহটাকেও বাইরে রেখে যান। শুধু মনটা নিয়ে প্রবেশ করুন। সারাজীবন ধরে আমাদের এই সাধনাই চলে।

'মন' না হয় একরকম বুঝলাম। কিন্তু আত্মা কী? আমি বিষয়টাকে এভাবে দেখি, মন যদি কোনো পুকুর হয় কিংবা একটি সমুদ্র হয়, তাহলে তার গভীরতর প্রদেশ হচ্ছে আত্মা। ডুব দিয়ে ওখানে যেতে পারব কিনা আমরা কেউই জানি না। কিন্তু আমার বোঝার সুবিধার জন্যে আমি এভাবে চিন্তা করে নিই যে, মনের চেতনার গভীরতম সত্তা–যেটা আমার সাথেও কথা বলে না–সেটাই আত্মা। একে জীবনভর খুঁজতে চাই আমরা অনেকভাবে।

তাহলে একটি জিনিস আমরা বুঝতে পারি। শরীর বা সামাজিক অবস্থা যেমন দৃশ্যমান, মন এবং আত্মা তেমনভাবে দৃশ্যমান নয়। মন কিছুটা নিজের কাছে, কিছুটা অন্যের কাছে দেখা দেয়। কিন্তু চর্চার ফলে আত্মা নিজের কাছে মাঝে মাঝে দেখা দিলেও অন্যের কাছে একেবারেই নয়।

এ কথাগুলো বলার কারণ হলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার থেকে আমরা ঢাকা শহরের

দুটি বস্তিতে বয়স্ক মানুষদের জন্যে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা প্রশমন সেবা দেয়ার কাজ শুরু করেছি। বেশ কয়েকজন ডাক্তার, নার্স এবং স্বেচ্ছাসেবক এই কাজের সাথে জড়িত আছেন।

আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, বস্তির যে প্রবীণ মানুষটি আমাদের রোগী তাকে পুরোপুরি জানার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ তার মানসিক অবস্থা ও আত্মার অবস্থা জানার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের টিমের অনেকেই তখন বললেন, রোগীর অবস্থা পুরোপুরি জানা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার এবং বস্তির ক্ষেত্রে এটি আরো অসম্ভব।

'বস্তিতে এটি জানা সম্ভব নয়' এই কথাটা যখন বার বার বলা হতে লাগল, আমি বিষয়টার আরো গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। সবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, বস্তিতে যাওয়া সম্ভব। যাওয়া উচিত এবং যেতে হবে। আমি সবাইকে পরিষ্কারভাবে বললাম, যদি আমরা সেই জায়গায় পৌঁছাতে চাই, তাহলে এই কাজটির মধ্যে যারা আনন্দ খুঁজে পাবেন, শুধু তারাই যেন এই দলে থাকেন। যারা এই কাজে আনন্দ পাবেন না, তারা অনুগ্রহ করে যেন টিম ছেড়ে দেন।

এখন প্রশ্ন হলো, আনন্দ কী। কোথায় আপনি আনন্দ খুঁজে পাবেন। এটা কি চমৎকার রসগোল্লা খাওয়ার আনন্দ, পাঁচতারা হোটেলে লাঞ্চ করার আনন্দ, কিংবা ইংল্যান্ডের বিখ্যাত হ্যারডস-এর দোকানে শপিং করার আনন্দ? নাকি অন্য কোনো আনন্দ? আসলে এ এক অন্যরকম আনন্দ।

এ আনন্দ কোথায় হয়? গান্ধীজী বলেছিলেন, 'আমি যখন নিজের জন্যে খাদ্য খুঁজি, এটা বস্তুবাদ। আমি যখন অন্যের জন্যে খাদ্য খুঁজি, সেটা আধ্যাত্মিকতা।' কেন আপনি অন্যের জন্যে খাদ্য খুঁজবেন? কেন অভুক্ত একজন মানুষকে একবেলা খেতে দিলে আপনি যে প্রশান্তি পান সেটা নিজে পাঁচতারা হোটেলে খেয়ে পান না? এ আনন্দ হয় ওই মন এবং তার পাশে আত্মা–যার অবস্থান আমি জানি না এবং যে আমার অদৃশ্য বন্ধু, যার সাথে অনবরত আমি কথা বলি–তার আনন্দ হয়।

মনোযোগ দিয়ে কাজ করলে আমি এই আনন্দ খুঁজে পাব। মনকে যদি কাজের সাথে যোগ না করি, তাহলে মনোযোগ হয় না। শুধুই কাজ করা হয়। যারা ধর্মচর্চা করেন তারা জানেন একাগ্র মনোযোগ দিয়ে প্রার্থনা করার আনন্দ একবার পেলে বার বার মনে হয় সারাজীবন পেলাম না কেন?

যারা একবার মনোযোগ দিয়ে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, তারা ভাবেন– আহা, প্রতি ওয়াক্ত যদি এভাবে পড়তে পারতাম! যারা পূজা করেন, তারাও

হয়তো একবার একাগ্রচিত্তে করা পূজায় যে আনন্দ পান তা প্রতিবারের পূজায় খুঁজে ফেরেন। তখনই বোধহয় সেই গানটির কথাগুলো উপলব্ধিতে আসে– *মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না?*

কাজ করলে আবার সার্থকতার প্রসঙ্গটিও আসে। শেষপর্যন্ত সার্থকতা কাকে বলে? এটি আসলে কী? সার্থকতার সংজ্ঞা আমার জানা নেই। তবে নিজের মতো করে বুঝি, মৃত্যুর সময় আমাকে যদি তিন সেকেন্ড সময় দেয়া হয় এবং কোনোরকম অনুতাপ না হয়, যদি মনে হয় যে, 'ঠিক আছে এবার আমি যেতে পারি'–এ কথাটি বলতে পারাটাই সার্থকতা। আর যদি মনে হয় যে, 'না আমি যাব না', তাহলে ওখানে আর সার্থকতা থাকে না। জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়।

আমি নিজেকে সার্থক বলে মনে করি না। আমি একটি ছোট্ট কাজের সাথে জড়িত। নিরাময়-অযোগ্য সে-সব রোগী যারা আর ভালো হবেন না, তাদের অন্তিম সেবা-শুশ্রূষার কাজটি করে আমি আনন্দ পাই। যেদিন মনে হবে সার্থক হয়ে গেছি, সেদিন মনে করতে হবে আমি আসলে মরে গেছি।

কারণ, তৃপ্ত হওয়া আর মৃত্যুবরণ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমি আরো একশ বছর এই কাজটি করতে চাই। তবে আমি এরকম সার্থক হতে চাই–আজ রাতে যদি ডাক আসে আমি যেন 'ঠিক আছে এবার আমি যেতে পারি' বলে চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকতে পারি।



বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩০০ ব্যাচে অংশ নেন।

ভালো করুন ভালো পাবেন

অধ্যাপক ডা. আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী

একজন রোগী আমাকে কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তার সাহেব, আমি কি মারা যাব?' হেসে বললাম, 'মারা তো যাবেনই, আপনি আমি সবাই মারা যাব। তবে আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা যা দেখছি তাতে রোগে ভুগে খুব তাড়াতাড়ি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করি না'। তিনি হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। মনে হলো যেন তার বুক থেকে একটা ভারী পাথর নেমে গেল।

আসলে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে রোগীকে কাউন্সেলিং করাটা চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রোগীর সাথে কথা বলা, একটু স্পর্শ, কপালে হাত বুলিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা–এ ব্যাপারগুলো তাকে অনেক বেশি আশ্বস্ত করে। স্বস্তি দেয়। আস্থা যোগায়। রোগী প্রকৃতই অনুভব করেন যে, আমি যথাযথ যত্ন ও মমতা পাচ্ছি। প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় আমরা রোগীকে ওষুধ দিচ্ছি বটে, কিন্তু এই যত্নের অংশটুকু দিচ্ছি না।

রোগীর মনে সুস্থ হওয়ার বিশ্বাস জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দায়িত্বটা হলো আমাদের চিকিৎসকদের। কারণ ডাক্তার যদি রোগীর মনে এই বিশ্বাসটা স্থাপন করতে না পারেন যে, তিনি সুস্থ হবেন, তাহলে তিনি আসলেই সুস্থ হবেন না। কিন্তু এই দায়িত্বটুকুই আমরা কেউ কেউ সবচেয়ে বেশি অবহেলা করি।

প্রায়শই এমনও দেখা যায়, ডাক্তার সাহেব রোগীর দিকে না তাকিয়েই প্রেসক্রিপশন লিখে যাচ্ছেন, সামনে যে একটা জলজ্যান্ত মানুষ বসে আছেন–সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। অধিকাংশ সময় ডাক্তাররা শুধু রোগের চিকিৎসা করেন, রোগের উৎসটুকু খুঁজে দেখেন না।

অথচ শুধু রোগের নয়, চিকিৎসা হওয়া উচিত পুরো মানুষটার। যেমন, উচ্চ রক্তচাপ কিংবা ডায়াবেটিসের রোগী এলে আমরা হয়তো তখনকার মতো ওষুধ দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করি। কিন্তু যথাযথ কাউন্সেলিং না করার ফলে রোগী স্বভাবতই তার পুরনো জীবনধারায় ফিরে যান। ফলে কিছুদিন পর আবার অসুস্থ হন এবং একই সমস্যা নিয়ে পুনরায় তাকে আসতে হয় ডাক্তারের কাছে। তাই চিকিৎসার ক্ষেত্রে কাউন্সেলিংয়ের কোনো বিকল্প নেই।

আমি আমার রোগীদের যে প্রেসক্রিপশন-ফোল্ডারটি দেই তাতে একটি কথা লেখা থাকে–Patients cure themselves, Doctors show the way. তাদের বলি, শরীরটা আপনার, সুস্থ থাকার প্রাথমিক দায়িত্বও তাই আপনার, ডাক্তারের নয়। এ দায়িত্বটা আপনি নিলে অসুস্থ হবেন কম, হলেও তুলনামূলক দ্রুত সেরে উঠবেন।

আরো বলি, স্রষ্টা আমাদের শরীরে বিস্ময়কর সব ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। আমরা বুঝি না বলেই তা ব্যবহার করতে পারি না। সচেতনভাবে এই শক্তিকে কাজে লাগান। আমি ওষুধ ও পরামর্শ দিয়ে আপনাকে সাহায্য করব আর আপনার শরীরের নিজস্ব নিরাময় প্রক্রিয়া আপনাকে সুস্থ করে তুলবে। কারণ ভালো থাকার ক্ষমতা আপনার মধ্যেই রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ডা. ডীন অরনিশ মূলত দেহ-মনের এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করেই দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, ব্যায়াম ও টেনশনমুক্ত জীবনযাপন পদ্ধতির মাধ্যমে করোনারি হৃদরোগীদের সুস্থ করে তুলেছেন। আর দেহ-মনের ওপর এই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মেডিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে যা খুব সহজ ও কার্যকর উপায়ে অংশগ্রহণকারীরা আয়ত্ত করতে পারেন।

কোর্সে গুরুজীর একটা কথা আমার খুব ভালো লেগেছে, সেটা হলো, সুস্থতা স্বাভাবিক আর অসুস্থতা অস্বাভাবিক। আমিও আমার রোগীদের বলি, রোগী হবেন না। কারণ 'রোগী' হওয়াটা মনের একটি নেতিবাচক অবস্থা। কেউ কেউ রোগী হয়ে থাকতেই পছন্দ করেন। এটা তাদের এক ধরনের দুঃখবিলাস। তারা আসলে শোকরগোজার নন।

অন্যদিকে আবার অনেকে আছেন–যিনি নানান অসুখ নিয়েও দিব্যি সব

কাজকর্ম করে যাচ্ছেন। তার কথা হলো, হাঁ আমি ওষুধ খাই, তাতে কী? আমি রোগী নই। অর্থাৎ তিনি রোগী হয়ে থাকতে রাজি নন। কোয়ান্টামে এসে মানুষ মূলত এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিটাই খুঁজে পায়। উপলব্ধি করে শুকরিয়ার গুরুত্ব। আর শোকরগোজার থাকাটা আসলে সার্বিক মনোদৈহিক সুস্থতার জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজন।

আর এ বিষয়গুলো জানা ও উপলব্ধির জন্যে আমার অনেক রোগীকে আমি কোয়ান্টাম কোর্সে অংশ নেয়ার পরামর্শ দেই। কারণ, রোগীকে একটি সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়াও সুচিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমেই তাকে সর্বোত্তম সেবা দেয়া সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে আমার একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের কথা মনে পড়ে। তিনি বলতেন, 'টাকার পেছনে ছুটো না, তুমি রোগ ভালো করো, টাকা তোমার পেছনে ছুটবে। তোমার রোগীদের মধ্যে যিনি ফিস দেবেন আর যিনি দিতে পারবেন না, দুজনের মধ্যে কখনো পার্থক্য কোরো না। রোগী যদি এক পয়সাও দিতে না পারেন, তাহলে তোমার টাকা দিয়ে তাকে ওষুধ কিনে দাও, এর প্রতিদান দেবেন স্রষ্টা'। আমিও তা-ই বিশ্বাস করি।

আগেকার দিনে চিকিৎসাব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না। চিকিৎসকরাও রোগীদের জন্যে তেমন কিছু করতে পারতেন না। কিন্তু তারা রোগীর হাত ধরে পাশে বসে থাকতেন। রোগী ভাবত 'আমার ডাক্তার'। আমি খুব ভাগ্যবান যে, আমার রোগীরাও আমাকে তা-ই মনে করে। আমার ওপর তাদের বিশ্বাস অগাধ। কারণ, আমার প্রথম উদ্দেশ্যই থাকে তাদের সেবা দেয়া। এটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে আমি আমার পেশা ও কাজকে ভালবাসি বলে।

আমি মনে করি, রোগীদেরকে সুস্থ করার যে জ্ঞান আমি অর্জন করেছি, তা স্রষ্টার পক্ষ থেকে একটি নেয়ামত। একে যদি আমি সাধ্যমতো মানুষের কল্যাণে ব্যবহার না করি তবে একদিন আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। তাই চেষ্টা করি রোগীদের প্রতি আমার মনোযোগ ও প্রচেষ্টার যেন ত্রুটি না হয়।

বিদেশ থেকে রোগীরা প্রচুর পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করে আসেন। ফিরে এসে বলেন, ওখানকার ডাক্তারদের ব্যবহার খুব ভালো। কিন্তু বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করে যে তিনি এ ব্যবহারটা নিয়ে এসেছেন, তা বলেন না। কেন? কারণ, তাতেও তার কোনো দুঃখ নেই। তো, এই ব্যবহারটাই কেন আমরা করতে পারি না? রোগীর সাথে ডাক্তারদের আচরণ নিয়ে নানা কথা সমাজে প্রচলিত। অনেক ডাক্তার বলেন, আমরা কেন ভালো ব্যবহার করব,

আমি তো কোথাও গিয়ে ভালো ব্যবহার পাই না। এক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিভঙ্গি একটু অন্যরকম–কাউকে না কাউকে তো শুরু করতে হবে। আপনিই করুন না। আপনিও ভালো ব্যবহার পাবেন। আমার জীবনে আমি এর অসংখ্য প্রমাণ পেয়েছি।

আমরা প্রতিনিয়ত একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠি। কিন্তু আমি আমার ছাত্রদের বলি, তুমি প্রতিযোগিতা করবে তোমার নিজের সাথে, প্রতিদিনের 'আমি'র সাথে। গতকালের 'আমি'-র চেয়ে আজকের 'আমি' কতটা এগোলাম। কতটা শিখলাম। কতটুকু অর্জন করলাম। আর লক্ষ্যটা স্পষ্ট রাখবে–কোথায় পৌঁছতে চাই। শুধু বিশ্বাস করতে হবে যে, আমি পারব। আর শুরু করতে হবে, কারণ শুরু না করলে এগোনো যায় না।

কোয়ান্টাম কোর্সে এসব ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে–একজন মানুষ কীভাবে শুরু করবেন এবং ক্রম-উৎকর্ষতার মধ্য দিয়ে সাফল্যকে ধরে রাখবেন। আর একটা ব্যাপার খুব ভালো লেগেছে, তা হলো–সঙ্ঘায়ন। আসলে একা বেশিদিন ভালো থাকা যায় না, ভালোকে অনেকদূর এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন সবার সমবেত ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা।



বিশিষ্ট মানসিক ও স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. জহির উদ্দিন আহমাদ। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৬৬ ব্যাচে অংশ নেন। কোর্সের প্রত্যয়ন ও পরবর্তীতে সাপ্তাহিক আলোকায়ন কার্যক্রমে তিনি এ বক্তব্য দেন।

নিরাময়ের জন্যে মেডিকেশন ও মেডিটেশন দুটোই প্রয়োজন

অধ্যাপক ডা. জহির উদ্দিন আহমাদ

মানুষের সংঘাতময় জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে বিভিন্ন রকম সমস্যা। এই সমস্যা যখনই আসে তখন সে হতাশ হয়ে পড়ে, বিষণ্নতায় ভোগে। এর ফলে কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় এবং এ সমস্যাগুলো কাটানোর জন্যে মানুষ ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার সাহেবরা বিভিন্ন রকম পরীক্ষানিরীক্ষা করেন, অধিকাংশ সময় কিছুই পান না।

তার কারণ, এটা তো অর্গানিক নয়। এটা হচ্ছে ফাংকশনাল। ফাংকশনাল আর অর্গানিক দুটো আলাদা জিনিস। শরীরে জ্বালাপোড়া, বুকের ভেতর ধড়ফড়ানি, হাত-পায়ে শক্তি না পাওয়া–বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরকম সমস্যাগুলো ফাংকশনাল প্রবলেম।

একবার এরকম এক রোগী এলেন আমার কাছে। সাথে আনা ল্যাব রিপোর্টের ফাইল দেখিয়ে তিনি বললেন, স্যার, এর মধ্যে সাড়ে সাত লাখ টাকার টেস্ট রিপোর্ট আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, সাড়ে সাত লাখ টাকার টেস্ট করেছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন যে, বাংলাদেশের সব ডাক্তারের কাছে

গিয়েছি। সিটি স্ক্যান থেকে এমআরআই পর্যন্ত এমন কোনো টেস্ট বাদ নেই, যা তারা করেন নি। কিন্তু রোগ ধরতে পারেন নি।

তার সমস্যা ছিল, তিনি সবসময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন, সামান্য আওয়াজে চমকে ওঠেন, ভয় পেয়ে যান এবং আশঙ্কায় থাকেন, যে-কোনো মুহূর্তে হার্ট ফেল করে তিনি মারা যাবেন। তাকে বললাম, এগুলোর জন্যে তো এত টেস্টের দরকার পড়ে না। আপনার যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে নিজেকে স্থির করা, মেডিটেশন করা এবং হালকা কিছু ঔষধ।

পরদিন সকালে আমি যখন রাউন্ডে যাই তখন তিনি বিছানা থেকে নেমে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বললেন, স্যার আমি এই প্রথম শান্তি পেলাম, মনে হলো এই প্রথম সুস্থ হলাম।

এরকম প্রচুর রোগী আমার কাছে আসেন। তাদেরকে আমরা যদি কিছু ইতিবাচক ধারণা দেই, জীবনে চলার ইতিবাচক দিকগুলো শিখিয়ে দেই, তাহলে কিন্তু এমনিতেই রোগী ভালো হয়ে যায়। রোগীর অসুস্থতার মূল কারণ আমরা যদি চিহ্নিত করতে না পারি, তাহলে কিন্তু সমস্যা চলতেই থাকবে বৃত্তের মতো। আমার আজকে মাথাব্যথার সমস্যা, পরদিন অন্য কোথাও সমস্যা অর্থাৎ এর কোনো শেষ নেই। তাই সমস্যাকে সঠিকভাবে শনাক্ত করতে হবে।

আমাদের শরীরে কতগুলো আয়ন আছে। কিছু হচ্ছে পজিটিভ আয়ন, কিছু আছে নেগেটিভ আয়নস। পজিটিভ আয়নের মধ্যে রয়েছে সোডিয়াম, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন। আর নেগেটিভ আয়নের মধ্যে রয়েছে বায়ো-কার্বোনেট, ক্লোরাইড ইত্যাদি। যখন পজিটিভ আয়ন বাড়বে তখন শরীরের মধ্যে একটা ফূর্তিভাব আসবে। এটা বাড়বে যদি আপনি শারীরিক ব্যায়াম করেন। সুতরাং ব্যায়াম হচ্ছে আবশ্যিক।

আবার যখন মানুষ বিষণ্ন হয়ে যায়, তখন তার শরীরে নেগেটিভ আয়নের সংখ্যা বেড়ে যায় অর্থাৎ আমি পারব না, আমার দ্বারা হবে না বা আমি ব্যর্থ– এরকম নেতিবাচক চিন্তা তার ভেতরে কাজ করে। এখান থেকেই মানুষের বিষণ্নতা ও হতাশা তৈরি হয়। এখন এই নেতিবাচক চিন্তাগুলো যদি আমরা বের করে দিতে পারি, তাহলে ইতিবাচক চিন্তা চলে আসবে।

কিন্তু ইতিবাচক চিন্তা আসবে কোথা থেকে? মানুষের ব্রেন অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা করে। ব্রেনের কয়েকটা ভাগ আছে। এগুলোকে বলে লোব। এই প্রত্যেকটা লোবের বিভিন্ন রকম কাজ রয়েছে এবং এগুলোর সমন্বয় করাই হচ্ছে আসল কাজ। অর্থাৎ আমি যে চিন্তাটা করব তা মেমোরিতে

সংরক্ষিত হবে। সেই স্মৃতিকে যখন আমি কাজে লাগাব সেটা হবে অভিজ্ঞতা। যেমন : একটা ছোট বাচ্চা। সে আগুন কী, পানি কী বোঝে না। সে হয়তো আগুনের মধ্যে হাত দিয়ে দিতে পারে, এতে তার হাতটা পুড়ে যাবে। এরপর থেকে আগুনের মতো কোনো রং দেখলে সে কাছে যাবে না, ভয় পেয়ে যাবে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতাটা তার মেমোরিতে রয়ে গেছে।

তাই যে জিনিস চিন্তা করলে আমার হাত-পা কুঁকড়ে আসে, সে-সব না ভেবে আমি নিজেকে ইতিবাচক ধারণা ও চিন্তার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী করে তুলতে পারি। এবং নিজেকে শক্তিশালী করে তোলার জন্যে খুব ভালো উপায় হচ্ছে মেডিটেশন। আমি যদি এই মনটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে শক্তি জাগ্রত হবে। মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের চিন্তাটাকে জাগ্রত করতে পারি। এজন্যে আমি আমার প্রেসক্রিপশনে গুরুজীর *আত্মনির্মাণ* বইটা লিখে দেই পড়ার জন্যে। কারণ এই বইয়ের প্রতিটি পাতায় ইতিবাচকতার সূত্র দেয়া রয়েছে। এই বইটা পড়ে আজ পর্যন্ত কেউ বলে নি যে, তার ভালো লাগে নি।

আর নেতিবাচক চিন্তা আসলে তখনই হয় যখন চিত্তে দোদুল্যমানতা থাকে। আমি করব কি করব না–এটা ভাবার কোনো সুযোগ নেই। আসল বিষয়টি হচ্ছে, আমাকে এটা করতে হবে–এটাই ইতিবাচক। ইতিবাচক চিন্তার অধিকারী হতে চাইলে আমাদের মেডিটেশন করতে হবে। এটা সবার জন্যে প্রযোজ্য। এর কোনো বয়স লাগে না, এর কোনো স্থানকালপাত্র নেই। আপনি বিছানায় বসে করতে পারেন, ফ্লোরে করতে পারেন, চেয়ারে বসে করতে পারেন, কিংবা আপনি কাজের ফাঁকে এটা করতে পারেন।

আমার কাছে অনেকে আসেন যে, পেশাগত ক্ষেত্রে তাদের বসের সাথে বনিবনা হয় না। আমি তখন বলি, আপনি যদি রি-একটিভ হন তাহলে সমস্যা আরো বেশি হবে। আর আপনি যদি প্রো-একটিভ হন তাহলে কিন্তু সমস্যা হবে না। সুতরাং আপনি প্রো-একটিভ হোন। আপনি যখন তার কথা হাসিমুখে শুনবেন, মেনে নেবেন; দেখা যাবে তার দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তন হয়ে গেছে। কারণ একজন ভালো শ্রোতাই অন্যকে বেশি প্রভাবিত করতে পারে।

আমাদের দেশে অনেক ধরনের সমস্যা আছে। যেমন, ট্রাফিক জ্যাম। ১০ মিনিটের রাস্তা পেরোতে দুই ঘন্টা পার হয়ে যায়। উত্তেজিত না হয়ে একে অন্যভাবে দেখা যেতে পারে। আমার প্রথম বিদেশ সফর ছিল নাইজেরিয়ায়। সেখানে লাগোসে ছিল অনেক বেশি ট্রাফিক জ্যাম। যে-কোনো জায়গায় যেতে দুই/ তিন ঘন্টা লাগত। আমি ওদের একজনকে বললাম,

এতে আমার কাজ-কর্মে সমস্যা হচ্ছে। তিনি বললেন, একে উপভোগ করো। আমি বললাম, এখানে তো উপভোগ করার কিছু নেই। নাইজেরিয়ান ভদ্রলোক বললেন, চাইলে জ্যামও উপভোগ করা যায়। একসময় খেয়াল করে দেখলাম, যে জায়গায় গাড়ি থেমে থাকছে সেখানে বাজারের মতো হয়ে গেছে। টেলিভিশন থেকে আরম্ভ করে স্বর্ণালংকার ক্রোকারিজ কেনাবেচা চলছে। নাইজেরিয়ান ভদ্রলোকটি বললেন, এখানে আপনি শপিং-হাঁটাহাঁটি ও আরো অনেক কিছুই করতে পারেন। আমি বললাম বাহ! ব্যাপারটা তো খুব চমৎকার হয়েছে।

তো, এভাবে আমরা সবসময় নেতিবাচক দিক না দেখে যদি ইতিবাচক দিকগুলো দেখি, তাহলে আমরা সত্যিই ভালো কিছু করতে পারব। তাই আমাদেরকে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। আর দৃষ্টিভঙ্গি বদলালে আমাদের জীবনও বদলে যাবে। এসব ব্যাপারে সচেতন করার জন্যে আমার অনেক রোগীদের আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের কথা বলি। কারণ একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি জানি, শুধু ওষুধে কাজ হয় না। তাই রোগমুক্তি ও নিরাময়ের জন্যে মেডিকেশন ও মেডিটেশন দুটোই প্রয়োজন। মেডিটেশন একজন মানুষের বিশ্বাসকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

আমার অনেক সহকর্মী খুব অবাক হয়ে বলেন, রোগীদের কোয়ান্টামে পাঠালে তারা তো আর চিকিৎসা করাতে আসবে না। আমি বলি, তাতে কী? আমি তো মানুষের উপকার করার জন্যে কাজ করছি। একজন মানুষও যদি আমার পরামর্শে মেডিটেশন করে সুস্থ হয়, ভালো থাকে, এটাই তো আমার জন্যে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

কোয়ান্টাম মেথডের সবচেয়ে ভালো দিকটি হলো, এটা যে-কেউ খুব সহজেই চর্চা করতে পারে। মেডিটেশনের শুরুতেই যে দমচর্চা করতে হয় তা সুস্থতার জন্যে অত্যন্ত সহায়ক। আমার পরামর্শে অনেকে কোর্স করে ভালো আছেন। তারা পরে এসে বলেন, 'আমার আর ঘুমের ওষুধ খেতে হয় না, আমি এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি'। অনেকে বলেন, 'খুব বদরাগী ছিলাম, এখন সবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে পারি'।

এখানে এসে আমি নিজেও অনেক নতুন কিছু শিখেছি। মনে হচ্ছে, আমার ভেতরেও আত্মবিশ্বাস যেন আবার নতুন করে জেগে উঠল।



বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজের (বারডেম) অধ্যাপক ডা. সাহিদা আখতার। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৫৩ ব্যাচে অংশ নেন। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাপ্তাহিক আলোকায়ন কার্যক্রমে তিনি এ বক্তব্য দেন।

বর্তমান পরিবেশই আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে

অধ্যাপক ডা. সাহিদা আখতার

শিশুরা আসলে বড়দের দেখেই শেখে। আমরা সবাই কমবেশি জানি এবং বুঝি বিষয়টা। কেবল মানুষের বেলায় নয়, জীবজন্তুর বেলায়ও এটি প্রযোজ্য।

এরকম ঘটনা তো আমরা অহরহই দেখি যে, একজন শিশু তার বাবা-মাকে অনুকরণ করে একইভাবে নামাজের অঙ্গভঙ্গি করছে, ব্যায়াম করছে কিংবা কোনো বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করছে বা হাসছে ইত্যাদি। তার মানে কী? একটি শিশুর সামনে আমরা যা যা করি সে সবকিছু দেখে, লক্ষ করে। তারপর নিজেই সেটা করার চেষ্টা করে। এগুলো দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায় সবারই আছে।

আমরা যত যা-কিছু করি, সেটা হোক ভালো বা মন্দ, সবকিছুর স্মৃতিই আমাদের ডিএনএ রেকর্ড করে রাখে। শুধু তা-ই নয়, প্রজন্মান্তরে এটি প্রবাহিত হয় তার বংশধরদের মাঝে। এটা জেনে কিংবা ধারণা করেই হয়তো আগেকার দিনে গুরুজনেরা ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে অনেক খোঁজখবর করত। বাবা, দাদা, তার দাদা কে কোথায় ছিল, কী করত–সব উদ্ধার করা

হতো। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা এখন বুঝতে পারি যে, এসব ধারণার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, একটি শিশুর অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা, দক্ষতা কোনদিকে বাড়বে না বাড়বে সেটা নির্ভর করে ওর চারপাশে যারা আছে তাদের ওপর। তাদের সচেতনতার ওপর। চারপাশ থেকে ওর বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধু, দাদা-দাদী, নানা-নানী সবার অংশগ্রহণে একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে ওঠে। শিশু যদি দেখে যে, তার বাবা-মা সবসময় ভালো কাজ করেন, নামাজ পড়েন, অন্যায় করেন না, মিথ্যা বলেন না, ঘুষ খান না, নির্যাতন করেন না তাহলে সেই জিনিসগুলোই ওর মধ্যে প্রবেশ করবে, ওকে প্রভাবিত করবে। তার মানসিক গঠনটা সেভাবেই গড়ে উঠবে।

আবার যদি সে দেখে যে, তার বাবা-মা এ কাজগুলো করে তবে সে তা-ও বুঝবে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে হলেও সে জানতে পারবে যে, কিছু একটা অসংগতি আছে। আজ না হয় তার বয়স কম বলে সে কিছু বলতে পারছে না, কিন্তু বড় হলে ঠিকই সে প্রশ্ন করবে। একসময় সে চ্যালেঞ্জ করবে যে, তুমি এ কাজটা কেন করো? এটা তো উচিত নয়।

আবার এটাও হতে পারে যে, সে-ও ঠিক ঐ কাজটিই করবে। বাবা-মাকে অনুসরণ করে তাদের মতোই অন্যায় করবে। অর্থাৎ পরিবেশ এখানে একটা বড় ভূমিকা পালন করছে।

শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে 'আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। ইউনিসেফ-এর সংজ্ঞা অনুসারে, এর সময় হচ্ছে আট বছর বয়স পর্যন্ত। একজন শিশু আট বছর বয়স পর্যন্ত খুব রিসিপটিভ থাকে। অর্থাৎ এ-সময়টাতে সে যে-কোনো কিছু খুব দ্রুত আয়ত্ত করতে সক্ষম। যা-ই সে দেখবে ও শুনবে সাথে সাথে নিয়ে নেয় নিজের ভেতর। এটা তিন বছর বয়স পর্যন্ত খুব বেশি থাকে, তারপর পাঁচ বছর এবং এরপর আট বছর বয়স পর্যন্ত। এরপর আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এ-সময়টা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একবার চলে গেলে আর পাওয়া যাবে না।

একটা শিশু যখন জন্ম নেয়, তার মস্তিষ্ক কিন্তু অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখে। সম্ভাব্য সবকিছু করার, সবকিছু হওয়ার। তাহলে কেন অধিকাংশই তা পারে না? কারণ তাকে ঠিক সময়মতো ঠিক শিক্ষাটা আমরা দেই না। একটা শিশু ভবিষ্যতে বড় হয়ে কী হবে, এটা নির্ভর করে তাকে ছোটবেলা থেকে আমি কী পরিবেশ দিয়েছি, কী বিশ্বাস দিয়েছি, কী আস্থা দিয়েছি, চারপাশে কী চর্চা করেছি–তার ওপর।

আর মস্তিষ্কের ব্যাপারটা হচ্ছে এমন যে, জন্মের সময় যে-সংখ্যক নিউরোন নিয়ে সে জন্ম নেয়–সেগুলোকে ব্যবহার না করলে, কাজে না লাগালে, চর্চা না করলে তা নষ্ট হয়ে যাবে। আর চর্চা করলে তা ক্রমাগত আরো শাণিত হয়ে উঠবে। অর্থাৎ ইউজ ইট অর লুজ ইট। ব্যবহার করো অথবা হারিয়ে ফেলো।

মস্তিষ্ককে যদি আমরা ব্যবহার করি সেটা আরো বিচক্ষণ হতে থাকবে, না হলে পরবর্তীতে সে কাজটি করা অনেক কষ্টকর হয়ে যাবে। ছোটবেলায় আমি গান শিখি নি। এখন আমি চেষ্টা করলে আর ওরকম পারব না–ছোটবেলায় শিখলে যা পারতাম।

যে-কোনো দক্ষতা যদি আমরা শিশুর মধ্যে দিতে চাই, সেটা আমাকে ওই সময়ে শুরু করতে হবে। কারণ, আমরা সবাই আসলে আমাদের পরিবেশেরই ফলাফল। আজ আমি ডাক্তার, কারণ আমার পরিবেশটা ছিল আমাকে ডাক্তার হিসেবে তৈরি করার। যখন থেকে আমি স্মরণ করতে পারি, আমি জানতাম যে আমি ডাক্তার হবো। কারণ আমার বাবা সবসময় বলতেন, ও ডাক্তার হবে। সেটাই একসময় আমার বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। আমি অন্য কিছু কখনো চেষ্টাও করি নি এবং খুব আশ্চর্য হয়ে এখন চিন্তা করি যে, ভূগোল পৌরনীতি সমাজপাঠ এসব কখনোই আমার ভালো লাগে নি। অন্যদিকে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো আমার সবসময়ই ভালো লেগেছে। এটা কেন হলো?

এখন মনে হয়, ওই যে ব্রেন-এ একবার প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে গেছে যে, ডাক্তার হতে হবে এবং সমাজপাঠ পৌরনীতি এসব প্রয়োজন নেই ডাক্তারি পড়ার জন্যে, তাই বোধহয় ওগুলো পড়তে কষ্ট লাগত আমার। অনেক কষ্টে পাশ করেছি সে-সব বিষয়ে। আর ব্রেনকে এই প্রোগ্রাম দিয়ে দিয়েছিলেন আমার বাবা। তিনি আমাকে সবসময় উৎসাহিত করতেন। কখনো কোনো নেতিবাচক কথা তার কাছ থেকে শুনি নি।

এসব বাস্তব কারণ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে, আমরা সবাই আমাদের শৈশব-পরিবেশ দিয়ে দারুণভাবে প্রভাবিত হই। পরিবেশ আমাদের যেভাবে লালন করেছে, আমরা সেভাবেই গড়ে উঠেছি। সেভাবেই বেড়ে উঠেছি। এখন আমরা নিজেরাই কিন্তু সেই পরিবেশ তৈরি করতে পারি, যদি আমরা সচেতন হই।

কারণ, আমাদের শিশুরা কীরকম পরিবেশে বড় হবে, কীভাবে তৈরি হবে, সেটা এখন আমাদের দায়িত্ব। আমাদের সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে–যাকে যেভাবে তৈরি করতে চাই। আবার ওদের ক্ষমতাও দেখতে হবে।

এটাও ঠিক–সবারই সব ক্ষমতা আছে কিন্তু একেকজনের একেক দিকে খুব আগ্রহ থাকে, সে তা-ই করতে চায়, সেটাই ভালোভাবে করতে পারে। আমরা যদি তাকে সেটাতে উৎসাহিত করতে পারি তাহলে কাজটা আরো অনেক ভালো হয়।

আমার জীবনেরই একটা ঘটনা বলি। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় আমার মনে হতো পেশাজীবনে আমি একজন সার্জন হব। কিন্তু আমার স্থানীয় অভিভাবক যিনি ছিলেন তিনি আমার থার্ড ইয়ার থেকেই সবাইকে বলতে লাগলেন যে, আমি পেডিয়াট্রিশিয়ান হবো। শেষপর্যন্ত আমি তা-ই হলাম।

এখন তাকে আমি কথাপ্রসঙ্গে বলি, মামা, আপনি আমাকে কোনোদিন জিজ্ঞেস করেন নি যে, আমি কী হতে চাই? পেডিয়াট্রিকস-এ প্রথম একটু কষ্ট লেগেছে কিন্তু এখন আবার মজা পাচ্ছি। ভালো লাগছে। তো, এভাবেই হয়তো জীবনের ধারাটা পাল্টে যায়। কিন্তু শিশুদেরকেও জিজ্ঞেস করা উচিত তার কী পছন্দ? তার কোনটা ভালো লাগে? যদি সেটাকে আমরা উৎসাহিত করি তাতেও সে অনেক ভালো করবে। এখানেই পরিবেশের ভূমিকা।

তাই এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ওই পরিবেশ তৈরি করা। আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, আপনার সন্তান একজন ভালো দেশপ্রেমিক হবে, রাজনীতিবিদ হবে, কবি হবে কিংবা ডাক্তার হবে তাহলে আপনি ওর সাথে সেভাবে উৎসাহিত করেই ওর সাথে কথা বলবেন। সে-সব আচরণ করবেন, যা ওকে সেভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। সেই পরিবেশ তাকে দেবেন।

কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, আমার ছেলে/ মেয়েটার মাথা ভালো না, ও যে কী করবে জীবনে! ও-তো কিছুই করে খেতে পারবে না। আপনার সন্তানের ব্রেন কিন্তু এই মেসেজটাই নিয়ে নেবে। আপনার ব্রেনও তা-ই করবে এবং আপনাকে দিয়ে সে-সব কাজই করাবে, যাতে ও কিছু করে খেতে না পারে।

তাই আমার অনুরোধ থাকবে যে, আপনারা যারা বাবা-মা-অভিভাবক আছেন, আপনারা আল্লাহর ওপরে বিশ্বাস রাখুন, নিজের ওপরে আস্থা রাখুন এবং শিশুদেরকে বিশ্বাস করুন। শিশুদের সাথে সবসময় ইতিবাচক কথা বলুন। তাকে যেভাবে গড়ে তুলতে চান কিংবা তার ভেতরে সুপ্ত সম্ভাবনার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটানোর মতো সেই পরিবেশ সৃষ্টি করুন।



বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও খুলনাস্থ ফরটিস এসকর্ট হার্ট ইনস্টিটিউটের চিফ কনসালটেন্ট ডা. হাসনাইন নান্না। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩২৯ ব্যাচে তিনি অংশ নেন।

মেডিটেশন করুন আপনার হৃৎপিণ্ড সুস্থ থাকবে

ডা. হাসনাইন নান্না

বছর কয়েক আগের ঘটনা। আমার কাছে একজন রোগী এলেন। হাসপাতালে ভর্তি করা হলো তাকে। রোগীর সাথে ছিলেন একজন এটেনডেন্ট। ঘটনাচক্রে সেই এটেনডেন্টের সাথে আমার আলাপ হলো। ধীরে ধীরে সে বলতে শুরু করল নিজের বিচিত্র জীবনকাহিনী।

কয়েক বছর আগেও সে ছিল দুর্ধর্ষ এক সন্ত্রাসী গ্রুপের সক্রিয় সদস্য। হেন কোনো দুষ্কর্ম নেই যা সে করে নি, এর মধ্যে গোটাকয় খুনের ঘটনাও আছে। এমন কোনো নেশা নেই, যাতে সে আসক্ত ছিল না।

এভাবেই চলছিল। হঠাৎ তার মায়ের স্ট্রোক করল। প্যারালাইসিস-এ শয্যাশায়ী মায়ের সেবাশুশ্রূষার দায়িত্ব নিল ছেলে নিজেই। মূলত তখন থেকেই তার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেল।

কিন্তু দীর্ঘদিনের বেপরোয়া জীবনযাপনের পরিণতিতে একসময় ছেলে নিজেই আক্রান্ত হলো। হার্ট অ্যাটাক হলো তার। বয়স তখন মোটে ৩১। এনজিওগ্রাম করে দেখা গেল, তিনটা আর্টারিতে ব্লকেজ। স্টেন্টিং বা রিং লাগানোর পরামর্শ দিলেন ডাক্তাররা। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। সে সামর্থ্য তখন তার ছিল না।

মায়ের অসুস্থতা ও সেবাশুশ্রূষা আর নিজের হার্ট অ্যাটাক–পর পর ঘটে যাওয়া এ দুটো ঘটনা তাকে পুরোপুরি বদলে দিল। অন্ধকার জীবনের পাট চুকিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলো সে। তারপর থেকে সে নিজের এলাকাতেই একটা মেডিকেল সেন্টারে কাজ করে। সেখানে আসা লোকজনদের যতটুকু পারে সাহায্য করার চেষ্টা করে। এছাড়াও তার সামগ্রিক জীবনযাপন এখন বেশ নিয়মনিষ্ঠ। সন্ত্রাসী জীবনের দুঃসহ আতঙ্ক দুশ্চিন্তা আর স্ট্রেসও তাকে এখন দিনের পর দিন তাড়িয়ে বেড়ায় না। সবমিলিয়ে সে এখন আর দশজন মানুষের মতোই সুস্থ স্বাভাবিক এক মানুষ।

রোগীর এটেনডেন্টের এই নাটকীয় জীবনকাহিনী শুনে খুব কৌতূহল হলো। চার বছর আগে তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, তারপর এখন কতদূর কী অবস্থা সেটি দেখার জন্যে তার কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যবস্থা করলাম। ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাম, ইটিটি ইত্যাদি।

রিপোর্ট দেখে অবাক হতে হলো। তার হার্ট বেশ ভালোই আছে। হার্টের রক্তপ্রবাহ ও সংকোচন-প্রসারণের হার, হৃদযন্ত্রের গতি–সবমিলিয়ে তার হার্টের অবস্থা পূর্ণ সুস্থ একজন মানুষের মতোই! তার যে একসময় হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, তা-ও বোঝার কোনো উপায় নেই। ঘটনাটি শুনতে একটু বিস্ময়কর মনে হলেও, এটি অসম্ভব কিছু নয়, এটাই বরং হওয়া উচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখন এ বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা চলছে।

গবেষকরা এখন বলছেন, করোনারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন যিনি, স্টেন্টিং বা বাইপাস, যা-ই করা হোক না কেন, সুস্থতার দেখা পেতে হলে তাকে তার জীবনযাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। কারণ, স্টেন্টিং বা বাইপাস হৃদরোগ নিরাময়ে কোনো স্থায়ী সমাধান নয়।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা চিকিৎসকরা এ ব্যাপারে রোগীদের যথাযথভাবে সচেতন করি না বা করা হয় না। ফলে রোগীরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এসব চিকিৎসা নেন বটে, কিন্তু কিছুদিন পর আবার আগের জীবনে ফিরে যান এবং পুনরায় সমস্যা নিয়ে কার্ডিওলজিস্টের দ্বারস্থ হন। অথচ তিনি যদি বিষয়গুলো জানতেন, সচেতন হতেন এবং সেইমতো জীবনযাপন করতেন তবে বার বার এই রোগচক্রের মধ্যে তাকে ঘুরপাক খেতে হতো না।

আমরা যদি দেখি, হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনিতে কোলেস্টেরল বা চর্বি জমা অর্থাৎ এথেরোস্ক্লেরোসিস একটি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। কিন্তু সবাই তো আর করোনারি হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন না।

এ রোগের কয়েকটি ঝুঁকিপূর্ণ কারণ রয়েছে। এর মধ্যে যেমন কিছু অপ্রতিরোধ্য ঝুঁকি রয়েছে, তেমনি রয়েছে কিছু প্রতিরোধযোগ্য বা পরিবর্তন করা যায় এমন ঝুঁকি, যেমন : আপনি যদি ধূমপায়ী হয়ে থাকেন, তবে এ অভ্যাস বর্জন করুন। আপনার যদি উচ্চ রক্তচাপ কিংবা ডায়াবেটিস থাকে, তবে এগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আর যদি এ রোগগুলো আপনার না থাকে তবে প্রতিরোধের ব্যাপারে সচেতন হোন।

এছাড়াও আপনি যদি নিষ্ক্রিয় ও অলস জীবনযাপনে অভ্যস্ত হন, তবে নিয়মিত হাঁটা ও ব্যায়ামকে আপনার দৈনন্দিন রুটিনে পরিণত করুন। আপনার খাদ্যাভ্যাস যদি হয় অতিরিক্ত তেল-চর্বিজাত ও কোলেস্টেরলযুক্ত, তবে সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। আপনার জীবনে যদি স্ট্রেস থাকে, তবে তা থেকে নিজেকে মুক্ত করুন, কারণ ক্রমাগত স্ট্রেসের ফলে আপনার শরীরে এড্রিনালিন ও অন্যান্য স্ট্রেস হরমোনের নিঃসরণ বাড়ে, যা হৃদরোগসহ আরো অনেক রোগের অন্যতম কারণ।

রোগীদের আমি বলি, আপনি যখন আপনার দৈনন্দিন জীবনাচারে কিছু ছোট ছোট বিষয় অনুসরণ করে হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে পারেন, তবে কেন সেটি করবেন না? বিশ্বজুড়েই চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এখন প্রতিরোধের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন। আমাদের দেশেও এখন তা-ই হচ্ছে।

একটা সময় ডায়াবেটিস হাসপাতালের স্লোগান ছিল–ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন। এখন বলা হচ্ছে, ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করুন। হৃদরোগের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। কেন আপনি হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া অবধি অপেক্ষা করবেন যে, হৃদরোগ হলে তারপর তখন সবকিছু মেনে চলব। কেন আজ থেকেই নয়?

এ-তো গেল প্রতিরোধের কথা হৃদরোগ নিরাময়ের জন্যেও এই সুস্থ জীবনযাপনের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। করোনারি হৃদরোগ মুক্তির স্থায়ী সমাধানও মূলত এটাই। খোদ কার্ডিওলজির টেক্সট বইতেই বলা হয়েছে, মনকে প্রশান্ত রাখার জন্যে মেডিটেশন ও অন্যান্য সুস্থ জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে করোনারি ধমনিতে এথেরোরিগ্রেশন ঘটে অর্থাৎ ধমনীতে জমে থাকা কোলেস্টেরল চূর্ণবিচূর্ণ হতে শুরু করে। (Hurst's : The Heart, 12th edition, page-2468)

হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার জন্যেই শুধু নয়, বরং সার্বিক মনোদৈহিক সুস্থতার জন্যেই মেডিটেশন একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। এ ব্যাপারে হৃদরোগীদের সামনে প্রথম আশার আলো দেখান মার্কিন চিকিৎসাবিজ্ঞানী

ডা. ডীন অরনিশ। তার *প্রোগ্রাম ফর রিভার্সিং হার্ট ডিজিজ* বইটির এক জায়গায় তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'হাজার বছর আগে সাধুসন্তরা কি শুধুই নিজেদের হার্ট অ্যাটাক থেকে বাঁচানোর জন্যে মেডিটেশন চর্চা করতেন? না, ব্যাপারটি সে-রকম নয়। হৃৎপিণ্ড সুস্থ থাকার বিষয়টি মেডিটেশনের একটি বাই-প্রোডাক্ট, কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্যটি হলো, মানুষকে একটি স্ট্রেসমুক্ত, সুস্থ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের পথে পরিচালিত করা।'

প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় এ বিষয়গুলো সম্বন্ধে রোগীকে যত বেশি সচেতন করে তোলা হবে, রোগীরা তত উপকৃত হবেন। তাদের রোগযন্ত্রণা ও ভোগান্তির পরিমাণ অনেকখানি কমে আসবে।

আর এ কাজটিই চমৎকারভাবে একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে করছে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব। এর উদ্যোগে কিছুদিন আগে আয়োজিত একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনারে আমি অংশ নিয়েছি। সেখানে হার্ট ক্লাবের সদস্যরা আমাকে বলেছেন, হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের পুরো বিষয়টি সম্পর্কে তারা এখানে এসে আদ্যোপান্ত সচেতন হয়ে উঠেছেন। এবং পায়ে পায়ে সুস্থ জীবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।



জাতিসত্তার কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। একুশে পদকে ভূষিত এই কবি ও কথাসাহিত্যিক কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ১৫৬ ব্যাচে সস্ত্রীক অংশ নিয়েছেন।

অন্তর্গত শক্তির সন্ধান দেয় কোয়ান্টাম মেথড

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা

'আমার একটা কবিতার বই আছে–*আদিষ্ট হয়েছি আমি দীর্ঘ জাগরণে*। বইটা আমি লিখেছিলাম বহু বছর আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একটি ভবিষ্যদ্বাণীকে উপজীব্য করে। সে-সময় তারা বলেছিলেন, ২০০০ সালে নতুন শতাব্দীতে প্রবেশের সন্ধিক্ষণে সৌরজগতে একটা বিশাল বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন গ্রহ এবং মহাকাশের অন্যান্য বস্তুর পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন তারা।

সে-সময় আমি সত্যিই খুব ভীত হয়ে পড়ি। আমার মনে হতে থাকে–কী করে এ দুর্যোগ ঠেকানো যায়। হঠাৎ মনে হলো, একে ঠেকানো সম্ভব যদি গ্রহ বা মহাকাশপিণ্ডের মতো আপাতদৃষ্টে এই জড় বস্তুগুলোরও মন আছে বলে স্বীকার করে নিই এবং সেই মনকে জাগিয়ে তুলতে পারি।

আমি সবসময়ই বিশ্বাস করতাম–জীবের মতো জড়বস্তুরও একটা মন্ময় সত্তা আছে, যে মনের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব, কথা বলা সম্ভব। তাই আমার মনে হলো, মহাবিশ্বের এই বস্তুকণাগুলোকে যদি জাগিয়ে তুলতে পারি এই উদ্দীপনায় যে, তারা সংঘর্ষে জড়াবে না, যদি তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ঘটাতে পারি, তাহলেই বোধহয় এই বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব।

বিষয়টিকে প্রথমে একটু অদ্ভুত মনে হলেও আমি উপলব্ধি করলাম, অন্যদের মনকে জাগ্রত করতে হলে আগে জাগ্রত করতে হবে আমার মন। আমি তখন কবিতায় লিখলাম–*আমি এ বিশ্বসৃষ্টি/ এ বিশ্ব আমার সৃষ্টি/ আমি আমাকেই চাই/ আমার বিনাশ নাই।*

এই পংক্তিগুলোর মধ্য দিয়ে আমি যেন আমার ভেতরের ইতিবাচকতাকেই জাগিয়ে তুলতে চাইলাম। যা-ই হোক, একসময় কোনো অঘটন ছাড়াই সংঘর্ষের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই দুঃসময় পেরিয়ে গেল।'

কথাগুলো বলছিলেন সমকালীন বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ১৫৬ ব্যাচে সস্ত্রীক অংশগ্রহণ করেন।

তার ভাষায়, 'কোয়ান্টাম মেথড বইটার কিছুটা পড়েই বুঝতে পেরেছিলাম, এই-ই সেই জিনিস যার খোঁজে আমি ছিলাম। সে সময় আমার ব্যক্তিগত জীবন এবং পেশাগত জীবনের কিছু বিপর্যয়ের কারণে আমার ভেতরে কিছুটা অস্থিরতা কাজ করছিল। ভাবলাম, সমাধান হোক না হোক, কিছু সাজেশন তো পাব। আমার স্ত্রীকেও সাথে নিলাম। কারণ মাইগ্রেন, স্পন্ডিলাইটিস, সাইনুসাইটিসের বহুমুখী আক্রমণে তিনি বেশ ভুগছিলেন।'

কোর্সে অংশ নেয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেন, 'মেডিটেশন বা আত্ম-উপলব্ধির মতো এত ব্যাপক একটি বিষয়কে দারুণ একটা শৃঙ্খলা, একটা পদ্ধতির ভেতরে নিয়ে আসার কঠিন কাজটাই এতে করা হয়েছে। যার ফলে এটা হয়ে উঠেছে অনেক সহজবোধ্য এবং গ্রহণযোগ্য।'

আলাপচারিতার শুরুতে যে উপলব্ধির কথা কবি নূরুল হুদা বলছিলেন তার রেশ ধরেই বললেন, 'আমি আগাগোড়াই বিশ্বাস করতাম যে, করা যায় না এমন কিছুই নেই। হয়তো আমি পারব না, কিন্তু আরেকজন নিশ্চয়ই পারবে। আইনস্টাইন যা পেরেছেন, আমার পক্ষে হয়তো তা সম্ভব নয়। আবার আমিও এমন কিছু করতে পারি, যা অন্যে পারে না। তাই আমি সবসময় ভাবি–আমি পারি, আমি পারব। কোয়ান্টামে এসে দেখলাম, এখানকার বাণীও তা-ই, যা আমার বিশ্বাসকে আরো পুষ্ট করেছে। আরও বাড়িয়ে দিয়েছে আমার সামগ্রিক ইতিবাচকতাকে।'

মুহম্মদ নূরুল হুদা ঐতিহ্য, পুরাণ আর লোকজ ঐশ্বর্যভাণ্ডার থেকে আহৃত সম্পদের সাথে বিরল দক্ষতায় সম্মিলন ঘটিয়েছেন আধুনিক মননের রূপবৈচিত্র্যের। তাই তো তিনি পরিচিত জাতিসত্তার কবি হিসেবে। হাজার বছরের চিরায়ত বাংলা কবিতার সমৃদ্ধ ধারার সঙ্গে কবি যুক্ত করেছেন নিজস্ব

রীতি ও বাক্‌ভঙ্গিমা। তার কবিতা বাংলা ভাষার কবিতা হয়েও চিরকালীন আবহ আর আন্তর্জাতিক চেতনায় ঋদ্ধ।

কথাসাহিত্য, মননশীল প্রবন্ধ ও অনুবাদসহ সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তিনি বিচরণশীল। তার স্বরচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। তার প্রিয় ক্ষেত্র কবিতা, নন্দনতত্ত্ব ও লোকবিদ্যা।

১৯৯৬ সালে নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে তিনি যোগদান করেন। তিনি জাতীয় পর্যায়ে নজরুলজন্মশত বার্ষিকী উদযাপন কমিটির সদস্যসচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় তার সম্পাদনায় নজরুলের কবিতার ইংরেজি অনুবাদসহ নজরুলের ওপর মৌলিক তিনটি বই প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে Nazrul's Aesthetes & Other Aspects একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ।

সৃষ্টিশীলতার বহুমুখী ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কারসহ তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহু সম্মাননা এবং পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তার কবিতা অনূদিত হয়েছে একাধিক ভাষায়। তিনি সফর করেছেন বিশ্বের নানা প্রান্ত। ১৯৯৭ সালে তুরস্কের রাষ্ট্রপ্রতি সুলেমান ডেমিরেল কর্তৃক বিশেষ রাষ্ট্রীয় সম্মানেও ভূষিত হন তিনি।

বিভিন্নরকম কাজের খুঁটিনাটি নিয়ে সারাদিনই ব্যস্ত সময় কাটে কবি নূরুল হুদার। কখনো কখনো হয়তো এই ব্যস্ততা তার আত্মমগ্নতাকেও বিঘ্নিত করে। কিন্তু ক্লান্তি বা অস্থিরতার সে সময়গুলোতে মেডিটেশনই কবি হুদার পরম বন্ধু।

গভীর মেডিটেশনে তৃপ্তিকর এক মানস ভ্রমণের মধ্য দিয়ে কয়েক মিনিটেই তিনি আবার নিজেকে ফিরে পান একজন সজীব, কর্মমুখর মানুষ হিসেবে। কোর্সে শেখা শুধু প্রাণায়াম বা দমের চর্চাও কেউ যদি নিয়মিত করে তবে তার পক্ষে অক্লান্ত কাজ করা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।

তিনি বলেন, একটি জটিল হিসেব হাতে করতে যদি একযুগ লাগে, কম্পিউটার যেমন সেটিকে পাঁচ মিনিটে করে ফেলে, ধ্যান বা আত্মমগ্নতাও মানুষের জীবনকে ঠিক তেমনিভাবে অর্থবহ ও কর্মক্ষম করে তুলতে পারে।

তবে এই আত্মমগ্নতা বা আত্মশক্তি জাগ্রত করার কথা তত্ত্বে যত ভালোভাবে আছে, বাস্তবে ঠিক ততটাই অনুপস্থিত। সভ্যতার ইতিহাসে এটিকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা কেউ ভাবেন নি। আমার মনে হয়েছে, কোয়ান্টামে এই প্রতিষ্ঠিত করার বাস্তব প্রক্রিয়াটাই শেখানো হয়েছে।

অমর একুশে বইমেলা, ২০১২-এ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত একটি

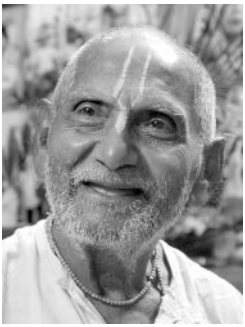
বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মেলার নজরুল মঞ্চে উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে কবি নূরুল হুদা বলেন, কোয়ান্টাম হচ্ছে গতিবাদ, এমন গতিবাদ যা মানুষকে আমূল বদলে দিতে পারে। যদি কেউ নিজেকে বদলে ফেলতে চান তবে কোয়ান্টামে যান। কোয়ান্টাম এমন একটি বিষয়, যা মানুষকে তার ভেতরের শক্তির সন্ধান দেয়। একজন মানুষ যে কত অতল অসীম শক্তিধর তা যদি বুঝতে চান, তবে আমি তাকে কোয়ান্টামে যেতে বলব। মুহূর্তে যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসতে চান তবে কোয়ান্টামে যান।

তিনি সেদিন আরো বলেন, কোয়ান্টাম হচ্ছে আপনার স্ব-চিকিৎসা। আপনার ভেতর না-বোধক যা-কিছু আছে তাকে যদি হাঁ-বোধকে পরিণত করতে চান তবে কোয়ান্টামে যান। বাংলাদেশকে যদি পাল্টে ফেলতে চান তবে গুরুজীর তত্ত্বের কাছে যান। আমি তাকে 'মহাজাতক' বলি না, তাকে আমি 'গুরুজী' বলি।

স্ত্রী সাঈদা হুদার কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোর্সে এসে তার স্পন্ডিলাইটিসের ব্যথা একেবারে চলে গেছে। এমনকি সবসময়ই কলার গার্ড ব্যবহারে অভ্যস্ত তিনি কোর্সের তৃতীয় দিন সেটা আনতেই যে ভুলে গেছেন, তা-ও মনে করিয়ে দিতে হয়েছে। এছাড়াও তার মাথাব্যথা ছিল যা অনেক চিকিৎসার পরও নিরাময় হচ্ছিল না, মেডিটেশন করে সেটাও ভালো হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, এ জাতির মাথাব্যথাও থাকবে না যদি আমরা সবাই কোয়ান্টাম মেথডে যাই। তাই কোয়ান্টামে যান, নিজেকে এক অনন্য ও নতুন মানুষে পরিণত করুন।

বাংলা একাডেমীর পরিচালক থাকাকালীন শত ব্যস্ততার মাঝেও বান্দরবান লামার কোয়ান্টামম সফরে গিয়েছিলেন কবি নূরুল হুদা। তিনি বলেন, আমার জীবনের সবচেয়ে গভীরতম উপলব্ধির একটি ঘটেছে এই লামা যাত্রায়। আগে কক্সবাজার সী-বিচ ছিল আমার মনের বাড়ি। এখন লামা, এই নতুন বাড়িতে এখন আমি মানস ভ্রমণ করি। অশান্ত সামাজিক পরিস্থিতিতে আমার ভরসা ও ভারসাম্যের নিবাস এখন লামা।

ধ্যান আর সাধনার জগতে সিদ্ধপুরুষ শিবানন্দ বাবা। জীবনের সূচনালগ্নেই দেখেছেন দারিদ্র্যের নির্মম বাস্তব রূপ। চার বছর বয়সে বৈষ্ণব গুরু ওঙ্কারানন্দের সান্নিধ্যে আসেন এবং ১১ বছর বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শুরু হয় নিজেকে জানা আর স্রষ্টাকে জানার পথে এক নিরন্তর যাত্রা। গুরু প্রসন্নতা লাভই ঈশ্বর লাভের প্রথম সোপান–এ কথাটিকে সত্য জেনে গুরুর নির্দেশে তিনি ৩৪ বছর ভ্রমণ করেন বিশ্বের নানা দেশ। সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ উপলব্ধি আর মানবতার সেবাকে গ্রহণ করেন ব্রত হিসেবে। অতি সাধারণ জীবনযাপন আর আধুনিক মননের এক অনন্য সমন্বয় ১২০ বছর বয়সী সাধক শিবানন্দ বাবা। আমরা এই মহাত্মার আরো দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।



শিবানন্দ বাবা ॥
এক স্রষ্টার উপাসনা আর সৃষ্টির কল্যাণ করাই যার মূলমন্ত্র

আমাদের প্রত্যেকের জীবন স্রষ্টার ইচ্ছানুসারেই পরিচালিত হয়। আর এ কারণেই আমার সাধনার জীবন বেছে নেয়া। কারণ আমি মনে করি, এখানেই আমাকে প্রয়োজন। ১৯ ডিসেম্বর ২০১৪ শান্তিনগরস্থ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে এ কথাগুলো বলেন সাধক শিবানন্দ বাবা।

শিবানন্দ বাবার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য স্রষ্টার সন্তুষ্টি আর জগতের কল্যাণ। জন্মেছেন ১৮৯৬ সালের ৮ আগস্ট তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শ্রীহট্ট জেলার (বর্তমান সিলেট) হবিগঞ্জ মহকুমার বাহুবল থানার হরিপুর গ্রামে, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে।

তার বাবার নাম শ্রীনাথ গোস্বামী এবং মা ভগবতী দেবী। বাবা-মা আর দিদি মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে যা পেতেন তা-ই দিয়ে হতো খাবারের যোগান। তবে কোনোদিনই পেট ভরে খাওয়ার কথা মনে পড়ে না বাবা শিবানন্দের। শৈশবের প্রতিমুহূর্তেই উপলব্ধি করেছেন ক্ষুধার নির্মম জ্বালা।

১৯০১ সালে মাত্র চার বছর বয়সে তার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে মা-বাবা তাকে নবদ্বীপের এক বৈষ্ণব গুরু ওঙ্কারানন্দ গোস্বামীর হাতে অর্পণ করেন। ১৯০৩ সালে তিনি মা-বাবাকে দেখতে শ্রীহট্ট

আসেন এবং জানতে পারেন, তার ছোটবেলার খেলার সাথি দিদি অনাহারে মারা গেছে। কয়েকদিন পর অনাহার-অর্ধাহারজনিত অপুষ্টি আর বিনা চিকিৎসায় তার মা-বাবাও ইহলোক ত্যাগ করেন একই দিনে।

দাহক্রিয়ার সময় তিনি মা-বাবার মুখাগ্নি করেন নি। যে মা-বাবা তাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন, তাদের মুখে অগ্নিস্পর্শ করার বেদনা তার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তোলে। প্রচলিত মুখাগ্নি প্রথা অস্বীকার করে তিনি মা-বাবার চরণে আগুন দেন।

এরপর তিনি ফিরে যান গুরু ওঙ্কারানন্দের আশ্রমে এবং ১৯০৭ সালে গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরুর নির্দেশে ১৯২৫ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ৩৪ বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন বাবা শিবানন্দ। এর মধ্যে ফ্রান্স, গ্রিস, জাপান অন্যতম।

১৯৫৯ সালে তার গুরু ওঙ্কারানন্দের মৃত্যু হলে বাবা শিবানন্দ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আর্ত-পীড়িত মানুষের সেবায় বেরিয়ে পড়েন। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। এরপর তিনি কাশী চলে যান এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন।

চিরতারুণ্যে ভরপুর শিবানন্দ বাবার দিন শুরু হয় ভোর তিনটায়। জপ, যোগব্যায়াম, প্রাণায়াম, সবার মঙ্গলকামনা, দান, সেবা তার প্রতিদিনের কাজের অংশ। রাত ন'টায় তিনি ঘুমাতে যান। সেদ্ধ শাকসবজি আর সামান্য ভাতই বাবার মূল খাদ্য।

দরিদ্ররা যা খেতে পায় না, সে খাবার তিনি খান না। তাই মিষ্টি, দুধ ও দুধজাত খাবার, ফলমূল এবং তেলেভাজা ঝাল-মশলা খাবার তার খাদ্যতালিকায় কখনোই ঠাঁই পায় না। দিনে কমপক্ষে চার লিটার পানি পান করেন তিনি। সাধারণ সাদা মার্কিন কাপড়ই হলো তার বসন।

সম্পূর্ণ সুস্থ এবং নীরোগ দেহের এই সাধক মানুষটি অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করেন। তিনি বলেন, 'আমার কখনোই মনে হয় না যে, আমার বয়স ১১৯ বছর। আমার জীবন সুস্বাস্থ্য এবং সদানন্দে ভরপুর।' এ কথার প্রতিফলন দেখা যায় তার স্বচ্ছন্দ-সাবলীল হাঁটাচলায়। তাকে দেখে যে-কেউ ধারণা করবে যে, তার বয়স বড়জোর ৭০-৭৫ হবে।

শিবানন্দ বাবা কর্মব্যস্ত থাকতে ভালবাসেন। শুধু ব্যক্তিজীবনেই নয়, তার কর্মব্যস্ততার নজির মেলে জীবনের নানা ক্ষেত্রে। এমনকি ২০১৪ সালে ভারতের বালিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম উদ্বোধনীর দিনে বাবা শিবানন্দকে দেখা যায় নিজ হাতে ঝাড়ু দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করতে।

বাবা শিবানন্দ বলেন, 'আমার জীবনে কোনো রোগ নেই, কামনা নেই, বাসনা নেই, দুঃখ নেই, চিন্তা নেই, সমস্যা নেই।' কারো কাছ থেকেই নিজের জন্যে কোনো অর্থ অনুদান বা দক্ষিণা নেন না।

এ প্রসঙ্গে তার অভিমত, 'সবাই তো ভিক্ষুক। প্রত্যেকেরই শুধু চাই আর চাই। তাদের কাছ থেকে আমার কী নেয়ার আছে?'

মুক্তচিন্তার অধিকারী বাবা শিবানন্দকে কেউ তার ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি অকপটে বলেন, 'এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার ঘর। এর মানুষেরাই আমার মাতাপিতা। মানুষকে ভালবাসা ও তাদের সেবা করাই আমার ধর্ম।'

তার এই মুক্তমন তাকে করেছে অনন্যসাধারণ। তিনি মনে করেন, সংস্কারের বেসাতি নয়; বরং কল্যাণকর চিন্তা আর কাজকে উৎসাহিত করাই প্রতিটি ধর্মের মূল শিক্ষা। তাই তো শিবানন্দ বাবা প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে ১৯ বার 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' বলেন। তারপর তিনি নারায়ণ মন্ত্র জপ করেন।

কোয়ান্টামের প্রতি শিবানন্দ বাবার স্নেহার্দ্র অনুভূতির অন্যতম কারণ– ধর্মবর্ণনির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের কল্যাণে কাজ করছে কোয়ান্টাম। এর আগে ২০০৭ সালে শিবানন্দ বাবা এসেছিলেন কোয়ান্টামের কার্যালয়ে।

তার একজন ভক্তশিষ্য জানালেন, এবার ঢাকায় দেখা হওয়ার পরেই বাবার প্রথম কথা 'আমরা শান্তি আশ্রমে কখন যাব?' পরে সবাই বুঝতে পেরেছেন, তিনি গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতকের সাথে সাক্ষাতের কথা বলছেন এবং কোয়ান্টামের নাম দিয়েছেন 'শান্তি আশ্রম'।

কোয়ান্টামের প্রতি এই অপার মমতার কারণেই ১৯ ডিসেম্বর ২০১৪– ঢাকেশ্বরী মন্দিরে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটানোর পর কোনোরকম বিশ্রাম না নিয়েই চলে আসেন কোয়ান্টামের কার্যালয়ে।

সাধনার জগতে তিনি অতুলনীয় এক ব্যক্তিত্ব। তিন শতাব্দীর সাক্ষী হয়ে আছেন শিবানন্দ বাবা। তিনি মনে করেন, বিশ্বজুড়ে মানুষ আজ শুধু পণ্যের পেছনে ছুটছে। অর্থ উপার্জন আর ভোগের এই প্রতিযোগিতার ফলাফলই হলো মানুষের রোগগ্রস্ততা। এমনকি প্রকৃতির ভারসাম্য যে ক্ষয়িষ্ণু রূপ পেয়েছে, তার মূলেও রয়েছে মানুষের সীমাহীন লোভ আর লালসা।

এ প্রসঙ্গে শিবানন্দ বাবা বলেন, 'যে ব্যক্তি বাক্যের বেগ, মনের শক্তি, ক্রোধ, ক্ষুধা ও লোভ সংবরণ করতে পারেন, তিনিই স্রষ্টার সন্ধান লাভ করেন। স্রষ্টাকে প্রসন্ন করতে হলে দান এবং ধ্যান অবশ্যই করতে হবে।'

ভারতের বারাণসী কবির নগরে শিবানন্দ বাবার আশ্রম সব মানুষের জন্যে

উন্মুক্ত। ২০১৩ সালে *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*-র সেপ্টেম্বর ৭ সংখ্যায় এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি কখনো আমার অনুসারীদের কোনো বিশেষ দেবদেবীর উপাসনা করতে বলি না। আসলে আমার বয়সের তুলনায় আমার শিক্ষা অনেক আধুনিক এবং দার্শনিক চিন্তাধারার। আমি আমার অনুসারীদের বলি এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করতে এবং সহজসরল জীবনযাপন করতে, যে জীবনে থাকবে সৃষ্টির জন্যে ভালবাসা আর মমতা।'

'I never ask my followers to worship certain Gods and Goddesses. In fact, my teachings are very contemporary and philosophical in contrast to my age. I tell them to believe in one God and lead a life of simplicity, love and compassion'

-- *Baba Shivananda.*

আমরা তাদের স্মরণ করি

জীবনে আমি হবো
লাখো মানুষের ভরসাস্থল।
মরণেও তারা হৃদয়ের অশ্রুতে
শেষ বিদায় জানাবে আমাকে।
তারপরও প্রজন্মের পর প্রজন্মের
হৃদয়ে বেঁচে থাকব আমি
তাদের আনন্দে বেদনায়
সংকটে সম্ভাবনায়
প্রেরণার উৎসরূপে।



প্রয়াত চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। দেবতুল্য চিকিৎসক, নির্ভীক সত্যবাদিতা, বহুল প্রশংসিত জাতীয় ওষুধ নীতির প্রণেতা, ধূমপানবিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ, বাংলাদেশে উচ্চতর চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরোধা ব্যক্তিত্ব, দেশের প্রথম বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা– এমন অসংখ্য পরিচয় তাকে আসীন করেছিল এক অনন্য ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় আসনে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি ছিলেন এর একজন আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষী ও অভিভাবক। আমরা তার সামগ্রিক অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম ॥

কর্মময় জীবনের প্রতিচ্ছবি

১৯২৮ সালের ১ এপ্রিল। চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানার মোহাম্মদপুর গ্রামে এক অতি সাধারণ পরিবারে তার জন্ম। বাড়ি বলতে ছিল একটা মাটির ঘর। বাবা সৈয়দুর রহমান ছিলেন স্কুল শিক্ষক। চার বছর বয়সে নুরুল ইসলাম বাবাকে হারান। বাবাকে নিয়ে তার স্মৃতি ছিল কেবল একটাই–শেষবারের মতো তিনি বাবার মুখে পানি তুলে দিচ্ছেন। তিন ভাই আর পাঁচ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট।

গ্রামেই কেটেছে নুরুল ইসলামের শৈশব-কৈশোর। বাবার মৃত্যুর পর মা গুলমেহের-এর একান্ত সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠেন তিনি। তার সামগ্রিক জীবনে ও সাফল্যের ধারায় এই মহিয়সী মহিলার প্রভাব অপরিসীম। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মায়ের দোয়া ও শুভকামনা তিনি অনুভব করেছেন বার বার।

বাড়ি থেকে আধমাইল দূরের একটি প্রাইমারি স্কুলে শুরু হয় নুরুল ইসলামের শিক্ষাজীবন। পরে গাছবাড়িয়া নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র ইংলিশ হাই স্কুল থেকে ১৯৪৩ সালে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। তারপর পিতৃতুল্য বড় ভাইয়ের সহযোগিতায় ভর্তি হন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে। সেখান থেকে আইএসসি-তে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হওয়ার। তাই ভর্তি হন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। মেডিকেলের বই কেনা আর কলেজের

হোস্টেলে থাকার আর্থিক সংগতি তার ছিল না। পরে স্যার আদমজীর সাথে দেখা করে মাসিক পঁয়ষট্টি টাকা হারে বৃত্তি লাভ করেন। এতে তার মেডিকেলে পড়াশোনার পথ সুগম হয়। ইন্টার্নশিপসহ ১৯৫১ সালে তিনি গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন।

যখন ডাক্তারি পাশ করলেন ততদিনে দেশভাগ হয়ে গেছে, তাই ঢাকায় ফিরে এলেন। পরদিনই গ্রাম থেকে ভাইয়ের জরুরি টেলিগ্রাম–মা অসুস্থ, বাঁচার আশা নেই। রাতের ট্রেনেই চট্টগ্রাম রওনা দিলেন ডা. নুরুল ইসলাম। সকালে বাড়ি পৌঁছে দেখেন, মা অজ্ঞান। আর চারপাশে বসে সবাই দোয়া-দরুদ পড়ছে। রোগের ইতিহাস শুনে বুঝলেন, এটা টাইফয়েড। যার একমাত্র ওষুধ তখন ছিল ক্লোরোমাইসেটিন। কিন্তু মুখ দিয়ে খাওয়াবেন কী করে, মা যে অজ্ঞান!

অগত্যা এক বুদ্ধি বের করলেন। চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল থেকে রাইল্‌স টিউব ধার করে আনলেন। তারপর ক্যাপসুল ভেঙে দুধের সাথে মিশিয়ে টিউবের মাধ্যমে সেটি রোগীর পেটে প্রবেশ করালেন। সবার আশঙ্কা আর চরম আপত্তির মুখেও, মা-কে সুস্থ করে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ডা. ইসলাম সেদিন দারুণ সাহসিকতায় এ চিকিৎসা দিয়েছিলেন।

একপর্যায়ে মা সুস্থ হয়ে উঠলেন। পেশাগত জীবনের শুরুতেই মৃত্যুপথযাত্রী মা-কে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলা সত্যিই সদ্য পাশ করা একজন চিকিৎসকের জীবনে এক বিরল সৌভাগ্য।

১৯৫২ সালে পিএসসি-তে ইন্টারভিউ দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বক্ষব্যাধি বিভাগে নিয়োগ পান। ১৯৫৪ সালে সরকারি খরচে ইংল্যান্ডে যান এবং লন্ডনের হুইটিংটন হাসপাতালে এমআরসিপি কোর্স শুরু করেন। ১৯৫৫ সালে ওয়েল্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ে টিডিডি কোর্সে যোগ দেন এবং এতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

সে-সময়ে প্রথমবার পরীক্ষা দিয়েই এমআরসিপি পাশ করত মাত্র ১০/১৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। ডা. নুরুল ইসলাম তাদেরই একজন। আর এ আনন্দ তিনি উদযাপন করেছিলেন তৎক্ষণাৎ দেশে পঞ্চাশ পাউন্ড পাঠিয়ে দিয়ে–তার শৈশবের স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগের যন্ত্রপাতি কেনার জন্যে।

১৯৫৬ সালে ডা. নুরুল ইসলাম দেশে ফিরে আসেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তিনিই ছিলেন একমাত্র এমআরসিপি টিডিডি। স্বাভাবিকভাবেই তিনি এসোসিয়েট প্রফেসর এমনকি সরাসরি প্রফেসর পদে মেডিকেল কলেজে যোগ দিতে পারতেন; কিন্তু তার ইচ্ছা ছিল, ধাপে ধাপে সামনের দিকে

এগোবেন। তাই সার্জন জেনারেলের সাথে দেখা করে স্বেচ্ছায় তিনি মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলে মেডিসিন বিভাগে লেকচারার হিসেবে কাজ শুরু করেন।

পরবর্তীতে তিনি ১৯৫৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে মেডিসিন বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর ও ১৯৬২ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তিনিই প্রথম চিকিৎসাবিজ্ঞানে 'নাফিল্ড স্কলারশিপ' পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন ১৯৬৩ সালে। ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দুবছর ইংল্যান্ডে অধ্যাপনা করেন।

পুনরায় দেশে ফিরে ১৯৬৫ সালে প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলাম ঢাকায় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত (১৯৬৪) পোস্ট গ্রাজুয়েট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের যুগ্ম পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৮৭ সালে পরিচালক হিসেবে এ প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর নেয়ার আগে প্রফেসর নুরুল ইসলাম সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নিজের মেধা, মনন ও শ্রম দিয়ে একে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রশংসিত একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ দেন। দুটি টিনশেড ঘরের গণ্ডি থেকে একটি বহুমাত্রিক ও সুবিশাল প্রতিষ্ঠানে (তৎকালীন আইপিজিএমআর, বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) রূপ দেয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ লন্ডনের রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিন থেকে প্রকাশিত সাময়িকীতে ডা. ইসলামকে এর ফাউন্ডিং ফাদার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

কর্মজীবনের শুরু থেকেই ডা. ইসলাম গড়ে তুলেছেন জাতীয় জীবনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী প্রতিষ্ঠান। যক্ষ্মা রোগীদের দুর্ভোগ প্রত্যক্ষ করে ১৯৫৭ সালে কয়েকজন সহৃদয় বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে তিনি একটি সমিতি গঠনে উদ্যোগী হন। এর ফলশ্রুতিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমানকে সভাপতি ও তাকে সাধারণ সম্পাদক করে যে সমিতি গঠিত হয়, তা পরবর্তীতে দেশে যক্ষ্মার প্রকোপ কমানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

জাতীয় ওষুধ নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে তৎকালীন সরকার প্রফেসর নুরুল ইসলামকে চেয়ারম্যান করে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে, তার সুপারিশক্রমে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ওষুধ ও মাদকমিশ্রিত টনিক বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। স্বার্থান্বেষীদের নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ১৯৮২ সালে এ ওষুধ নীতি গৃহীত হয়, দেশে-বিদেশে যা ব্যাপক প্রশংসিত ও আলোচিত হয়েছিল।

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে পাশ্চাত্যে তামাকবিরোধী প্রচারণার সূচনা ঘটে। এর প্রভাবে ডা. ইসলাম শুধু নিজে ধূমপান বর্জন করেই ক্ষান্ত হন নি,

সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে সাথে নিয়ে গড়ে তুলেছেন 'আধূনিক' (আমরা ধূমপান নিবারণ করি), যা দেশে প্রথমবারের মতো ধূমপানবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করে।

ইউএসটিসি (চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের জীবনের অন্যতম কীর্তি। ১৯৮৯ সালে মাত্র ৪২ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে এটি বেসরকারি পর্যায়ে দেশের প্রথমসারির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ছাড়াও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, মেডিকেল কাউন্সিল অব গ্রেট ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড মেডিকেল কাউন্সিল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এটি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।

কর্মীপুরুষ ডা. নুরুল ইসলাম তার অক্লান্ত কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা এবং সেইসাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসংখ্য সম্মাননা ও পুরস্কার।

এর মধ্যে ১৯৬৩ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রেসিডেন্ট'স গোল্ড মেডেল, ১৯৭০-এ ভূষিত হন সিতারা-ই-ইমতিয়াজ পদক, ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্স-এর স্বর্ণপদক, ১৯৮৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্বর্ণপদক, ১৯৮৭ সালে জাতীয় অধ্যাপকের সম্মান, ১৯৯০ সালে আমেরিকান বায়োগ্রাফিক্যাল হেল্‌থ কর্তৃক কমেমোরেটিভ মেডেল অব অনার, একই বছরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র অ্যাওয়ার্ড ফর টোবাকো কন্ট্রোল, ১৯৯৩ সালে ভাসানী স্মৃতি স্বর্ণপদক, ১৯৯৬ সালে স্বাধীনতা পদক, এডিনবার্গ রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস-এর গোল্ড মেডেল এবং ২০০৩ সালে চিকিৎসারত্ন হিসেবে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ডা. বিধান চন্দ্র রায় স্বর্ণপদক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

একজন চিকিৎসক হিসেবে পেশাগত ব্যস্ততার পাশাপাশি চিকিৎসাশিক্ষা ও ওষুধ নীতি নিয়ে গবেষণাও করেছেন জীবনভর। আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রফেসর ডা. ইসলামের শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৩০টি। তার প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে *মেডিকেল ডায়াগনোসিস এন্ড ট্রিটমেন্ট, হিস্ট্রি অব আইপিজিএমআর,* বহুল প্রশংসিত বই *প্রেসক্রিপশন,* আত্মজীবনী *জীবনস্রোতে, কিছু ভাবনা, বঙ্গবন্ধু : ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দৃষ্টিতে* উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও তার জীবনের একটি অন্যতম কীর্তি হলো, সমকালীন নানা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের তিনি ছিলেন আস্থাভাজন চিকিৎসক। ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে

চিকিৎসা দিয়েছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, জননেতা মাওলানা ভাসানী, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখকে।

কোয়ান্টামের জন্মলগ্ন থেকেই বরেণ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. নুরুল ইসলাম ছিলেন এর একজন সত্যিকার অভিভাবক। শুরু থেকেই তিনি কোয়ান্টামকে দিয়েছেন তার আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা আর অকুণ্ঠ সমর্থন। ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি, কোয়ান্টামের যাত্রাশুরুর দিনটিতে, তিনিই প্রথম দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন–'কোয়ান্টাম মেথড আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে এটি যুক্ত হলে রোগ নিরাময় আরো সহজ হবে, ত্বরান্বিত হবে।'

জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সত্যভাষণে অকপট, সততা ও সত্যের পথে অবিচল অধ্যাপক নুরুল ইসলাম কোয়ান্টামের প্রতি সবসময়ই ছিলেন আন্তরিক, মমতাপূর্ণ ও স্নেহার্দ্র। কোয়ান্টামের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সত্যিকার অর্থেই এক স্নেহময় পিতার। যখন সামনে ছিল না কোনো বাস্তব উদাহরণ–সেদিনও তিনি তার দূরপ্রসারী প্রজ্ঞার আলোকে কোয়ান্টাম মেথডের উপযোগিতাকে ব্যাখ্যা করেছেন, দিয়েছেন দৃঢ়চিত্ত সমর্থন।

এরপর জুন ২০১১-এ তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৩১ ব্যাচে অংশ নেন। চার দিনের সার্বিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন, 'আজ থেকে ১৯ বছর আগে কোয়ান্টামের যাত্রা শুরুর দিনটিতে আমি যে কথাটি বলেছিলাম, আজও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলতে চাই– কোয়ান্টাম মেথড আধুনিক চিকিৎসার পরিপূরক। আমরা একে যত সহজে গ্রহণ করতে পারব, এর সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারব আমাদের জীবন তত প্রশান্তিময় হবে এবং রোগমুক্তি হবে সহজ। আমি মনে করি, এটাই আমাদের সবার প্রত্যাশা হওয়া উচিত।'

কোয়ান্টামের বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে তিনি এসেছিলেন, ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেবামূলক কাজের প্রতি জানিয়েছিলেন তার দোয়া ও শুভকামনা।

শুধু তা-ই নয়, কোয়ান্টামের প্রতি ভালবাসার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন তিনি। অশীতিপর বয়সে পাহাড়ি রাস্তার চড়াই-উতরাই পেরিয়ে গিয়েছিলেন লামার কোয়ান্টামম-এ। চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মেডিকেল ক্যাম্পে। ২০১১ সালের ৫ মার্চের সে দিনটিতে তিনি তার নামে নামকরণকৃত কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীদের আবাসন 'নুর হল'-এর নামফলক উন্মোচন করেন।

উল্লেখ্য, ডা. নুরুল ইসলামের সামগ্রিক অবদানের প্রতি সম্মান জানিয়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ২০০১ সালে 'নুর হল' প্রতিষ্ঠা করে।

২৪ জানুয়ারি ২০১৩। এক বর্ণাঢ্য ও কর্মময় জীবন শেষে সেদিন রাতে ঢাকার একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ডা. নুরুল ইসলাম। যাত্রা করেন অনন্ত মহাজাগতিক সফরের পথে। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইল্লাইহে রাজিউন)। জাতি হারাল এক ক্ষণজন্মা কীর্তিমান পুরুষ, কোয়ান্টাম হারাল একজন আজন্ম অভিভাবক ও সক্রিয় শুভানুধ্যায়ী।

অদম্য সেবাব্রতী এই মানুষটি মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন মানবসেবার কাজে একনিষ্ঠ ও অতন্দ্র। ছিলেন জনকল্যাণমূলক একাধিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত।

তার মৃত্যুর পরদিন অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারি পূর্বনির্ধারিত একটি আয়োজনে সারাদেশ থেকে লামার কোয়ান্টামম-এ জড়ো হয়েছিলেন কোয়ান্টাম পরিবারের প্রায় দেড়শত চিকিৎসক। তাদের অংশগ্রহণে সেদিন ওখানে অনুষ্ঠিত হয় একটি সুপরিসর মেডিকেল ক্যাম্প। তাতে চিকিৎসাসেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ পান ২,৯০৫ জন দুস্থ রোগী। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এ ক্যাম্পটি ডা. নুরুল ইসলামের স্মরণে উৎসর্গ করে।

এর আগে চিকিৎসকবৃন্দকে নিয়ে গুরুজী ও কোয়ান্টামম-এর কর্মীরা তার গায়েবানা জানাজায় অংশ নেন। এবং তার আত্মার অনন্ত প্রশান্তি কামনা করে ফাউন্ডেশনের পরবর্তী ৪০ দিনের সকল সৎকর্ম উৎসর্গ করা হয়।

জাতীয় জীবনে অধ্যাপক নুরুল ইসলামের সার্বিক অবদান আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।



প্রয়াত সাংবাদিক নাজিম উদ্দিন মোস্তান। দেশের বিশিষ্ট এই সংবাদ-ব্যক্তিত্ব ও সমাজকর্মী কোয়ান্টাম মেথডের প্রথম ব্যাচে অংশ নেন।

নাজিম উদ্দিন মোস্তান ॥

নির্মোহ ও স্পষ্টভাষী সাংবাদিক

নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিষয় ছিল তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান। বিশিষ্ট লেখক ও কথাশিল্পী আহমদ ছফা সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না, পরদিন তিনি *দৈনিক ইত্তেফাকে* এর ওপর একটি প্রতিবেদন পড়লেন। এবং এতটাই আপ্লুত হলেন যে, তার মনে হলো, বাংলাদেশে এমন সাংবাদিকও আছেন–যিনি বিজ্ঞানের কঠিন তত্ত্ব এমন সহজ ভাষায় লিখতে পারেন!

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ছফার মনে হলো, এমন একজন 'কামেল' মানুষকে এখনই গিয়ে সালাম করে আসা দরকার, নইলে তাকে অপমান করা হবে। ছফা ছুটে গেলেন *ইত্তেফাক* অফিসে। রিপোর্টটি ছিল নাজিম উদ্দিন মোস্তানের করা।

মোস্তান তখন কিছু একটা লিখছিলেন। ছফা তার সামনে গিয়ে সালাম দিলেন, নিতান্তই সাধারণ বেশভূষার মানুষটির চোখের দিকে তাকিয়ে ছফার মনে হলো, এই চোখে আছে অন্যরকম কিছু, যা সচরাচর চোখে পড়ে না।

এমন আকস্মিক পরিচয় থেকে সূচিত হয়েছিল যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব, সেটি অটুট ছিল ছফার আমৃত্যু। আর মোস্তানকে ছফা উৎসর্গ করেছিলেন বাংলা কথাসাহিত্যে তার এক অসাধারণ সৃষ্টি *পুষ্প বৃক্ষ ও বিহঙ্গ পুরাণ* বইটি।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে প্রায় তিন দশক দৈনিক ইত্তেফাকের খ্যাতনামা রিপোর্টার, বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ, *সাপ্তাহিক রাষ্ট্র* পত্রিকার প্রকাশক-সম্পাদক, উদ্যমী সমাজকর্মী–এমনি বহুমুখী পরিচয় তার; কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত নাজিম উদ্দিন মোস্তানের পরিচয় হয়ে ওঠে একটাই–নির্মোহ, স্পষ্টভাষী ও ন্যায়নিষ্ঠ একজন সাংবাদিক।

কর্মজীবনের শুরু থেকেই নাজিম উদ্দিন মোস্তান সাংবাদিকতাকে গ্রহণ করেছিলেন মনেপ্রাণে, সর্বান্তকরণে। সেইসাথে কঠোর পরিশ্রম ও কর্তব্যনিষ্ঠা, গভীর দেশপ্রেম, গণমানুষের কল্যাণচিন্তা, অসাধারণ ক্ষুরধার লেখনী তাকে সাংবাদিকতার জগতে করে তুলেছিল অনন্য, দিয়েছিল এক বিশিষ্ট স্থান। সাংবাদিকতায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে একুশে পদকসহ একাধিক সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি।

নাজিম উদ্দিন মোস্তান ছিলেন একজন আপাদমস্তক সার্বক্ষণিক সাংবাদিক। তার এক সহকর্মী সাংবাদিকের ভাষায়, 'মোস্তান ভাই যখন হাঁটতেন, মনে হতো কোনো সংবাদ সংগ্রহের জন্যে দৌড়ে চলেছেন। যখন রিকশায় চড়তেন, পারতপক্ষে একা চড়তেন না। পয়সা বাঁচানোর জন্যে নয়, বরং সত্যিকারের একজন জাত সাংবাদিক বলেই তিনি এটা করতেন। তার উদ্দেশ্য থাকত একজন অপরিচিত লোকের সাথে পরিচিত হওয়া, তারপর তার পেশা ও কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে জানা। বুঝতে চাইতেন, সেখানে কোনো সমস্যা আছে কিনা; থাকলে এর শেকড় কোথায় এবং সমাধান কীভাবে হতে পারে। এভাবেই তিনি পেয়ে যেতেন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের উৎস।'

একটা সময় দৈনিক ইত্তেফাকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার অসংখ্য সাড়াজাগানো ও আলোচিত রিপোর্ট, যাতে চমৎকার ভাষাশৈলী আর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উঠে এসেছে নানাবিধ সমস্যা ও এর সম্ভাব্য সমাধানের কার্যকর পন্থা এবং সমসাময়িক বিচিত্র বিষয়ের আদ্যোপান্ত।

নাজিম উদ্দিন মোস্তান *ইত্তেফাকে* যোগ দেন ১৯৭৫ সালে। এর মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতা জগতের বৃহত্তর পরিসরে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পান তিনি এবং তার কাজের ধরনেও আসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, যা আমরা জানতে পারি তার নিজের বয়ানেই–

'তখন সবে *ইত্তেফাকে* যোগ দিয়েছি। ডিসেম্বরের ৫ তারিখে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান কভার করতে পাঠানো হলো আমাকে। পত্রিকায় প্রকাশের আগে রিপোর্টটি যথারীতি

তৎকালীন বার্তা সম্পাদক আসাফউদ্দৌলা রেজার কাছে গেল। দূর থেকে দেখলাম, রেজা সাহেব আমার রিপোর্টটিতে চোখ বোলালেন, তারপর পাশে রাখা বাস্কেটে ফেলে দিলেন।

তারপর আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, অনুষ্ঠান কভার করতে কে গিয়েছিল? বললাম, আমি। এবার তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব যখন ওখানে এসেছিলেন তখন তুমি কোথায় ছিলে?

আমি তো হতভম্ব। পুনরায় উনি একই প্রশ্ন করে আমার নোট দেখতে চাইলেন। দৌড়ে গিয়ে নোট নিয়ে এলাম। তিনি দেখলেন। তারপর বললেন, তোমার নোট দেখ, কোনো এক বক্তার বক্তৃতার একপর্যায়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেব জীবন্ত হয়ে উঠেছিলেন, ওটাকেই ইন্ট্রো করো। বুঝতে পারলাম, আমার ইতোপূর্বের বিরস সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা *ইত্তেফাকে* কোনো কাজে আসবে না।'

সেই শুরু। তারপর একের পর এক অসাধারণ সব রিপোর্ট করেছেন তিনি। মূলত অর্থনীতিবিষয়ক রিপোর্টার হলেও, তার তীক্ষ্ণ লেখনীতে উঠে এসেছে সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। বোদ্ধা পাঠকের মতে, চমৎকার সব উপমা ব্যবহার করে সাবলীল ভাষায় দ্রুত রিপোর্ট লেখার এক সহজাত ক্ষমতা ছিল তার। অনেকেই তাকে আখ্যায়িত করেছেন একজন ধ্রুপদী সাংবাদিক হিসেবে।

দেশে কম্পিউটার শিল্প ও প্রযুক্তির বিকাশের লক্ষ্যে প্রথম থেকেই তিনি লিখেছেন সাপ্তাহিক বিজ্ঞান চর্চা, মাসিক কম্পিউটার জগৎ, কম্পিউটার বিচিত্রা ইত্যাদি পত্রিকায়। ১৯৮৭-৮৮ সালে ইত্তেফাকের বিশেষ ক্রোড়পত্রে তিনিই প্রথম কম্পিউটার নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন লেখেন।

১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে কোয়ান্টাম মেথডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও শিথিলায়ন ক্যাসেটের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাজিম উদ্দিন মোস্তান। অনুষ্ঠানের বিস্তারিত নিয়ে পরদিন *ইত্তেফাকের* প্রথম পাতায় প্রকাশিত *আচ্ছন্ন তন্দ্রায় নাকডাকা প্রশান্তি* শীর্ষক রিপোর্টটি ছিল তারই করা। পরবর্তীতে তিনি কোয়ান্টাম মেথডের প্রথম ব্যাচে অংশ নেন।

কৃতি সাংবাদিক নাজিম উদ্দিন মোস্তানের জন্ম ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। বাবা হাফিজ উদ্দিন মোস্তান ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাবিলদার, মা সায়েরা খাতুন ছিলেন তার প্রেরণার উৎস। নিজ বাড়ি চাঁদপুর সদর উপজেলার পশ্চিম সকদি গ্রামে তার পড়াশোনা শুরু এবং সেখান

থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম থেকে ইন্টারমিডিয়েট সম্পন্ন করে স্থানীয় *দৈনিক সমাচার*-এ প্রুফ রিডার হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন।

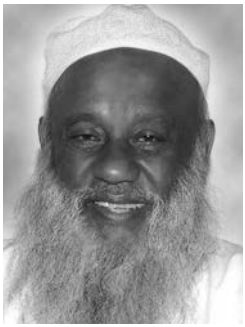
পরে ঢাকায় এসে পয়গাম, সংবাদ ও মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত 'হক কথা' পত্রিকায় রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে যোগ দেন *ইত্তেফাকে*।

মোস্তানের জীবন ছিল সংগ্রামমুখর, বরাবরই তাকে চলতে হয়েছে চরম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি ১৯৬৯ সালে বিএ পাশ করেন। এরও এক দশক পর ১৯৭৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র হিসেবে অর্থনীতিতে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। অনুবাদ করেছেন অর্থনীতিসহ সমাজবিজ্ঞান ও রাজনীতিবিজ্ঞানের বেশ কিছু বই।

নাজিম উদ্দিন মোস্তান ছিলেন এক দরদী সমাজকর্মী। লেখক আহমদ ছফার সাথে মিলে ছিন্নমূল পথশিশুদের জন্যে একটি বৈকালিক স্কুলও খুলেছিলেন। ১৯৯৮-এর বন্যার সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্টিংয়ের কাজে অহোরাত্র পরিশ্রম করেছেন তিনি। এর পর পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। তারপরও তিনি অবসর যাপনের কথা ভাবেন নি। *ইত্তেফাকে* কাজের পাশাপাশি নিজস্ব উদ্যোগে চালিয়ে গেছেন *সাপ্তাহিক রাষ্ট্র* পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজ।

২০১৩ সালের ১৮ আগস্ট ঢাকার মিরপুরে সাংবাদিক কলোনীর নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন প্রথিতযশা এই সাংবাদিক। *ইন্নালিল্লাহে ... ওয়া রাজিউন।* আমরা তার আত্মার অনন্ত প্রশান্তি কামনা করি।

আমরা তার সামগ্রিক অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।



মরহুম সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী আলহাজ মোহাম্মদ জহিরুল হক। অর্ধশতাব্দীর পেশাজীবনে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভার, আজাদ, বাংলাদেশ টাইমস ইত্যাদি প্রথমসারির পত্রিকায় চিত্রসাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন। বাংলাদেশ ফটো-জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট ছিলেন একযুগেরও বেশি সময়। ব্যক্তিগত জীবনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও স্নেহধন্য এই মানুষটি তার ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত ও কর্মময় জীবনের অসংখ্য দুর্লভ মুহূর্ত। বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল হক কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৫০ তম ব্যাচে অংশ নেন।

সত্য অনুসরণের বাস্তব প্রক্রিয়া শেখায় কোয়ান্টাম

মোহাম্মদ জহিরুল হক

১৯৬৪ সাল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হলেন একদিকে আইয়ুব খান, অন্যদিকে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতিমা জিন্নাহ। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ নেতারা তখন ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন।

এমনি এক প্রচারণার অংশ হিসেবে ফাতিমা জিন্নাহ চট্টগ্রাম যাচ্ছেন। ট্রেনে তার পক্ষের নেতা-কর্মীদের সাথে আমরা বেশ কজন সাংবাদিকও ছিলাম। আমি তখন *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভারের* ফটোসাংবাদিক।

সেদিন পথে পথে, বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে উৎসাহী জনতার অভিবাদনের জবাব দিচ্ছিলেন বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ট্রেনটি চট্টগ্রাম পৌঁছাতে সময় লেগেছিল প্রায় ৩৬ ঘণ্টা।

ফেনীর কাছাকাছি কোনো একটি স্টেশনে ট্রেন থামলে বঙ্গবন্ধু একসময় সাংবাদিকদের বগিতে এলেন। তার পরিচিত একজন সাংবাদিককে বললেন তাকে একটু পানি খাওয়াতে। এটা শুনেই আমি একদৌড়ে ট্রেন থেকে প্লাটফর্মে নেমে এলাম পানির খোঁজে।

রেললাইনের পাশে কিছু বেড়ার ঘর ছিল। ঢুকে পড়লাম একটা ঘরে।

দেখি, ঘরে কেউ নেই। অগত্যা রান্নাঘর থেকে একটা পানিভর্তি কলসি আর গ্লাস নিয়ে আমি সেখানে একটা পাঁচ টাকার নোট রেখে চলে এলাম। বঙ্গবন্ধুকে পানি দিলাম। কিন্তু খুব রেগে গিয়ে তিনি বলে উঠলেন, অসম্ভব, এই পানি আমি খাব না, এগুলো তুমি চুরি করে এনেছ।

আমি বললাম, চুরি করি নি, টাকা দিয়ে এসেছি। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করছেন না দেখে আমারও খুব রাগ হলো। আমি তখন কিছু না বলে তার হাত ধরে তাকে সেই ঘরটিতে নিয়ে গেলাম। কলসির জায়গায় ফেলে আসা পাঁচ টাকার নোটটা তাকে দেখালাম। বঙ্গবন্ধু আবেগাপ্লুত হয়ে আমাকে তার বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

সে-ই শুরু। তার এই সান্নিধ্য আমি আমৃত্যু পেয়েছি। এই মহান মানুষটির পিতৃসুলভ মমতা আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাওয়া। বঙ্গবন্ধুর বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক জীবন আর অত্যন্ত সাদাসিধে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের প্রায় তিন হাজার ছবি আমি তুলেছি।

ফটোসাংবাদিক হিসেবে আমার জীবনের শুরুটা বেশ ঘটনাবহুল। বাবা চেয়েছিলেন আমি ইংল্যান্ডের ডান্ডি-তে পাট নিয়ে পড়াশোনা করতে যাই। সে সুযোগও আমার এসেছিল। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমার ছবি তোলার শখ। আর ছিল সাংবাদিকতার প্রতি আগ্রহ। তাই বিদেশে যাব না, দেশেই সাংবাদিকতা করব–আমার এ সিদ্ধান্ত জানানোর পর বাবা ভীষণ রেগে গেলেন। বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বললেন আমাকে।

সেই রাতেই এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। নারায়ণগঞ্জেই আমার নানাবাড়ি। রাতটা ওখানে কাটিয়ে পরদিন সকালে নানার কাছ থেকে দশটা টাকা চেয়ে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চড়ে বসলাম।

ঢাকা পৌঁছে সোজা মতিঝিলে *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভারের* অফিসে চলে এলাম। পূর্ব পরিচয়সূত্রে দেখা করলাম পত্রিকাটির তৎকালীন বার্তা সম্পাদক এ বি এম মূসার সাথে। সাংবাদিকতা করতে চাই শুনে তিনি পরদিন থেকেই কাজে লেগে যেতে বললেন। দেড়শ টাকা বেতনে আমার ফটোসাংবাদিক-জীবন শুরু হলো।

ফটোসাংবাদিক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে ভালো ছবির জন্যে প্রশংসা যেমন পেয়েছি, তেমনি মুখোমুখি হতে হয়েছে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতারও। ষাটের দশকে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সময় একদিন নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ার মোড়ে গিয়ে দেখি, রাস্তায় রাস্তায় খুব বিক্ষোভ হচ্ছে। লোকজন আইয়ুব খানের ছবি পা দিয়ে মাড়াচ্ছে, আবার কেউ-বা সে ছবি ওপরে ছুঁড়ে

দিয়ে তাতে জুতো নিক্ষেপ করছে। কী মনে করে একটা ছবি তুলে ফেললাম– শূন্যে ভাসছে আইয়ুব খানের ছবি আর তার নিচে জুতাসহ একটা হাত।

পরদিন *পাকিস্তান অবজারভারের* প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হলো সেই ছবি। ঢাকাসহ সারাদেশে বেশ আলোড়ন তুলল ছবিটা। গভর্নর মোনায়েম খাঁ ভীষণ খেপে গিয়ে আমাকে গ্রেফতারের আদেশ দিল। সে যাত্রায় আমাকে ২৮ দিন জেল খাটতে হয়েছিল।

তবে আমার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, বঙ্গবন্ধুর স্নেহময় সান্নিধ্য। একটা সময় প্রায় সারাদিনই আমি তার সাথে কাটাতাম। দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেতাম তার সাথে।

অনেক বড় হৃদয়ের মানুষ ছিলেন তিনি। সবার প্রতি তার ছিল সন্তানের মমতা। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকালে আমাকে একদিন বললেন, 'তোর আর ছবি তোলার দরকার নাই। আমার সাথে কোথাও গেলে সেখানকার নির্যাতিতা মহিলাদের তুই খুঁজে বার করবি, তারপর আমার কাছে নিয়ে আসবি।' মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতা বহু মহিলাকে এভাবে তিনি সাহায্য করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু একবার যশোরে গেলেন। সাথে আমিও ছিলাম। স্থানীয় এক ভদ্রমহিলাকে আমি তার কাছে নিয়ে এলাম। মহিলার স্বামী মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, আর তার দুসন্তান তখনো পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। দেখেছি, সেই মহিলার সামনে সমবেদনায় বঙ্গবন্ধু নিজেও কেমন অসহায় বোধ করছিলেন।

তার পরদিনই যশোরের একটি জনসভায় বঙ্গবন্ধু দুহাত তুলে রেডক্রস আর বিশ্বের বিবেকবান মানুষের প্রতি আহ্বান জানান–'আমার কিছু সন্তান পাকিস্তানের কারাগারে আটকা পড়ে আছে। তাদের ফিরিয়ে দাও।'

১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর আগের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি তার সাথে ছিলাম। সেদিন বিকেলে তিনি গণভবনের পুকুরপাড়ে বসে ছিলেন। একটা কুকুর এসে সেখানে ঘেউ ঘেউ করছিল। হাতের ছোট্ট লাঠি দিয়ে তিনি কুকুরটাকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। এর একটা ছবিও আমি তুলে রেখেছিলাম। মাগরিবের আজানের পর আমরা দুজনে একসাথে নামাজ পড়লাম। তারপর বঙ্গবন্ধু বললেন, 'এখন আমি বাড়ি যাব, তুই বাড়ি যা।' বঙ্গবন্ধুর সাথে সেই আমার শেষ দেখা ও তার শেষ ছবি তোলা।

সাংবাদিক জীবনের বন্ধু ও কোয়ান্টাম মেথডের উদ্ভাবক শহীদ আল বোখারী মহাজাতক আমার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন একজন মানুষ। ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমাদের পরিচয়। আমার স্ত্রী ও মেয়েরা সেই ১৯৯৩ সালে

কোয়ান্টাম কোর্সে অংশ নিয়েছেন। বেশ দেরিতে হলেও, এ কোর্সে এসে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। মেডিটেশন করে আমি এখন আগের চেয়ে অনেক সুস্থ ও ভালো বোধ করছি।

আমার একটি খুব বদভ্যাস ছিল–সারাদিন আমি প্রচুর কোমল পানীয় খেতাম। ইংল্যান্ডের একজন ডাক্তারও আমাকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন সেই ২০ বছর আগে। তবু বাদ দিতে পারি নি। কোয়ান্টাম কোর্স করার পর আমি এটা পুরোপুরি বর্জন করতে পেরেছি। সত্যটা আমরা অনেকেই হয়তো জানি, কিন্তু তা অনুসরণের বাস্তবসম্মত প্রক্রিয়াটা শেখায় কোয়ান্টাম মেথড।

লামার কোয়ান্টামমে আমি গিয়েছিলাম। দেখেছি, কত সুন্দরভাবে সব কাজ পরিচালিত হচ্ছে সেখানে। সত্যিই এটা একটা বিরল দৃষ্টান্ত। পরম করুণাময়ের কাছে আমি দোয়া করি–এ প্রতিষ্ঠান যেন আরো বড় হয়ে ওঠে।



প্রয়াত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও নাট্যজন খালেদ খান। মার্চ ২০১৩-তে তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৫৭ ব্যাচে অংশ নেন। ইতঃপূর্বে স্বেচ্ছা রক্তদানসহ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে নির্মিত চারটি তথ্যচিত্রের ধারাভাষ্যে তিনি কণ্ঠ দেন। আমরা তার সামগ্রিক অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

মেডিটেশন আমাদের জাগিয়ে তোলে

খালেদ খান

এক লোকের গল্প বলি। সত্যি ঘটনা। বছর কয়েক আগে একটা বিদেশি জার্নালে পড়েছিলাম। ভদ্রলোক বিমান দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে কোনোরকম বেঁচেবর্তে ফিরেছিলেন। শরীরের কয়েকটি হাড় ছাড়া আর কিছুই প্রায় অক্ষত ছিল না। হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছিল।

লোকটা মারা যায় নি বটে, কিন্তু প্রায় মৃতই বলা যায়। সারাক্ষণই চোখ বন্ধ, জ্ঞান আছে কি নেই তা-ও বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে চোখ খুলে একটুখানি তাকান। ডাক্তার-নার্সরাও আশাহত, প্রায়ই তারা বলাবলি করেন– লোকটা কি সারাটা জীবন এভাবেই পড়ে থাকবে? আর কোনোদিন স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে না? এভাবে বেঁচে থেকেই বা কী লাভ!

মানুষটা আশেপাশের সবার কথাই শোনেন, কিন্তু খুব আবছাভাবে। বোঝেন যে, সবাই তার সুস্থতার সম্ভাবনা নিয়ে সন্দিহান। কিন্তু মনে মনে তিনি ঠিক করেন, সামনের বড়দিনে তিনি হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরবেন।

যে যা-ই বলুক, তিনি ঠিকই স্বপ্ন দেখে যান। ইচ্ছেটা জপতে থাকেন মনে মনে। দেখা গেল, তার চোখ মেলে তাকিয়ে থাকার সময়টা ক্রমশ বাড়ছে। একসময় হাত-পা নাড়াতে পারছেন। ইশারায় একে ওকে ডাকছেন।

অবশেষে এলো সেই কাঙ্ক্ষিত দিনটি। বড়দিন, ২৫ ডিসেম্বর। পুরো হাসপাতাল বিস্ময়ের সাথে দেখল, ভদ্রলোক নিজেই বিছানা থেকে নামলেন,

তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেলেন।

মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, একে বলা হয় 'থিওরি অব এট্রাকশন'। অর্থাৎ কোনো একটি জিনিস আমি চাইছি, ক্রমাগত আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে একসময় আমি তা অর্জন করলাম। সেটি বাস্তবে পরিণত হলো।

এখন কথা হলো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এত অসংখ্য কিছুর মধ্যে একজন মানুষ কী চায় এবং সেটি কতটুকু নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারবে, তা নির্ভর করে একান্তই তার নিজের ওপর। কিন্তু আমরা অধিকাংশ মানুষই পারি না কেন? কারণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের চাওয়া আর প্রত্যাশাটা নেতিবাচক। যেমন, আমি অমুক জায়গায় যেতে চাই, কিন্তু যাওয়ার আগে অন্তত পাঁচ বার ভাবি–ওখানে যাওয়ার পথে কত কী বাধা আসতে পারে, আর না যাওয়ার পক্ষে কী কী যুক্তি আছে। ফলে যাওয়া আর হয় না শেষপর্যন্ত।

আমি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। ছাত্রছাত্রীদের কারো মধ্যে দ্বিধা-সংশয় বা অজুহাত দেয়ার প্রবণতা দেখলে আমি তাদের বলি, 'নিজেকে জিজ্ঞেস করো, তুমি আসলে কী চাও। তোমার কাজগুলো তখন অনেক সহজ হয়ে যাবে।' আসলে আমরা অধিকাংশ মানুষই জানি না–আমরা কী চাই।

এখানেই মেডিটেশনের উপযোগিতা। মেডিটেশনের সুস্থির আত্মমগ্নতা আমাদেরকে নিজেদের ভেতরে তাকাতে সাহায্য করে। নিজেদের চাওয়া আর হৃদয়ের গতি-প্রকৃতি বুঝতে পারি আমরা। অনেকে বলেন মেডিটেশনে এই এই উপকার ইত্যাদি। তালিকাটা বোধহয় হওয়া উচিত এমন যে, মেডিটেশন কীসে কীসে কাজে লাগে না। মেডিটেশন আছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সবকিছুর মধ্যেই। আমাদের প্রতিটি কাজ, চিন্তা, আচরণ, কর্মোদ্যোগে চাই একটা নিবিড় মনোযোগ আর একাগ্রতা। তাই বলা যায়, মেডিটেশন বা নিমগ্নতা ছাড়া আসলে সব কাজে একটা ফাঁক থেকেই যায়। মেডিটেশন মানুষকে সচেতন করে। আমাদের জাগিয়ে তোলে। সবমিলিয়ে বলা যায়, মেডিটেশন সামগ্রিক অর্থে একটি সুন্দর জীবন-প্রক্রিয়া।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আমি দেখেছি, অনেক মানুষ এখানে এসে শারীরিক সুস্থতা অর্জনের পাশাপাশি দুঃখ-শোক-বিষণ্নতা থেকে মুক্ত হয়েছেন। আসলে নানা কারণে মানুষ নেতিবাচকতায় আক্রান্ত হয়। এর একটা কারণ হতে পারে যে, আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে তার অনেক কিছুই আমরা মেনে নিতে পারি না, সহজভাবে গ্রহণ করতে পারি না। আমরা বিচার করতে বসি–কেন এটা হলো, এভাবে না হয়ে ওরকম হলো না কেন? আমরা বুঝি না যে, এটি ঘটছে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে।

কিছুদিন আগে পত্রিকায় একটা খবর পড়ছিলাম। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলেছেন, মহাবিশ্বের সূচনালগ্নে যখন বিগ-ব্যাং হয়েছিল তখন স্রষ্টা ছিলেন না। অর্থাৎ হকিং প্রকারান্তরে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেন।

আমার পাশে একজন বন্ধু বসে ছিলেন সে-সময়। তিনি বলে উঠলেন, যে মানুষটা জটিল দুরারোগ্য অসুখে আক্রান্ত হয়ে কয়েক দশক ধরে হুইল চেয়ারে বসে দিনরাত্রি পার করছেন, কেন তার এ রোগ হলো–এর উত্তরই যখন তিনি জানেন না, সেখানে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় স্রষ্টা কোথায় ছিলেন কিংবা আদৌ ছিলেন কিনা, সেটা তিনি কীভাবে বুঝবেন!

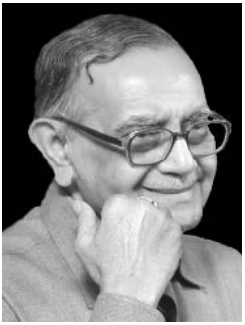
বন্ধুর কথা শুনে খুব আশ্চর্য হলাম। তাই তো! জীবনে যা ঘটে, সেটা কেন ঘটছে তার সবটাই কি আমরা জানি? জানি না বলেই মেনে নিতে পারি না। কিন্তু কৃতজ্ঞচিত্তে মেনে নিতে পারলে বোধহয় আক্ষেপ যন্ত্রণা অনেক কমে।

জীবনে ছন্দপতন হলে আমরা হতাশায় আক্রান্ত হই, কখনো-বা ভেঙে পড়ি; কিন্তু জীবন আসলে নদীর মতো। সবসময় সবখানে একই গতিতে এ চলে না। চলার পথে কোথাও বাধা পায়, বাঁক নেয়; তবু তার এগিয়ে চলা থামে না। সে চলে। জীবনও তা-ই।

ভারতের একজন ভাস্কর্যশিল্পীর কথা জানি। যিনি সমুদ্রতীরে বালি দিয়ে প্রতিদিন গভীর মনোযোগে ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। এক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করলেন, এ তো খুবই ক্ষণস্থায়ী। দিনের শেষে জোয়ারের পানিতে সব ধুয়ে-মুছে যাবে, এটা জেনেও কেন আপনি এই ভাস্কর্য তৈরি করেন? শিল্পী উত্তর দিলেন কেবল একটা মাত্র বাক্যে–'তোমার জীবনে কোন জিনিসটা স্থায়ী?' সাংবাদিক আর কিছুই বলতে পারলেন না।

আসলেই তো তা-ই। তাহলে কী নিয়ে এত আক্ষেপ? এত চাওয়া আর হাহাকার? আমরা অধিকাংশ মানুষই যখন চাই, বস্তুগত জিনিসগুলোই শুধু চাই। আমি যেমন চাই, অন্যেও তা-ই চায়, তখনই বাঁধে সংঘাত। আমরা যদি চাইতে পরতাম–সমাজটা সুন্দর হোক, দেশটা সুন্দর হোক, চারপাশটা সুন্দর হোক, সবাই মিলে ভালো থাকি। তাতে তো আমার নিজেরও সুখ।

এই যে সম্মিলিত চাওয়া, এর শক্তি অনেক বেশি। কোয়ান্টামে এসে এটি আমি আবারও উপলব্ধি করেছি। বিশাল হলরুমে সবাই যখন একসাথে মেডিটেশনে মগ্ন হয় তখন আমি অনুভব করেছি নৈঃশব্দের শক্তি। শিক্ষক আমাদের অনেক আছেন, কিন্তু 'মাস্টার'! গুরুজী সেই মাস্টার হয়ে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অক্ষমতার জায়গাটা যেন শুধরে দিচ্ছেন, সক্ষম করে তুলতে চাইছেন সম্মিলিত শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে।



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল। গবেষক প্রাবন্ধিক সুবক্তা ও একাধিক গ্রন্থপ্রণেতা প্রয়াত এ কর্মব্রতীর অবদান আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।

আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল ॥

সঙ্ঘপ্রেমী এক অনন্য মানুষ

আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল। নামটা শুনলেই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে স্নিগ্ধতায় ভরা অমলিন এক হাসিমাখা মুখ। সদা হাস্যোজ্জ্বল ও সদাচারী এই মানুষটি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করেছিলেন ১০৭ ব্যাচে। এরপর থেকেই কোয়ান্টামের সাথে তার গড়ে ওঠে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন। তিনি মমতার ডোরে যেমন বেঁধেছিলেন কোয়ান্টাম পরিবারকে, তেমনি সবাইকে বেদনাসিক্ত করে অনন্তযাত্রায় পাড়ি জমালেন গত ২১ জুলাই, ২০১৩।

ফাউন্ডেশনের প্রতিটি অনুষ্ঠানে চোখে পড়ত আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডলের উজ্জ্বল উপস্থিতি। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের একজন উপদেষ্টা হিসেবে সাংগঠনিক নানা বিষয়ে দিয়েছেন তার সুচিন্তিত পরামর্শ। শত ব্যস্ততার মাঝেও কোয়ান্টাম আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন নিয়মিত। এছাড়াও ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়ে তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোয় আলোকিত করেছেন কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের।

এই একাত্মতার পাশাপাশি আচার্য ড. পরেশ সঙ্ঘের প্রতিটি দিক-নির্দেশনা অনুসরণেও ছিলেন সমান তৎপর এবং আন্তরিক। ২০১১ সালে সুখী জীবন মেডিটেশন প্রকাশিত হওয়ার পর শ্রদ্ধেয় গুরুজী কোয়ান্টাম পরিবারের সবাইকে ছয় মাস তা অনুশীলনের আহ্বান জানান। এর কোনো

ব্যত্যয় ঘটে নি তার জীবনে। তিনি পরবর্তী ছয় মাস সুখী জীবনের মেডিটেশন অনুশীলন করেছেন একনিষ্ঠভাবে।

স্রষ্টার করুণায় মেডিটেশনটি টানা ছয় মাস চর্চার ফলে নিরাময় লাভ করেছিলেন বার্ধক্যজনিত হাতকাঁপা থেকে। সুস্থতা আর প্রাণবন্ততা তাকে ঘিরে থাকত সবসময়। তার পরিমিত জীবনবোধ আর নিয়মানুবর্তিতার কারণেই জীবনসায়াহ্নেও তিনি ছিলেন কর্মময় একজন মানুষ।

পেশাগত জীবনে ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি, সংস্কৃত বিভাগ ও বিশ্বধর্মতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক, গবেষক ও ধর্মবেত্তা। পালি ও সংস্কৃত বিভাগে তিন বছর বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে শিক্ষকতাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন তিনি। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। জগন্নাথ হলের আবাসিক শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সুদীর্ঘ ২৫ বছর।

সততা এবং নিষ্ঠার ছাপ ছিল তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। জীবনভর অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছেন, দিয়েছেন জীবন গড়ার সঠিক দিক-নির্দেশনা। নিজেও জ্ঞানের চর্চা করে গেছেন প্রতিনিয়ত।

তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। তিনি তৎকালীন বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মুহম্মদ আব্দুল হাই-এর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান। আর নিয়মিত পড়াশোনার ফলস্বরূপ অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবনে তিনি বরেণ্য দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেব-এর অমূল্য সাহচর্য লাভ করেন। আচার্য পরেশ চন্দ্র মণ্ডল ১৯৭৯ সালে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনিই বাংলাদেশে সংস্কৃত-এর ওপর প্রথম পিএইচডি অর্জনকারী।

লেখালেখির ক্ষেত্রেও আচার্য পরেশ চন্দ্র মণ্ডল ব্যয় করেন জীবনের অনেকটা সময়। দুইটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থসহ মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট ২০টি পাঠ্যবই রচনা করেন তিনি। কালিদাসের নাটকের কারিগরি বিষয়ের ওপর Kalidasa as a dramatist : A Study শীর্ষক তার পিএইচডি থিসিসটি পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর একটি অধ্যায় Ancient and Medieval Literature Criticism-এর নবম ভলিউমে যুক্তরাজ্য থেকে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়।

এছাড়াও *সংস্কৃত ছন্দের ধারা* তার আরেকটি অনবদ্য প্রকাশনা। মৌলিক

গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন আটটি, ধর্ম বিষয়ে রচিত প্রবন্ধের সংখ্যা চল্লিশোর্ধ্ব। ডিগ্রি পর্যায়ের রচনার বইও তিনি সম্পাদনা করেছেন। দীর্ঘ গবেষণার পর বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে গীতার একটি আধুনিক সংস্করণের কাজও শেষ করেছিলেন, বইটি এখন প্রকাশের অপেক্ষায়।

শিক্ষকতা, জ্ঞানচর্চা, লেখালেখি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন আচার্য পরেশ চন্দ্র মণ্ডল। ১৯৭৮ সালে পিএইচডি সম্পন্ন করে দেশে ফেরার পর রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীর অনুরোধে সেখানে ধর্মবিষয়ক আলোচনা শুরু করেন এবং সুবক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। সত্তর দশক থেকে বিটিভিতে *পবিত্র গীতা পাঠ* অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত আলোচনা শুরু করেন। রেডিও ও টিভিতে নিয়মিত গীতা পাঠ করে সারাদেশে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।

জটিল তত্ত্ব সহজে বলার অসাধারণ এক সহজাত ক্ষমতা ছিল তার। ফলে তার প্রাণবন্ত আলোচনা অনায়াসে গেঁথে যেত শ্রোতার হৃদয়ে। সংস্কৃত ভাষা ও সনাতন ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয়ে শুধু দেশে নয়, সমগ্র উপমহাদেশে তার মতো জ্ঞানী সাধক বিরল। এ কারণেই সাধারণ এক বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও একাগ্র জ্ঞানচর্চার ফলে অর্জন করেন আচার্য বা *গীতাপ্রজ্ঞাতীর্থ*-র মতো উপাধি।

নতুন কিছু শেখার ক্ষেত্রে, জানার ক্ষেত্রে সবসময়ই তিনি ছিলেন অগ্রগামী। মুক্তমনে গ্রহণ করতে পারতেন কল্যাণকর যে-কোনো কিছু। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সেও এসেছিলেন তার বড় ছেলে আশুতোষ মণ্ডলের অনুপ্রেরণায় মুক্তমনে ভালো কিছু জানার প্রয়াসেই।

ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত বিনয়ী, নিরহংকারী ও নির্মল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এ মানুষটি পারিবারিকভাবেও ছিলেন একজন সফল মানুষ। তার সহধর্মিণী মিনু রাণী মণ্ডল একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। তাদের দুই ছেলে কানাডা প্রবাসী। বড় ছেলে আশুতোষ মণ্ডল কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, ছোট ছেলে বিজয় মণ্ডল কানাডার ব্যাংক অব মন্ট্রিলে কর্মরত আছেন।

কর্মজীবন, পারিবারিক জীবন, সাংগঠনিক জীবন–সবক্ষেত্রেই একজন সফল মানুষ ছিলেন আচার্য পরেশ চন্দ্র মণ্ডল। যে-কোনো সাংগঠনিক কাজে সবার সাথে মিশে যেতে পারতেন হৃদ্যতা আর আন্তরিকতা নিয়ে। ফাউন্ডেশনের কাজে যখনই প্রয়োজন হয়েছে তিনি সময় দিয়েছেন, কোয়ান্টাম চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছেন তার জ্ঞানের আলোকে।

২০০৪ সাল থেকে শুরু হয় কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের প্রতিদিনের

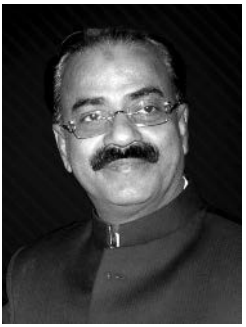
চর্চা *শোকর আলহামদুলিল্লাহ* বলা। পরবর্তীতে পরিবারের সনাতন সদস্যদের জন্যে চমৎকার একটি শব্দ সংযোজিত হয়–'হরি ওম'। আর এই শব্দটি অনুসন্ধানে ছিল আচার্য পরেশ চন্দ্র মণ্ডলের সযত্ন প্রয়াস।

একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মেডিটেশন মেলা আয়োজনের উদ্দেশ্যে ভিসির সাথে দেখা করে প্রোগ্রামের অনুমতি চাইলেন। নিজের গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ থাকা সত্ত্বেও সেদিন কোয়ান্টিয়ারদের সাথে সেখানে গিয়ে তিনি দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করেন। অথচ নিজের ব্যক্তিগত কোনো কাজের জন্যে তিনি কখনো কোনো সুপারিশ করেন নি। সঙ্ঘের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যকে বড় করে দেখেছেন সবসময় আর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত থাকতে চেয়েছেন সঙ্ঘের সাথেই।

স্রষ্টার করুণাধারায় সিক্ত হয়ে যে জীবন শুরু হয়েছিল ১৯৩৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর, তার-ই জাগতিক সমাপ্তি ঘটল ২১ জুলাই, ২০১৩ সালে।

যাপিত জীবনের টুকরো টুকরো শত স্মৃতি হয়তো ম্লান হবে। কিন্তু সময়ের স্রোতকে অতিক্রম করে ঠিকই টিকে থাকবে আচার্য পরেশ চন্দ্র মণ্ডলের সঙ্ঘপ্রেম আর মানবসেবায় তার নিঃস্বার্থ অবদান। স্রষ্টা এই সঙ্ঘপ্রেমী অনন্য মানুষের প্রতিটি সৎকর্মকে কবুল করুন।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ভাইস-চেয়ারম্যান এবং কোয়ান্টাম বুলেটিনের সম্পাদক কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমদ। পেশাজীবনে তিনি ছিলেন দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। ২৫ জুন ২০১৫ তিনি (৬৯) ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ... রাজিউন। আমরা তার আত্মার অনন্ত প্রশান্তি কামনা করি এবং তার সামগ্রিক অবদান গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।



কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমদ ॥

জীবনে ভরসাস্থল মরণে প্রেরণার উৎস

দেড় যুগ আগের কথা।

প্রতিষ্ঠান-প্রধান হলেও কাজী মাহ্‌তাব নিজেই তখন বিভিন্ন বাজার পরিদর্শনে যেতেন। সেবার গেছেন যশোরে। ওখানে কিছুদিন আগে একটি দোকান আগুনে পুড়ে যায়। ঘটনা শুনে দোকানের মালিককে তিনি ডেকে পাঠালেন। বিস্তারিত শুনলেন সব। বুঝলেন, কিছুই আর অবশিষ্ট নেই সেই দোকানির। কিন্তু আছে তার উদ্যম এবং একটু সহযোগিতায় অনেকখানি এগিয়ে যাওয়ার শক্তি। সহযোগিতার দায়িত্বটা তখন নিজেই নিলেন। নতুন করে ব্যবসা শুরু করার জন্যে তাকে বিনামূল্যে দিলেন কিউট-এর বেশ কিছু পণ্য। আর দোকান মেরামতের জন্যে ধার দিলেন নগদ অর্থ।

না, ঘটনা এখানেই শেষ নয়। পরবর্তী এক বছর ধরে সেই ব্যবসায়ীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলেন। ব্যবসা-সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি পরিণত হলেন তার এলাকার সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ীতে। আজও তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন কাজী মাহ্‌তাবের কথা।

মফস্বলের ভাগ্যবিড়ম্বিত একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে পুনর্বাসনের জন্যে এক

বছর ধরে নিয়মিত চেষ্টা করে যাচ্ছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় একজন শিল্পপতি। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও কাজী মাহ্তাবকে যারা চেনেন, তারা এতে মোটেই অবাক হন নি। সারাজীবন এই মানুষটির সাধনাই ছিল কীভাবে অন্যের উপকার করা যায়। যখনই জেনেছেন কেউ বিপদে পড়েছে, ছুটে গেছেন, সর্বতোভাবে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। তার নিজের জীবনটাও একের পর এক প্রতিকূলতা জয় করে সাফল্যের চূড়ায় ওঠার গল্প।

১৯৪৬ সালে পুরনো ঢাকার চকবাজারে তার জন্ম। বাবা ছিলেন একজন কাপড় ব্যবসায়ী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পর পর সাত বার তাদের দোকানটি আগুনে পুড়ে যায়। ভয়াবহ আর্থিক সংকট নেমে আসে পরিবারে। বড় ছেলে হিসেবে কাজী মাহ্তাবের ওপরই বর্তায় সংসারের দায়িত্ব। তখন তিনিই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য।

পড়াশোনা শেষ করার আগেই জীবিকার সন্ধানে নামতে হয় তাকে। বই ফেরি করা, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতাসহ বিভিন্ন কাজ করেছেন। এর মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতক সম্পন্ন করেন। ১৯৭৩ সালে যোগ দেন তাবানি বেভারেজে। চাকরির পাশাপাশি কসমেটিক্স ব্যবসা শুরু করেন ছোট ভাই কাজী আশরাফকে সাথে নিয়ে। ১৯৮২ সালে মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ প্রতিষ্ঠা করেন। দেশে যাত্রা শুরু করে প্রসাধন সামগ্রীর নতুন ব্র্যান্ড *কিউট*।

আশির দশকের গোড়ায় এ-দেশের বিপণন জগতে ব্র্যান্ডিংয়ের ব্যাপারে কোনো ধারণাই ছিল না। ব্যবসায়ী হিসেবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও ক্ষুরধার চিন্তার অধিকারী কাজী মাহ্তাব তখনই বুঝতে পেরেছিলেন ব্যবসাক্ষেত্রে ব্র্যান্ডিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। *কিউট*-কে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে তাই অভিনব সব কৌশল বেছে নেন তিনি।

জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পৃষ্ঠপোষকতা ও সচেতনতামূলক বিলবোর্ড-বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করলেন। এর পাশাপাশি তিনি মনোযোগ দেন সকল পর্যায়ের কর্মী ও পরিবেশকদের প্রতি। প্রত্যেকের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। তিনি আন্তরিকভাবে চাইতেন তারাও সফল হোক স্ব স্ব ক্ষেত্রে। এজন্যে নিজেই হাতে-কলমে অনেক কিছু শেখাতেন ওদের। কেউ ভালো করলে পুরস্কৃত করতেন। তাদের পরিবারেরও খোঁজখবর রাখতেন নিয়মিত। এভাবেই কর্মচারীদের সাথে একটি পিতা-পুত্রের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার। তাদেরই একজন বলছিলেন, 'স্যার ছিলেন বটবৃক্ষের মতো। বিপদে আগলে রাখতেন সবসময়'।

ব্র্যান্ডিং, রিলেশনশিপ মার্কেটিং-এর মতো আজকের আধুনিক বিপণননীতি

ও ব্যবসায়িক ধারণাগুলো কাজী মাহ্‌তাব অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন সেই তিন দশক আগেই।

তিনি বিশ্বাস করতেন, কাউকে কিছু টাকা দিয়ে দিলেই সামাজিক দায়িত্ব পালন হয়ে যায় না। একজন মানুষকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে অনুপ্রাণিত করে তোলাটাই সত্যিকারের সামাজিক দায়িত্ব পালন।

এছাড়াও চারপাশের সবার ছোটখাটো প্রয়োজনের দিকেও তার থাকত তীক্ষ্ণ মনোযোগ। প্রায়ই বলতেন, 'একা বড় হওয়া যায় না, সবাইকে সাথে নিয়েই বড় হতে হয়।' কোথাও বেড়াতে যেতেন যখন, বড় গাড়ি ভাড়া করতেন যাতে অনেকে যেতে পারে। আর খুব সহজেই মিশে যেতে পারতেন যে-কোনো পরিবেশে। প্রথম পরিচয়েই প্রাণখোলা আন্তরিক হাসি দিয়ে সবাইকে আপন করে নিতেন।

পরিবার, পেশা এবং সঙ্ঘ–এই তিনের মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন তিনি। তার ছোট ছেলে কাজী ইমতিয়াজ (বর্তমানে মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এ হেড অব বিজনেস ডেভলপমেন্ট হিসেবে কর্মরত) বলছিলেন, "আব্বু অফিসের ফাইল কখনো বাসায় নিয়ে আসতেন না। পুরো সপ্তাহজুড়ে ব্যবসার কাজে কঠোর পরিশ্রম করতেন, কিন্তু শুক্রবারটা রাখতেন শুধুই পরিবারের জন্যে। আর *কিউট-এ* যোগ দেয়ার পর তার সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় পেলাম। কাজের ব্যাপারে তার নিষ্ঠা দেখে আমি কাজকে ভালবাসতে শিখেছি।

ছেলে হিসেবে আলাদা কোনো সুবিধা আমাকে দেন নি। উল্টো বলতেন, 'অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেখো। নিজ যোগ্যতায় যতটুকু অর্জন করতে পারবে ততটুকুই তোমার।' তার দেখানো পথ অনুসরণ করা পরিশ্রমের ও কষ্টের। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছতে পারলে দেখব সাফল্য দুহাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

অসংখ্য মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজনে তার কাছে আসতে দেখেছি। একবার প্রশ্ন করেই ফেললাম, 'আব্বু, তোমার কি মনে হয় না যে, মানুষ তোমার সহানুভূতির সুযোগ নিয়ে সুবিধা আদায় করে নেয়?' আব্বু হেসে বললেন, 'দুনিয়ায় এরকম কিছু মানুষ থাকতে হয় যাদের কাছ থেকে অন্যেরা সুবিধা পেতে পারে। না হলে প্রকৃতিতে ভারসাম্য থাকবে কী করে?"

এভাবেই কাজী মাহ্‌তাব সারাজীবন মানুষের কল্যাণে তার মেধা, শ্রম, সময় ও সম্পদ ব্যয় করেছেন। কিন্তু সবসময় সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছেন প্রচারের আলো।

ফাউন্ডেশনের জন্মলগ্ন থেকেই কোয়ান্টাম চেতনার বিস্তার ও প্রসারে কাজী

মাহ্তাব ছিলেন গুরুজীর একনিষ্ঠ সহযোদ্ধা। গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতকের সাথে তার পরিচয় সুদীর্ঘ ৫৩ বছরের।

সদাকল্যাণকামী এ মানুষটি ফাউন্ডেশনের প্রতিটি কাজে ছিলেন অগ্রগামী। কোয়ান্টামের প্রতিটি অনুষ্ঠানে থাকত তার হাস্যোজ্জ্বল ও সরব উপস্থিতি। শুরুর দিকে এ-দেশে অধিকাংশ মানুষেরই মেডিটেশনের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কাজী মাহ্তাব তখন থেকেই তার পরিবারের সদস্য, প্রতিষ্ঠানের কর্মী-পরিবেশক, পরিচিত, বন্ধু, আত্মীয় সবাইকে কোর্সে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন সবসময়।

ফাউন্ডেশনের সব ধরনের সেবা-উদ্যোগে সবসময়ই ছিল তার প্রাণবন্ত ও সর্বাত্মক অংশগ্রহণ। ২০০০ সালে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম ল্যাব। শত ব্যস্ততার মাঝেও তখন প্রায় প্রতিদিনই তিনি ল্যাবে এসেছেন। খোঁজখবর নিয়েছেন সবার, কাজে উৎসাহ দিয়েছেন। প্রাণখোলা হাসি-গল্পে উজ্জীবিত করেছেন সবাইকে।

কোয়ান্টাম ল্যাবের কর্মীরা আজও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করে সে-সব দিনের কথা। *দুঃসময়ের জন্য রক্ত সঞ্চয় করুন*–সবাইকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের এ স্লোগানটি তারই উদ্ভাবিত।

এছাড়াও বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং এর শিক্ষার্থী কোয়ান্টাদের খেলাধুলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোয়ান্টারা যখন ঢাকায় আসত, তাদের যাবতীয় দেখভালের সব ব্যবস্থা করতেন কাজী মাহ্তাব।

এ সবই তিনি করেছেন অক্লান্ত চিত্তে, সঙ্ঘকে ভালবেসে। কাজী মাহ্তাব জীবনে যেমন ছিলেন সঙ্ঘে লীন, তেমনি চাইতেন মৃত্যুর পরও থাকবেন সঙ্ঘের সাথে। তাই তো হৃদয়মথিত দোয়া ও শুভকামনায় তাকে বিদায় জানিয়েছেন সৎসঙ্ঘের সাথি ও সহযাত্রীরা। আর কোয়ান্টামের বরকতময় স্থান আরোগ্যশালায় রচিত হয়েছে তার শেষ ঠিকানা। শান্তিতে তিনি ওখানে ঘুমিয়ে আছেন প্রিয় সঙ্ঘের লাখো ভবিষ্যৎ কর্মীর অনন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে।

পরম করুণাময় তাঁর সৎকর্মশীল বান্দা ও প্রিয়জনদের কাতারে কাজী মাহ্তাবকে স্থান দিন, এটিই আমাদের প্রার্থনা।



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা এবং বান্দরবান লামাস্থ কোয়ান্টাম শিশুকাননের প্রথম পরিচালনা পর্ষদের সহ-সভাপতি সর্দার নূর-উজ-জামান। মরহুম এই শিল্পপতি ও সেবাব্রতী কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২৮ ব্যাচে অংশ নেন।

সর্দার মুহাম্মদ নূর-উজ-জামান ॥

একজন সমর্পিত মানুষের নাম

আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ব্যবসায়িক পার্টনার বা বিদেশি আমদানীকারক– সবাই জানতেন, শনিবার দিন নূর-উজ-জামানকে কোথাও পাওয়া যাবে না, কারণ এদিন তিনি ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকেন। এই ব্যক্তিগত কাজটি আর কিছুই নয়, শনিবার কেন্দ্রীয় সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টায়ন। যাতে গত কয়েক বছর ধরে একাধারে প্রতিটি শনিবার নিয়মিতভাবে অংশ নিয়েছেন মরহুম সর্দার নূর–উজ-জামান।

আর কাকতালীয় হলেও সত্য যে, একমাত্র যে শনিবারটি তিনি কোয়ান্টায়ন করতে পারলেন না প্রচণ্ড শারীরিক অসুস্থতার কারণে, সে শনিবারেই দিন শেষে তিনি চিরতরে বিদায় নিলেন এই পৃথিবী থেকে।

সর্দার মুহাম্মদ নূর-উজ-জামান। একজন দায়িত্বশীল সন্তান, স্নেহময় পিতা, প্রেমময় স্বামী, সুবিবেচক মালিক, বিশ্বস্ত অনুসারী, দক্ষ কর্মী, সদাচারী সহকর্মী এবং অনুগত বান্দা ইত্যাদি কোন গুণটি যে তার ছিল না, তা ভাবতে গিয়ে বিস্মিত হয়েছেন বিদায় বেলায় তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত গুণগ্রাহীরা। কারণ জীবদ্দশায় সর্দার নূর-উজ-জামানের সাথে সুসম্পর্কের স্মৃতি ছাড়া অন্য আর কিছুর কথা কেউ মনে করতে পারছিলেন না।

সর্দার নূর-উজ-জামান ১৯৫৫ সালে কুষ্টিয়ার সন্দা গ্রামে দুই ভাই ও ছয় বোনের এক বৃহৎ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। খুব অল্প বয়সে বাবাকে হারান।

বড় ছেলে হিসেবে পরিবারের সব দায়িত্ব তার কাঁধে বর্তায়।

প্রচণ্ড সংগ্রামী ও আত্মবিশ্বাসী মানুষ ছিলেন তিনি। শত প্রতিকূলতায়ও কখনো ভেঙে পড়েন নি। সাহসের সাথে সামনে এগিয়েছেন। নিজের পড়ার খরচ নিজে যুগিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে কৃতিত্বের সাথে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

লেখাপড়ার পর কর্মজীবন শুরু করেন মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে। চাকরিজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও ১৯৯৫ সালে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২৮ ব্যাচে অংশ নিয়ে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। কোর্সের চতুর্থ দিন প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে অনুভূতি ব্যক্ত করার সময় গুরুজী তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন 'শিল্পপতি' হিসেবে।

গুরুজীর কথায় আলোড়িত হয়ে গভীর বিশ্বাস নিয়ে চাকরি ছেড়ে দিলেন। ব্যবসায় শুরু করলেন। এরপর আর বেশিদিন লাগে নি তার নামের পাশে শিল্পপতি শব্দটি যোগ হতে। সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় গড়ে তোলেন এপকট ইন্টারন্যাশনাল ও এপকট অ্যাপারেলস লিমিটেড নামে দুটো গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান। এছাড়া বিটেক্স ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি বায়িং হাউজেরও মালিক ছিলেন তিনি।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সাথে সম্পৃক্ত হবার পর তার আগ্রহ এবং পৃষ্ঠপোষকতায়ই ১৯৯৬ সালে নিজস্ব বাসভবনে শুরু হয় সবুজবাগ শাখার কার্যক্রম এবং এখন তা চলছে বর্ধিত কলেবরে। শাখার সুবিধার জন্যে বাসভবন সজ্জার অনেক প্রয়োজনকে তিনি সবসময় উপেক্ষা করেছেন হাসিমুখে।

ফাউন্ডেশনের দায়িত্বশীল হিসেবে তিনি ছিলেন প্রথমসারির একজন দক্ষ ও আন্তরিক কর্মী। লামা শিশুকাননের পৃষ্ঠপোষকতা, ব্লাড ক্যাম্প আয়োজন, রক্তদান উন্নয়ন তহবিলের অর্থসংগ্রহ বা মাটির ব্যাংক ইত্যাদি ফাউন্ডেশনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাজ করেছেন সর্বোচ্চ আন্তরিকতা, শ্রম আর সাধ্য দিয়ে।

যখনই কোনো নতুন কাজ পেতেন বা ব্যবসায় লাভ হতো, সাথে সাথে একটি অংশ তিনি দান করতেন ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেবাখাতে। লামা ধ্যানযাত্রার সংগঠক হিসেবে প্রথম চারটি ধ্যান উৎসবে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে।

তার স্বপ্ন ছিল কোয়ান্টামের নিজস্ব টাওয়ার এবং ব্লাড ল্যাব ভবন তিনি তৈরি করে দেবেন। শুধু নিজেই নয়, তার পরিবারকেও তিনি সম্পৃক্ত করেছিলেন এ কাজে। তার স্ত্রী সবুজবাগ শাখার পরিচালক মাসুদা আক্তার

আবেদীনকে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের জন্যে সবরকম সহযোগিতা করতেন সর্বতোভাবে।

আর স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য, রসুলের প্রতি ভালবাসা এবং গুরুর প্রতি বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যেও যে একজন মানুষ নিজের পরিত্রাণের লক্ষ্যে আত্মশুদ্ধির জন্যে এত সময় ব্যয় করতে পারেন, সর্দার নূর-উজ-জামান সে উদাহরণই রেখে গেছেন আমাদের সামনে। মৃত্যুর আগে সজ্ঞান থাকার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি স্রষ্টার স্মরণ থেকে বিচ্যুত হন নি।

মরহুম সর্দার নূর-উজ-জামান তার কাজের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের ইতিহাসের অংশ হয়ে আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন। মহাজাগতিক সফরের নতুন ধাপে তার অভিযাত্রা আনন্দময় হোক, প্রশান্তিময় হোক। পরম করুণাময়ের কাছে এই আমাদের প্রার্থনা।



কোয়ান্টাম পরিবারের সবার প্রিয় ও সদাহাস্যময় সদস্য ছিলেন মরহুম ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ূন কবীর। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৩ ব্যাচে অংশ নেন।

ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ূন কবীর ॥
তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয়

চারটি বছরে যতগুলো মঙ্গলবার বা বুধবার হয়, তার কোনো একটি দিনও এমন হয় নি যেদিন তিনি কোয়ান্টাম হিলিং সেশনে অংশ নেন নি। আমেরিকা, জার্মানি, থাইল্যান্ড বা ভারত–পৃথিবীর যেখানেই থাকতেন–সাপ্তাহিক হিলিং-এর ঐ দিনটিতে স্থানীয় ঘড়ির কাঁটা বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটার সাথে মিলে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি বসে পড়তেন মেডিটেশনে।

গভীর মমতা ও দরদ দিয়ে মগ্ন হতেন হিলিংপ্রার্থীর রোগমুক্তি বা সাফল্য কামনার একাগ্র প্রার্থনায়। প্রায়ই বলতেন, 'কোনো বুধবার যদি হিলিং-এ আসতে না পারি তাহলে সেটাই যেন হয় পৃথিবীতে আমার শেষ দিন।' আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। ২৯ আগস্ট, ২০০৭ এমনি এক বুধবার বিকেলে হিলিং-এর জন্যে বাসা থেকে সেন্টারের উদ্দেশ্যে বেরিয়েও তিনি আসতে পারলেন না। কারণ সেদিন পথিমধ্যে দ্রুতগামী এক ট্রাকের চাপায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনি।

তিনি ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ূন কবীর। ৬৪ বছরের প্রাণোচ্ছল এক তরুণ। সদাহাস্য সদালাপী সদাচারী ও উচ্ছ্বসিত উপস্থিতিতে তিনি মাতিয়ে রাখতেন কোয়ান্টামের সব আসর। এত প্রাণবন্ত, এত মিশুক, এত হাস্যোজ্জ্বল একজন মানুষ তিনি ছিলেন যে, ফাউন্ডেশনে তার সহকর্মী ও স্নেহভাজনেরা এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, তিনি নেই। একেকটা প্রোগ্রামে গিয়ে কিছুক্ষণ

পরপরই মনে হচ্ছে এই বুঝি ছুটে এসে তার স্বভাবসুলভ দিলখোলা ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করবেন, 'আম্মু, কেমন আছ?', 'আব্বু, রেজাল্ট কেমন হলো?', 'আপা, জ্বরটা ভালো হয়েছে তো?'

হুমায়ূন কবীর ফাউন্ডেশনের সর্বস্তরের শত শত সদস্যের সাথে যেভাবে যোগাযোগ রাখতেন–জন্মদিন, বিয়েবার্ষিকী বা বিশেষ কোনো দিবসে শুভেচ্ছা জানাতেন–তার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। তিনিও পেতেন প্রচুর ফোন, এসএমএস বা চিঠি। পেতেন হিলিং ও দোয়া করার অনুরোধ।

অন্যদের প্রতি তার মনোযোগ কতটা গভীর, তা বোঝা যায় তার স্বজনদের কাছ থেকে পাওয়া একটি ফাইল থেকে, যাতে অন্যদের পাঠানো চিঠি এমনকি একটি ছোট চিরকুটও তিনি থরে থরে গুছিয়ে রেখেছেন। একবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক দায়িত্বশীল ওয়ার্কশপে গুরুজীর আহ্বানে তিনি মঞ্চে এসে সামনে বসা সারাদেশের দুই শতাধিক দায়িত্বশীলের নাম, পেশা ও পরিচয়ের বিস্তারিত বিবরণ একের একে বলে সবাইকে হতবাক করে দেন।

ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ূন কবীরের জন্ম চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ থানায় ১৯৪৩ সালে। উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর পারিবারিক কারণে তাকে কর্মজীবন শুরু করতে হয়। এর ফাঁকে ফাঁকে পড়াশোনা করে তিনি স্নাতক সম্পন্ন করেন, টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করেন।

১৯৬৫-তে যোগদান করেন তৎকালীন পাকিস্তান টিএন্ডটি ডিপার্টমেন্টে এবং ৩৮ বছরের সফল কর্মজীবন শেষে ২০০০ সালে টিএন্ডটি বোর্ডের একজন ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। আবৃত্তি, নাটক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তিনি ছিলেন সক্রিয়।

ফাউন্ডেশন ছিল তার আত্মার শেকড়। গুরুজী ও মা-জী ছিলেন তার পরম শ্রদ্ধেয় আত্মিক দিশারি। ১৯৯৪ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৩ ব্যাচে তিনি অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের মনছবি প্রক্রিয়াটি তাকে এতটাই আকৃষ্ট করে যে, নিয়মিত অনুশীলন করে তিনি নিজের ও অন্য অনেকের জন্যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেন।

দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে তার দুই কানে খুব সমস্যা ছিল। আমেরিকা, জার্মানির বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা মত দিয়েছিলেন, এ রোগ সারবার নয়। এমনকি অপারেশনেও ভালো না-ও হতে পারে। কিন্তু কোর্স করার পর ১২/১৩ বছর ধরে তিনি ভালো ছিলেন এবং ২০০৭ সালে বাম কানে সফল একটি অপারেশনও করান।

১৯৯৭ সালে কর্মক্ষেত্রে একটি বড় আর্থিক জালিয়াতির ঘটনা উদ্‌ঘাটন

করায় অভিযুক্তদের রোষের শিকার হন তিনি। সত্য সাক্ষ্যদান থেকে বিরত থাকার জন্যে প্রলোভন, ভয়ভীতি এমনকি আসামি করার হুমকিও দেয়া হয়েছিল তাকে। কিন্তু 'ইনশাল্লাহ আপনার কোনো ক্ষতি হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন'—গুরুজীর এই একটি অভয়বাণীকে সামনে রেখেই তিনি সত্যের পথে অটল থেকেছেন। অবশেষে ছয় বছর পর মামলার রায়ে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। অবিশ্বাস্য ব্যাপার ছিল, এই মামলার রায় হুবহু তা-ই হয়েছিল, যে মনছবি তিনি দেখেছিলেন!

স্ত্রী সুলতানা রাজিয়া বেগমকে নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ূন কবীর ছিলেন দেশ-বিদেশে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত পাঁচ ছেলে-মেয়ে, পুত্রবধূ-জামাতা, নাতি-নাতনী পরিবেষ্টিত এক সফল পরিবারের মধ্যমণি। পরিবারের সদস্য, আত্মীয় এবং প্রতিবেশী—সবার প্রতিই ছিল তার যথাযথ মনোযোগ, কর্তব্যবোধ আর বিপদে পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা। কিন্তু এর জন্যে উপকৃতের কাছ থেকে সমীহ, কৃতজ্ঞতা বা কোনো প্রতিদান পাওয়ার প্রত্যাশা তিনি করতেন না।

অবসরগ্রহণের পর ফাউন্ডেশনই হয়ে যায় তার ধ্যান-জ্ঞান। চট্টগ্রাম সেন্টারের সাইকি, আলোকায়ন ও হিলিং কার্যক্রমের প্রধান দায়িত্বশীল ছিলেন তিনি। খুব হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করতে পারতেন। সারাদেশের বিভিন্ন সেন্টার ও শাখায় সফর করে ছড়িয়ে দিয়েছেন কোয়ান্টাম চেতনার বাণীকে।

ফাউন্ডেশনের মাটির ব্যাংক কার্যক্রমের প্রতি ছিল ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ূন কবীরের অগাধ বিশ্বাস। ছোট-বড় সব কারণেই তিনি এতে দান করার সুযোগ নিতেন। সাফল্যও পেয়েছেন অজস্র। বিস্ময়কর হলো, মৃত্যুর আগে গত দুই মাসের মধ্যে তিনি তার সবরকম মানতের অর্থ যথাযথভাবে দিয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি এ অর্থগুলো যাতে ঠিকভাবে দিতে পারেন সেজন্যেও করেছিলেন আরেক মানত। সেটাও তিনি দিয়ে গেছেন।

আরো অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার হলো, চট্টগ্রাম সেন্টারে তার দেয়া হিলিং কেসগুলোর মেয়াদও সম্পন্ন হয়েছিল ঠিক যে বুধবার তিনি মারা গেলেন সেদিন। আর মৃত্যুর ঠিক এক মাস আগে তিনি লামা থেকে ফিরেছিলেন 'ছয়দুয়ারি'তে অংশ নিয়ে, আত্মিক জাগৃতির এক নবতর উপলব্ধি নিয়ে। এ যেন আগে থেকে জেনে-বুঝে সবকিছু গুছিয়ে, দেনা-পাওনা মিটিয়ে অনন্ত যাত্রায় পাড়ি জমানো।

ফাউন্ডেশনের এই দৃঢ় স্তম্ভ তার মেধা, শক্তি, সামর্থ্যের সবটুকু ঢেলে এ জীবনে স্রষ্টার নির্দেশনা অনুসারে তার পক্ষে যতটা করা সম্ভব তার সবটাই করে গেছেন। মৃত্যুতেও তিনি লাভ করেছেন শহীদী মর্যাদার সৌভাগ্য।



বিশিষ্ট স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ এবং ময়মনসিংহের কমিউনিটি বেজড মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ডা. নূরুল হক। প্রয়াত এই চিকিৎসক কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ময়মনসিংহ শাখার সূচনা ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

ডা. নূরুল হক ॥

জীবনের শেষ দিনটি কেটেছে যার সঙ্ঘের কাজে

২৮ অক্টোবর, ২০১১। একটি বিশেষ দিন। তিন বছরেরও বেশি সময় পর শ্রদ্ধেয় গুরুজী ময়মনসিংহে আসছেন স্থানীয় কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টারদের নিয়ে একটি মিনি-ওয়ার্কশপ পরিচালনার জন্যে। এরপর তিনি যাবেন 'জীবন আমার' কার্যালয়ে–ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে স্থাপিত দেশের একমাত্র মেডিটেশনভিত্তিক পরীক্ষামূলক মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রে।

ময়মনসিংহ শাখার সবার সাথে সাথে বহুদিন ধরে এ দিনটির জন্যে যিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন তিনি ডা. নূরুল হক–ময়মনসিংহ শাখার মোমেন্টিয়ার, ফাউন্ডেশনের একজন অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ দায়িত্বশীল। আজ থেকে নয় বছর আগে নিজ বাসভবনে সেল স্থাপনের মধ্য দিয়ে যিনি ময়মনসিংহে কোয়ান্টামের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির সূচনা করেছিলেন।

ময়মনসিংহে কোয়ান্টামের সেই বীজ আজ চারাগাছ থেকে পরিণত হতে চলেছে ফুলেফলে সুশোভিত এক পরিণত বৃক্ষে। সেল হয়েছে শাখা। গঠিত হয়েছে বেশ কয়েকটি প্রি-সেল। স্থাপিত হয়েছে ফাউন্ডেশনের প্রথম ব্যতিক্রমী উদ্যোগ 'জীবন আমার' মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র। আর এসব দেখতেই ময়মনসিংহে আসছেন গুরুজী।

ডা. নূরুল হকের জন্যে দিনটি অবশ্যই একটি বিশেষ দিন। তবে আরেকটি কারণে দিনটি যে তার পরিবার, সহকর্মী, রোগী ও তার সৎসঙ্ঘের সাথীদের কাছে চিরকালের জন্যেই বিশেষ হয়ে গেল তা কি তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন? নইলে সকালবেলায়ই গুরুজীর সাথে একান্ত সাক্ষাতে তিনি কেন মৃত্যু নিয়ে কথা বলবেন? কেন জানতে চাইবেন–প্রশান্ত মৃত্যু কেমন হওয়া উচিত?

গুরুজী তাকে বলেছিলেন, 'মৃত্যু তো এমনই হওয়া উচিত যে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বাসের জন্যে কাজ করতে করতে, সৎসঙ্ঘের সঙ্গীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এক প্রশান্ত পরিতৃপ্ত মৃত্যু।' কথাগুলো শুনতে শুনতেই তার চেহারায় খেলে গেল এক নির্ভার নিশ্চিন্ততার আভা।

আর এ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেই হয়তো শারীরিক-মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গেলেন তিনি। রাত ফুরোবার আগেই তেমনি এক মৃত্যুর হাত ধরে চলে গেলেন তার মহাজাগতিক সফরের পরবর্তী ধাপে।

পেশাজীবনে তিনি ছিলেন একজন প্রথিতযশা গাইনি বিশেষজ্ঞ। ময়মনসিংহের কমিউনিটি বেজ্ড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গাইনি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে রেখে গেছেন অগণিত গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মী। রোগিণীদের কাছে তিনি ছিলেন স্নেহময় এক পিতার মতো–যার কাছে সুচিকিৎসার ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন তারা।

খুব শান্তিপ্রিয় একজন মানুষ ছিলেন ডা. নূরুল হক। কখনো কারো সাথে ঝগড়া বা বিতর্কে লিপ্ত হন নি। বরাবরই বিনয়ী ও সদাচারী মানুষ হিসেবে তাকে চিনতেন সবাই। তার স্ত্রীর ভাষায়, 'জীবনে আমি কখনো তাকে রাগতে দেখি নি। আমি তার সাথে অনেকসময় রাগ করেছি কিন্তু সে কখনো রাগ করে নি। আমি সত্যিই ভাগ্যবতী যে, তার মতো অমায়িক, ধৈর্যশীল ও ভালো মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলাম।'

পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন চার ছেলেমেয়ের একজন সফল বাবা। তার বড় ছেলে আমেরিকায় পিএইচডি শেষে বর্তমানে ওখানকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। বড় মেয়ে ইংল্যান্ডে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত। ছোট মেয়ে মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষে পড়ছেন। আর ছোট ছেলে বুয়েটে অধ্যয়নরত।

পেশাজীবন, পারিবারিক জীবন, সাংগঠনিক জীবন–সবক্ষেত্রেই এক সফল মানুষ ছিলেন ডা. নূরুল হক। ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট স্ত্রী আলেয়া হকের অনুপ্রেরণায় ১৩৮ ব্যাচে ঢাকায় কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করেন তিনি।

কোর্সের প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, মনছবির এক বাস্তব উদাহরণ তার জীবন। নেত্রকোণার এক সাদামাটা পরিবারের একটি ছেলে, যে আজ একজন প্রথিতযশা চিকিৎসক–পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে তা সম্ভব হয়েছে কেবল এই মনছবির জোরেই।

কোর্স করার পর পরই তিনি উদ্যোগী হলেন ময়মনসিংহে কোয়ান্টামের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপনের। ২০০২ সালের আগস্টে তার বাসভবনেই স্থাপিত হলো ময়মনসিংহের প্রথম সেল। নিচতলার একটি ফ্ল্যাট ছেড়ে দিলেন ফাউন্ডেশনের জন্যে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও ধরলেন সেলের হাল। ধীরে ধীরে এ সেলকে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহে বিস্তৃত হতে থাকল কোয়ান্টামের কার্যক্রম। যার ফলে ২০০৮ সালে প্রথমবারের মতো ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হলো কোয়ান্টাম মেথড কোর্স।

এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি। ময়মনসিংহে কোয়ান্টামের কার্যক্রম এখন এগিয়ে যাচ্ছে এক স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে। আর এ সবকিছুর নেপথ্যে ছিলেন ডা. নূরুল হক। তার উৎসাহ, সহযোগিতা আর অভিভাবকত্ব না পেলে এসবের কোনোটাই হয়তো হতো না।

ডা. নূরুল হকের নেতৃত্বে কাজ করাটা ফাউন্ডেশনের যে-কারো জন্যেই ছিল একটি সুযোগ, একটি সৌভাগ্য। সহকর্মীদের যে-কোনো ভালো উপদেশ ও পরামর্শকে তিনি স্বাগত জানাতেন, মেনে নিতেন অবলীলায়। শুধু তা-ই নয়, অনুসারী হিসেবেও তিনি ছিলেন অনন্য। তার মতো বয়োজ্যেষ্ঠ, অভিজ্ঞ, প্রথিতযশা একজন মানুষ যেভাবে নবীন নেতৃত্বের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতেন তা সত্যিই বিরল। আর যে-কোনো নেতিবাচক কথা ও আচরণ থেকে তিনি ছিলেন একেবারেই মুক্ত।

যত ব্যস্তই তিনি থাকুন, ফাউন্ডেশনের জন্যে সময় বের করতে তার কোনো অজুহাত ছিল না। কেন্দ্রীয় কার্যক্রমে সস্ত্রীক অংশগ্রহণ করতেন। কেন্দ্র থেকে সাংগঠনিক সফরে কেউ ময়মনসিংহ গেলে নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে তাকে রিসিভ করতেন, খোঁজখবর নিতেন সারাক্ষণই।

জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়া সেবার মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন ডা. নূরুল হক। ছাত্রাবস্থায় সহপাঠী, বন্ধুরা কেউ বিপদে পড়লে সাহায্যের জন্যে ছুটে যেতেন। কেউ আর্থিক সমস্যায় পড়লে টিউশনি করে যে টাকা পেতেন তা থেকেই সাহায্য করতেন।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্র থাকাকালে একবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিপন্ন মানুষকে সহায়তার উদ্দেশ্যে সহপাঠীদের তিনি উদ্বুদ্ধ

করেন জুতা পালিশের কাজ করতে। সহপাঠীরা মিলে যখন জুতা পালিশ করছিলেন তখন সাধারণ মজুরির চেয়ে লোকেরা তাদের তুলনামূলক বেশি মজুরি দিয়েছিল মেডিকেল কলেজের ছাত্র বলে। সেই টাকা দিয়ে বিপদাপন্ন, অসহায় মানুষদের সাহায্য করেন নূরুল হক ও তার বন্ধুরা।

কোর্স করার পর থেকে ফাউন্ডেশনের সব ধরনের সেবামূলক কাজে তার ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। ময়মনসিংহে ফাউন্ডেশনের মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমটি মূলত পরিচালিত হতো তার তত্ত্বাবধানে এবং খতনা কার্যক্রমেরও প্রায় সবকটি তিনিই পরিচালনা করেন। এছাড়াও তিনি গ্রামের বাড়িতে সপ্তাহে একদিন ফ্রি চিকিৎসাসেবা দিতেন।

ডা. নূরুল হকের চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল রোগীর সার্বিক কল্যাণকামনার এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। তার রোগীদের মধ্যে গর্ভবতী মুসলিম মহিলাদের তিনি সুস্থ ও নেক সন্তান লাভে কোরআনের দোয়াটি বাংলা ভাষায় শিখিয়ে দিতেন; প্রাণায়াম ও অটোসাজেশন শিখিয়ে দিতেন, বিভিন্ন কণিকা উপহার দিতেন। নিজে রোগীদের জন্যে দোয়া করতেন, তাদের সাহস ও উৎসাহ জোগাতেন।

অনন্য মানুষ হওয়ার সৎসঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন ডা. নূরুল হক। আর নিঃসন্দেহে যে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি মহাজাগতিক সফরের পরবর্তী যাত্রা শুরু করেছেন, তা মিলে যায় কেবল অনন্য মানুষের মৃত্যুর সংজ্ঞার সাথেই– কোনো হা-হুতাশ নেই, রোগ-যন্ত্রণায় বিছানায় কাতরানো নেই; সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গুরুজীর সাথে একান্ত সময় কাটিয়েছেন, নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে গুরুজীকে পৌঁছে দিয়েছেন ওয়ার্কশপস্থলে, নিয়ে গেছেন 'জীবন আমার'-এ, সৎসঙ্গের সদস্যদের সাথে কাটিয়েছেন সারাদিন।

সেদিন সন্ধ্যার পর ফাউন্ডেশনের বৈদ্যুতিক লাইনে সমস্যা দেখা দিলে তিনি নিজেই মিস্ত্রি ডেকে এটি ঠিক করার ব্যবস্থা করেন। রাত ন'টার দিকে স্ত্রী মাথাব্যথার কথা বললে স্ত্রীর প্রেশার চেক করেন, তার মাথায় হাত রেখে দোয়া করেন। এরপর একজন প্রো-মাস্টার ফোন করলে তাকেও প্রয়োজনীয় চিকিৎসাপরামর্শ দেন। অর্থাৎ মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত সেবা দিয়ে গেছেন ডা. নূরুল হক। আর রাতে ঘুমুতে যাবার সময় একেবারেই ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন নিজের জৈবিক দেহটাকে। এর চেয়ে প্রত্যাশিত, এর চেয়ে সমর্পিত মৃত্যু আর কী হতে পারে!

পরম করুণাময় তাকে অনন্ত প্রশান্তি দান করুন।



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টিয়ার সাবিয়া সিদ্দিকী। প্রয়াত এই সংস্কৃতিকর্মী আমৃত্যু ছিলেন ফাউন্ডেশনের কাজে সক্রিয় ও একাত্ম।

সাবিয়া সিদ্দিকী ॥

সঙ্ঘে একাত্মতা যাকে দিয়েছে এক পরিতৃপ্ত মৃত্যু

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন-এর আর্ডেন্টিয়ার সাবিয়া সিদ্দিকী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট ও সংস্কৃতিকর্মী। ১৭ অক্টোবর, শুক্রবার বিকেলে সাবিয়া যাচ্ছিলেন কোয়ান্টাম মিডিয়া সেলের সাপ্তাহিক সাদাকায়নে। পথিমধ্যে শিকার হন এক আকস্মিক সড়ক দুর্ঘটনার। এর ঘণ্টা দেড়েক পরেই পার্থিব সব বন্ধন ছিন্ন করে তিনি পাড়ি জমান অনন্ত জীবনের পথে ...। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।*

২০১০ সালে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩০০ উচ্ছ্বাস ৯ ব্যাচে অংশ নেন সাংবাদিক সাবিয়া সিদ্দিকী। এরও বছরখানেক আগে থেকেই তিনি নিয়মিত আলোকায়ন কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছিলেন। কোর্স সম্পন্ন করার পর কোয়ান্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদপুর শাখা এবং কেন্দ্র ও মিডিয়া সেলে। হয়ে ওঠেন ফাউন্ডেশনের একজন অক্লান্ত স্বেচ্ছাকর্মী।

বছর দুই আগে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মিডিয়া সেল। শুরু থেকেই এতে সক্রিয় ও একাত্ম ছিলেন সাবিয়া। এ সেলটির যাত্রা শুরুর সময় থেকে যে-কজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করেন, তাদেরই একজন ছিলেন সাবিয়া।

বিভিন্ন পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল কার্যালয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোয়ান্টাম সভা আয়োজন, পরিচিত সাংবাদিক-সংস্কৃতিকর্মীদের কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করা, পরবর্তীতে যোগাযোগ করে ফাউন্ডেশনের সব কার্যক্রমের খবর তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া–এসব কাজের সূত্রে সাবিয়া হয়ে উঠেছিলেন ফাউন্ডেশনের একজন স্বতঃস্ফূর্ত কর্মী। সবার কাছের মানুষ। সেদিন দুর্ঘটনার খবরটি শোনামাত্রই তাই ফাউন্ডেশনের সদস্য আর মিডিয়া সেলের সহকর্মীরা ছুটে গিয়েছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, পরিবারের সদস্যরা পৌঁছনোরও আগেই।

মোহাম্মদপুরস্থ বাসা থেকে বেরিয়ে সেদিন বেলা সোয়া তিনটা নাগাদ সাবিয়া রামপুরা পৌঁছান। বনশ্রীতে ঢোকার মুখে রাস্তা পেরোনোর সময় একটি কাভার্ড ভ্যানের সাথে ধাক্কা লেগে ঘটে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

ঘটনাস্থলে ছিলেন একজন সহৃদয় তরুণ পথচারী শোভন দেবনাথ অরণ্য। তৎক্ষণাৎ সাবিয়াকে তিনি নিয়ে যান স্থানীয় একটি ক্লিনিকে। পরে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগে। ততক্ষণে দুর্ঘটনার খবর জেনেছেন তার সহযোদ্ধারা। সে-সময় সাবিয়ার সাথে ছিলেন সহকর্মী মো. মোস্তাক আহমেদ।

তিনি জানালেন, 'এত বড় একটা দুর্ঘটনা, কোমর থেকে শুরু করে শরীরের নিম্নাংশে এমন তীব্র জখম, কিন্তু সে তুলনায় সেদিন আশ্চর্যরকম শান্ত ছিলেন সাবিয়া। ব্যথার কথা নয়, শুধু দোয়া করতে বলছিলেন। তার মুখে ছিল কেবল একটি কথা–শোকর আলহামদুলিল্লাহ! গুরুজী ও সহকর্মীদের সবার কাছে দোয়া আর মাফ চাইছিলেন। যতক্ষণ বেঁচে ছিলেন, এক হাতে কোয়ান্টা ভঙ্গি করে শুধু এ কথাগুলোই বলছিলেন বার বার। ভাবলে অবাক হই, অসম্ভব শারীরিক কষ্ট নিয়েও তিনি সে-সময়টাতে সমর্পিত একজন মানুষের মতোই তার মনোবল ধরে রেখেছিলেন। এমন একটা দুর্ঘটনার পরও যে তিনি এত সময় বেঁচে ছিলেন, সবার কাছে দোয়া চাইতে পেরেছেন, মনে হয় যেন আল্লাহ ভালবেসে তাকে দিয়েছেন এ সময়টুকু।'

সবমিলিয়ে ফাউন্ডেশনে সাবিয়া ছিলেন খুব অল্প সময়। তুলনায় তার কাজের পরিমাণটি বেশ উল্লেখ করার মতো। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স, কেন্দ্রীয় আলোকায়ন কার্যক্রম, মিডিয়া সেলের সাদাকায়ন সর্বত্রই ছিল তার সদাহাস্যময় উপস্থিতি। আয়োজন করেছিলেন প্রায় গোটা তিরিশেক কোয়ান্টাম সভা। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বিটিভি, মাছরাঙা টেলিভিশন, বাংলা ভিশন, বিবিসি বাংলার সাংবাদিক-

কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত কোয়ান্টাম সভা যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। প্রক্রিয়া চলছিল এটিএন বাংলা ও চ্যানেল আই-তে সভা আয়োজনেরও।

সাবিয়ার সারাদিনের চিন্তাভাবনা আর ব্যক্তিজীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল তার সঙ্ঘচেতনা–গুরুজীর দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে ফাউন্ডেশনের কাজগুলোকে কীভাবে আরো এগিয়ে নেয়া যায়। যে-কোনো অনুষ্ঠানের আগে সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীদের তালিকা করে সবাইকে আহ্বান জানাতে তার উদ্যম ছিল ক্লান্তিহীন।

লামার কোয়ান্টামম-এ সাংবাদিক-সংস্কৃতিকর্মীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলো সফল করে তোলার ব্যাপারেও তার থাকত সক্রিয় ভূমিকা। কোয়ান্টামম-এ বেড়াতে গিয়ে সবাই হয়তো একসাথে খেতে বসে একটু গল্প করছে, কিন্তু দেখা যেত, সাবিয়া যথারীতি চুপ; কারণ খাওয়ার সময় গুরুজী মৌন থাকতে বলেন। গুরুজীর যে-কোনো নির্দেশনা পালনের প্রতি তার চেষ্টা ছিল এমনই অকৃত্রিম।

অভিনেত্রী মোমেনা চৌধুরী বললেন, 'ছোট-বড় সবার সাথেই ছিল সাবিয়ার একটা সহজ সম্পর্ক আর হৃদ্যতাপূর্ণ যোগাযোগ। অল্পদিনেই সবার কাছ থেকে একটা মমতা আদায় করে নিয়েছিল সে। নিজে ছিল চাপা স্বভাবের, কিন্তু সহকর্মীদের কার কী সমস্যা জেনে নিয়ে হিলিং-এ নাম দিত, অন্যদের কাছেও দোয়া চাইত। আর খুব ঠান্ডা মাথায় গুছিয়ে সব কাজ করার অভ্যেস ছিল ওর। আমার একক অভিনীত মঞ্চনাটক *লালজমিন*-এ নেপথ্য সঙ্গীতায়োজনে কাজ করত সে। এছাড়াও ভালো উচ্চাঙ্গ সংগীত গাইত। পরিকল্পনা করছিল সুর নিয়ে আরো বৈচিত্র্যময় কাজ করার। ফাউন্ডেশনের ভেতরে-বাইরে বিভিন্ন কাজের সূত্রে ওর সাথে আমাদের সম্পর্কটা ছিল এমন–হঠাৎই সবাই যেন একটা শূন্যতার মধ্যে পড়ে গেছি।'

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক ও *রুটস*-এর সম্পাদক মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামান বলছিলেন, 'সাবিয়া ছিলেন ফাউন্ডেশনের একজন দায়িত্ব-সচেতন কর্মী, ছিলেন সময়-সচেতন। আর সঙ্ঘের কাজ নিয়েই ছিল তার দিনমান ব্যস্ততা। কখন কীভাবে কাকে একটু সহযোগিতা করা যায়, সে জন্যেই ছিল তার যত নীরব চেষ্টা। দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ আগেও ফোনে একজনকে বলছিলেন আসন্ন কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিতে আর এক গ্রাজুয়েটের অসুস্থ মায়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিচ্ছিলেন, কয়েকদিন আগেই যার জন্যে কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে রক্তের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।'

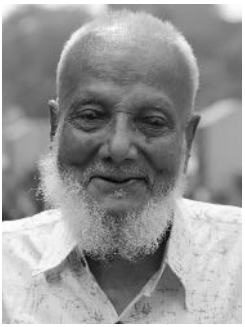
সঙ্ঘপ্রেম আর নিরবচ্ছিন্ন কর্মব্যস্ততাই সাবিয়াকে দিয়েছে পরিতৃপ্ত মৃত্যু।

শেষবার গোসল করানোর সময়ও তাই দেখা গেল–হাতটা রয়েছে সেই কোয়ান্টা ভঙ্গিতেই। আর চেহারায় কী অদ্ভুত প্রশান্তি! যেন ঘুমিয়ে আছেন, অপেক্ষা করছেন প্রিয় বন্ধুর সাথে কাঙ্ক্ষিত সাক্ষাতের।

জীবনে যেমন তিনি একাত্ম ছিলেন সঙ্ঘে, তেমনি মৃত্যুর সময়টাতেও এমনকি দাফন পর্যন্ত তাকে ঘিরে ছিলেন সৎসঙ্ঘের সদস্যরা–তার প্রিয় কোয়ান্টাম পরিবারের সহকর্মী ও সহযাত্রীরা। হৃদয়মথিত কান্না আর নিমগ্ন প্রার্থনায় তারা শেষ বিদায় জানিয়েছেন সাবিয়াকে।

পরম করুণাময় সাবিয়া সিদ্দিকীর সকল কাজকে সৎকর্ম হিসেবে কবুল করুন। পরবর্তী বহু যুগ ধরে ফাউন্ডেশনের সদস্যদের নিরন্তর কর্মপ্রেরণার উৎস ও এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবেন তিনি। ফাউন্ডেশনের সবার ৪০ দিনের ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক পর্যায়ের সকল সৎকর্ম তার অনন্ত শান্তির জন্যে উৎসর্গ করা হয়।

আমরা তার আত্মার অনন্ত প্রশান্তি ও কল্যাণ কামনা করি।



কোয়ান্টাম পরিবারের বর্ষীয়ান সদস্য ও আর্ডেন্টিয়ার মরহুম এস এম হাবিবুর রহমান। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩২৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

এস এম হাবিবুর রহমান ॥

কোয়ান্টাম ছিল তার তারুণ্যের উৎস

বয়স আশির ঘর পেরিয়ে গেছে। চলাফেরা কিংবা কর্মোদ্যম দেখে তা বোঝার কোনো জো নেই। ভোরবেলা নিয়ম করে হাঁটতে বেরোন। লাঠিতে ভর দিয়ে নয়, স্বাভাবিক মানুষের মতোই স্বচ্ছন্দ তার মর্নিং ওয়াক। নিজে এগিয়ে গিয়ে পরিচিত হন অন্যদের সাথে। কিছুটা পরিচয় হতেই নিঃসংকোচে আহ্বান জানাতেন, 'কোয়ান্টামে আসুন। আপনিও আমার মতো সুস্থ থাকবেন'।

ব্যস্ত ঢাকা শহরের ভিড়ভাট্টার ভেতরে পাবলিক বাসে চড়ে অনায়াসে যাতায়াত করেন–কারো সাহায্য ছাড়াই। তার চেয়ে বয়সে ঢের কনিষ্ঠরা যখন অসুখবিসুখ আর ব্যথা-বেদনায় আক্রান্ত হয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন, তিনি তখন মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেশের নানা প্রান্তে।

এতটাই প্রাণোচ্ছল ছিলেন কোয়ান্টাম পরিবারের নিবেদিতপ্রাণ ও বর্ষীয়ান সদস্য এস এম হাবিবুর রহমান। গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৫ তিনি পাড়ি জমান মহাজাগতিক সফরে। ৮২ বছর বয়সেও তার সুস্থতা ও তারুণ্যের মূল রহস্য ছিল সঙ্ঘের সাথে একাত্মতা।

দীর্ঘদিন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনে (বিএডিসি) সুনামের সাথে কাজ করার পর ১৯৯২ সালে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ

করেন। ২০০০ সালে ধরা পড়ে, তার হৃৎপিণ্ডের ভালভ নষ্ট হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে চলাফেরা করার শক্তি হারিয়ে ফেললেন। একপর্যায়ে পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। অন্যদের সহায়তা ছাড়া কোনো কাজই করতে পারেন না আর। একদিন তার মনে হলো রোগী পরিচয় নিয়ে গ্লানিময় এই জীবন তিনি যাপন করতে চান না। ঝুঁকিপূর্ণ হলেও অপারেশন করানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তার আত্মবিশ্বাস ছিল যে, তিনি আবার সুস্থ হবেন। স্বাভাবিক মানুষের মতো বাঁচবেন।

অপারেশনের পর তার দৃঢ় মনোবল ও রিকভারি রেট চিকিৎসকদেরও বিস্মিত করল। শারীরিক অসুস্থতার ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলেন। কিন্তু মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ২০১১ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের নাম শুনে সাপ্তাহিক উন্মুক্ত কার্যক্রম আলোকায়নে অংশ নিতে এসে মুগ্ধ হলেন। পরের মাসেই কোয়ান্টাম মেথডের ৩২৭ ব্যাচে অংশগ্রহণ করলেন। সেই থেকে কোয়ান্টামই ছিল তার ধ্যান জ্ঞান।

গুরুজীর পরিচালনায় ফাউন্ডেশনের প্রতিটি অনুষ্ঠান এবং কোয়ান্টামের সব ধরনের কার্যক্রমে তার সপ্রতিভ উপস্থিতি ছিল নিয়মিত ঘটনা। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা সকাল ন'টায়, তিনি চলে আসতেন সকাল সাতটায়।

ঢাকার প্রোগ্রামগুলো তো বটেই, ঢাকার বাইরে গিয়েও কোর্স রিজুভিনেশন অংশ নেন কোয়ান্টাম পরিবারের এই অশীতিপর সদস্য।

তার মৃত্যুর একমাস আগে শুরু হয় গুরুজীর পরিচালনায় দেশব্যাপী ধ্যানসন্ধ্যার আয়োজন। এই সংবাদ জানতে পেরে এস এম হাবিবুর রহমান তার বয়স, শীতের প্রকোপ সবকিছু উপেক্ষা করে নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরে অনুষ্ঠিত ধ্যানসন্ধ্যায় উপস্থিত হন। তার এই তারুণ্যময় জীবনযাপন দেখে অনেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে ভর্তি হয়েছেন।

সঙ্ঘের প্রতি তার ভালবাসা ছিল নিঃস্বার্থ। আর তাই কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরাও তাকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। তরুণদের সাথে পরিচিত হওয়ার সময় নিজের পরিচয় হিসেবে বলতেন, 'আমি ইয়ং ম্যান।'

আসলেই তা-ই। মনের দিক থেকে যে তরুণ ও কর্মচঞ্চল সে-ই তো প্রকৃত তরুণ। জীবনযাপনের ব্যাপারে কোয়ান্টাম যে দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে, তা যথাযথভাবে অনুসরণ করে এস এম হাবিবুর রহমান মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবন্ত ও শারীরিকভাবে সুস্থ একজন মানুষ। সত্য ও কল্যাণের যে বাণী তাকে উদ্দীপ্ত করেছে, নিরলসভাবে তা তিনি প্রচার করে গেছেন অন্যদের মাঝে।

জীবনের লক্ষ্যকে পরিষ্কার রাখুন।
সবসময় বিশ্বাস করুন–
বড় কিছু করার জন্যে
আপনি পৃথিবীতে এসেছেন।
বিশ্বাসের আলোকে
কর্মপন্থা রচনা করুন।
ঝর্নার গতিময়তায় কাজ করুন।
সাফল্য আপনার পদচুম্বন করবেই।

সাফল্যগাথা

কাজের জন্যে যখন রক্ত
ঘাম হয়ে ঝরে
তখনই সম্ভব হয়
আপাত অসম্ভব।
কষ্টকর কাজ সম্পাদন করেই
আমি অমরত্ব লাভ করব।

৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট নাজমা নিহার চৈতী। তার একমাত্র কন্যা নাহিয়ান বুশরা শৈশবে দৃষ্টিশক্তি হারায়। অদম্য প্রচেষ্টায় তিনি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের কৃতী শিক্ষার্থী। তার এ অর্জনের প্রতিটি ধাপে নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়েছে মায়ের বিশ্বাস ও হার না-মানা মনোভাব।



বিশ্বাসই আমাকে দিয়েছে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি

নাজমা নিহার চৈতী

ছোটবেলা থেকেই ব্যতিক্রম বা স্পেশাল জিনিসগুলো পাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে কাজ করত সবসময়। ঈদের জামা-জুতো থেকে শুরু করে ফুলগাছের টব, এমনকি বিয়ের শাড়িটাও।

বিয়ের বছরখানেক পরেই একটা ফুটফুটে কন্যা সন্তানের মা হই। ১৩ মাস বয়সে আমার মেয়ে বুশরা মেনিনজাইটিস-এ আক্রান্ত হয়। প্রায় দুসপ্তাহ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর বোঝা গেল, সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। অথচ ওর দৃষ্টিশক্তি আগে এতটা প্রখর ছিল যে, ছোট্ট পিঁপড়া তুলে নিয়ে সে মুখে পুরে দিত। মনে মনে বলতাম, এত ছোট জিনিসটার দিকেও তোমার চোখ যায়! আমার সেই সুস্থ স্বাভাবিক শিশুটি হয়ে গেল স্পেশাল চাইল্ড, সবার থেকে আলাদা একজন। হঠাৎই অন্যরকম হয়ে গেল আমার চেনা পৃথিবীটাও।

মেয়ের চিকিৎসার জন্যে ছুটতে লাগলাম এদিক-ওদিক। আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে একটাই প্রত্যাশা–বুশরা একদিন আবার দেখতে পাবে। নিয়মিত শিশুবিকাশ কেন্দ্রে যেতাম ওর চেক-আপের জন্যে। একদিন এক মাকে দেখলাম ১২ বছরের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে এসেছেন! কী সমস্যা জানতে

চাইলে তিনি ঝরঝর করে কেঁদে বললেন, 'ও কিছুই পারে না। চোখে দেখে না, কানে শোনে না, হাঁটতে পারে না, কথা বলতে পারে না, এমনকি ক্ষুধা লাগলে বোঝাতেও পারে না। আমি খাইয়ে দিলে খায়।' বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হলো, স্রষ্টা আমাকে কত ভালো রেখেছেন! আমার মেয়ে তো এরকমও হতে পারত। তারপর আর বৃথা চেষ্টা করি নি বাচ্চাকে বার বার চিকিৎসা করানোর, সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিলাম সব সীমাবদ্ধতাকে পাশ কাটিয়ে সন্তানকে গড়ে তোলার দিকে।

মিরপুরের একটা ব্লাইন্ড স্কুলে গেলাম বুশরাকে ভর্তি করানোর জন্যে। ওদের ক্লাস টিচারকে দেখে চমকে উঠলাম, পুরো শরীর এসিডে ঝলসে গেছে। তিনিই স্কুলের প্রথম শ্রেণির বাচ্চাদের ব্রেইল পদ্ধতি শেখান। অন্য যে-কোনো স্বাভাবিক বাচ্চা তাকে দেখলে ভয় পায়, কিন্তু ব্লাইন্ড স্কুলের বাচ্চারা তাকে খুবই পছন্দ করে। তিনি এত মমতা দিয়ে পড়ান যে, বাচ্চারা খুব দ্রুত ব্রেইল শিখে যায়।

মেয়ের সুবাদে ওই স্কুলে আমি ১০ বছর কাটিয়েছি, আমার মনে হয়েছে, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মানুষটা হলেন তিনি। এভাবে আমিও নতুন করে জীবনকে অনুভব করতে শুরু করলাম আমার মেয়েটার সাথে সাথে।

সে-পর্যন্ত আমার পথচলায় যত প্রতিকূলতা এসেছে, সর্বাবস্থায় শুধু শুকরিয়াই আদায় করেছি। সবসময় কেমন এক দৃঢ়তা আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়েছে। স্কুলে অন্য অভিভাবক যারা আসতেন তাদেরকেও আমি সাহস দিতাম, উদ্বুদ্ধ করতাম।

কিন্তু একটা সময় দেখা গেল, আমি নিজেই চারপাশের মানুষ, এমনকি আপনজনদের কাছ থেকেও কটুকথার শিকার হতে হতে খেই হারিয়ে ফেলছি। এদিকে আমার মেয়েটাও বয়সের সাথে সাথে বুঝতে লাগল, ও আর সবার মতো নয়। ওর অনেক প্রশ্নের কোনো উত্তর আমি খুঁজে পেতাম না। ভেতরে তাই সারাক্ষণ একটা যুদ্ধ চলছিল।

দিনের পর দিন ঘুম হতো না। এমনও হয়েছে, টানা তিন মাস রাতে ঘুমাই নি। আমার মধ্যে আচরণগত সমস্যা দেখা দিল। কাউকে সহ্য হচ্ছিল না। মানুষ দেখলেই ভয় পেতাম, কুঁকড়ে যেতাম–নিশ্চয়ই এরা আমাকে কিছু একটা বলতে এসেছে, অপমান করতে এসেছে। কাছের মানুষেরা দূরে সরে যেতে লাগল।

একটা সময় নিজেই উপলব্ধি করলাম, আমি যদি অসুস্থ থাকি, আমার পরিবার, তিন ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, বেড়ে ওঠা সবকিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই নিজ উদ্যোগেই গেলাম মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। ডাক্তার ওষুধ দিলেন, ঘুমের সমস্যা কেটে গেল। কিন্তু ওষুধের প্রভাবে সবসময় একটা ঝিমুনি ভাব থাকত। দৈনন্দিন কাজগুলো ভালোভাবে করতে পারতাম না।

সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিল–চারপাশের মানুষ আমাকে মানসিক রোগী বলতে লাগল। আমি যেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে বড় অপরাধ করে ফেলেছি! প্রচণ্ড অবসাদ আর বিষণ্নতায় ভুগতে শুরু করলাম। পরিপূর্ণ সুস্থ হওয়ার এবং ওষুধ-নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে লাগলাম। সময়টা খুব কঠিন ছিল। মনে হতো ধূ ধূ মরুভূমিতে আমি একা।

এর মধ্যে আমার ছোট ভাই কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করল। অনেকটা জোর করেই সে আমাকে পরের ব্যাচে ভর্তি করাল। আমি কোর্স করার পর আমার স্বামী আর বুশরাও কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়।

কোর্সের চার দিন পর আমি অনুভব করলাম, চারপাশের মানুষের প্রতি আমার যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল, সেটা আর নেই। সবাইকে ক্ষমা করে দিতে পারছি। মনে হচ্ছিল, আমার ভেতর থেকে সব ধুয়েমুছে আমি এক নতুন মানুষ হয়ে উঠেছি।

ডাক্তারকে বললাম, আমি মেডিটেশন করছি, আর কি ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন আছে? তিনি উল্টো নিরাশ করে বললেন, মেডিটেশন সুস্থ মানুষদের জন্যে, আপনার জন্যে না। কিন্তু তার কথায় আমি একটুও দমে যাই নি। নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা শুরু করলাম এবং নিজেই চেষ্টা করে ক্রমান্বয়ে দু-একটা করে ওষুধ কমাতে লাগলাম। একসময় বেরিয়ে এলাম ১০ বছরের ওষুধ-নির্ভরতা থেকে।

তবে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হলাম নিয়মিত সাদাকায়ন ও আলোকায়নে গিয়ে। বিশ্বাস করতে লাগলাম, সবাই নেতিবাচক নয়, কিছু ভালো মানুষও আছেন। ওষুধ ছাড়ার মূল অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে ফাউন্ডেশনে আমার এই লেগে থাকাটা।

নিজের সুস্থতার ক্ষেত্রে যেমন সঙ্ঘকে পেয়েছি প্রতিমুহূর্তে, তেমনি আমার মেয়ের পড়ালেখার সাফল্যের ক্ষেত্রেও সঙ্ঘই আমাকে শক্তি জুগিয়েছে সবসময়। স্রষ্টার অপার করুণায় আমার মেয়েটা স্কুলে বরাবরই প্রথম হয়েছে। এসএসসি পাশের পর আরেকটা সাফল্যের অধ্যায় হলো ওর কলেজে ভর্তি।

দেশের স্বনামধন্য দুটো কলেজে মেধাতালিকায় সে সুযোগ পায়। কিন্তু একটি কলেজে বলে দিল, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্যে কোনো সুযোগ তাদের ওখানে নেই। কিন্তু ভিকারুননিসা নূন কলেজে শিক্ষকদের আন্তরিকতা

আমাকে বিস্মিত করল। তারা বললেন, ও যদি বোর্ড থেকে পাশ করতে পারে তাহলে আমাদের কলেজে কেন পড়তে পারবে না?

সেদিন চোখভরা জল নিয়ে ভাবছিলাম, আমার মনছবিটা স্রষ্টা এভাবে সত্যি করে দিলেন! মেয়েকে প্রতিদিন সেগুনবাগিচা থেকে মিরপুর স্কুলে আনা-নেয়ার পথে ভাবতাম, বাসার কাছে ভিকারুননিসার মতো এত ভালো স্কুল, আমার মেয়ে যদি আর সবার মতো হতো তাহলে নিশ্চয়ই ও এখানে পড়ত। এই ভাবনা কখন যে মনছবিতে রূপ নিয়েছে বুঝি নি।

কলেজ পাশের পর দানা বাঁধল নতুন স্বপ্ন–আমার মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। আমি ফরমও তুললাম শুধুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। কেমন একটা দৃঢ়তা কাজ করছিল যে, আমার মেয়ে পড়লে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়বে, নইলে পড়বে না। বুশরার বান্ধবীরা, চারপাশের মানুষেরা আমার একথা শুনে হাসত। কিন্তু আমি বিশ্বাসে অটল ছিলাম যে, স্রষ্টা চাইলে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

সত্যিই তিনি আমাদের প্রচেষ্টা আর প্রার্থনা কবুল করলেন। বুশরা এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়েছে। ওর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি, পরীক্ষা, রেজাল্ট–এ পুরো সময়টাতে কোয়ান্টাম পরিবারের সবাই আমাদের জন্যে দোয়া করেছে, উৎসাহ জুগিয়েছে। সেইসাথে নিয়মিত হিলিং-এ নাম দিয়েছি। মাটির ব্যাংকে দান করেছি।

শুধু পড়ালেখাতেই নয়, খেলাধুলাসহ সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোতেও ওর আগ্রহের কমতি নেই। ১০ বছর বয়স থেকে বুশরা ছায়ানটে গান শেখে। শিশুদের চার বছরের কোর্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। এখন পড়ছে নজরুল সংগীতে চতুর্থ বর্ষে।

ওর সাফল্যের পথ এতটা সহজ ছিল না। বহু প্রতিকূলতা এসেছে। কিন্তু কোয়ান্টামে আসার পর থেকে আমি কখনোই আর নেতিবাচক হই নি, বিশ্বাস হারাই নি। সবসময় মনে হয়েছে, গুরুজীর দোয়া আছে, সঙ্ঘের দোয়া আছে। ভালো কিছু হবেই।

যে-সময় ব্যর্থতায় তলিয়ে যাচ্ছিলাম, চারপাশের নেতিবাচক মানুষদের তখন আনন্দিত হতে দেখেছি। ভীষণ অন্ধকারে একটু আলো খুঁজেছি, কাউকে পাশে পাই নি। সেই আলোর সন্ধান পেয়েছি কোয়ান্টামে। পেয়েছি সুস্থতা, প্রশান্তি ও অগণিত কল্যাণকামী মানুষের একটা বড় পরিবার। আমি শিখেছি–চারপাশের মানুষের করুণা নিয়ে নয়, সত্যিকারভাবে বাঁচতে হলে নিজের সুস্থতার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে আর একাত্ম থাকতে হবে সৎসঙ্ঘে।



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সফল শিক্ষার্থী তোহফাতুর রাব্বি পিয়াল। জন্ম থেকেই যার চোখে আলো নেই, সেই ছেলেটিই আজ বিশ্বাস ও কর্মের আলোয় উজ্জ্বল করে চলেছে তার পরিবার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৬৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

প্রত্যয়ী ও মনোযোগী মানুষ যে-কোনো কিছু অর্জন করতে পারে

তোহফাতুর রাব্বি পিয়াল

আমার চোখের সমস্যা যখন ধরা পড়ে বাবা-মা প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি কোন পদ্ধতিতে পড়ালেখা করাবেন আমাকে। দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ালেখা করি। এরপর আমার বাবা-মা মূলধারার স্কুলে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। চট্টগ্রামের নামকরা স্কুলগুলোতে যোগাযোগ করা শুরু করলেন তারা। তাদের সাথে ছিলেন আমার মামা ও আবদুস সামাদ স্যার–যার কাছে আমার হাতেখড়ি। তিনিই আমাকে ব্রেইল পদ্ধতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

সব স্কুলই বিভিন্ন অজুহাতে অপারগতা প্রকাশ করল। প্রকৃত কারণ হলো, যেহেতু আমি অন্যদের মতো চোখে দেখি না, তাই তারা তাদের স্কুলে পড়ার সুযোগ আমাকে দেবে না।

আমি প্রচণ্ড হতাশ হয়ে পড়লাম। একপর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলাম–আর পড়াশোনাই করব না। মানসিকভাবে একেবারে হয়তো ভেঙেই পড়তাম যদি না বাবা-মা মনোবল না যোগাতেন। কখনোই তারা আমাকে বুঝতে দেন নি যে, অন্যদের চেয়ে আমি আলাদা। তারা বলতেন, জীবনে অনেক সমস্যা আসবে আর সেটাকে অতিক্রমের শক্তিও তোমার মাঝেই রয়েছে।

এর মাঝে জানতে পারলাম চিটাগাং পুলিশ লাইন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হতে পারব–যদি পুলিশ কমিশনারের বিশেষ অনুমতি পাওয়া যায়। আমার অভিভাবকরা দেখা করতে গেলেন। তৎকালীন পুলিশ কমিশনার এককথাতেই রাজি হয়ে গেলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকও আগ্রহভরে কাছে টেনে নিলেন। নতুন করে পথচলা আরম্ভ হলো। কিন্তু দুটো চ্যালেঞ্জ দেখা দিল।

মাধ্যমিকের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ব্রেইল পদ্ধতির বই পাওয়া যাচ্ছিল না। একটি প্রতিষ্ঠান দিতে রাজি হলো। কিন্তু দাম চাইল ৭০ হাজার টাকা। কয়েক দফা দেন-দরবার করার পর শেষ পর্যন্ত ৪০ হাজার টাকায় বইগুলো সরবরাহ করে তারা।

পাঁচ মাস পর বই তো পেলাম কিন্তু রাইটার পাব কোথায়! যে-সব শিক্ষার্থী চোখে দেখে না, তাদের পরীক্ষা দেয়ার পদ্ধতি আলাদা। পরীক্ষার হলে আমাদের সাথে একজন রাইটার থাকে। তার কাজ হলো প্রশ্ন পড়ে শোনাবে। প্রশ্ন শুনে আমি যে উত্তর বলব তা সে খাতায় লিখবে। তবে নানা রকম শর্ত পূরণ করে রাইটার পেতে ভীষণ বেগ পোহাতে হয়। যেমন রাইটারকে হতে হবে আমার চেয়ে অন্তত দুই ক্লাস জুনিয়র।

কিন্তু ক্লাস সেভেনের কাউকে রাইটার হিসেবে নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী একজন শিক্ষার্থীর হয়ে লেখা যে একটি ভালো কাজ, এই মানবিকতাবোধটি তার মাঝে তখনো তৈরি হয় নি। যদিও বা কাউকে পাওয়া যায়, দেখা গেল তার বাবা-মা রাজি নন। আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিভাবক আসলে এ ব্যাপারে সচেতন নন। এ কথাগুলো এজন্যেই বলছি যে, প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের হাজার হাজার শিক্ষার্থী আমার মতো একই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

শেষমেশ আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে এক ছেলেকে রাইটার হিসেবে নিয়ে আসা হলো। ইংরেজি পরীক্ষার দিন টের পেলাম আমার উত্তর লিখবে কী, সে প্রশ্নপত্রই ঠিকমতো পড়তে পারছে না। যা হওয়ার তাই হলো। প্রথম সাময়িকী পরীক্ষায় দুটো বিষয়ে ফেল করলাম। একের পর এক বাধা পেয়ে জেদ চেপে গেল। ভালো রেজাল্ট আমাকে করতেই হবে।

এই সময়ে শুভাকাঙ্ক্ষী এক বড় ভাই এগিয়ে এলেন। তার নাম শেখ মুনতাসীর হোসাইন। বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় তিনি ক্যাসেটে রেকর্ড করে দিতেন। পরে এই অডিও ফাইল শুনে শুনে বিষয়টি আয়ত্ত করতাম। এমনও হয়েছে যে অনেক পড়া জমে গেছে। ভাইয়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়াচ্ছেন আমাকে। সৌভাগ্যক্রমে ভালো একজন রাইটারও (আরিফুর

রহমান) পেয়ে গেলাম। এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্টে দেখা গেল, আল্লাহর রহমতে সবগুলো বিষয়ে এ+ পেয়েছি। আমার স্বপ্ন সত্যি হলো।

চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হলাম। এবার দেখা দিল নতুন বিপত্তি। চড়া দাম দিয়ে হলেও মাধ্যমিকের বই পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ব্রেইলে রচিত উচ্চ মাধ্যমিকের বই কোথাও পেলাম না।

বই ছাড়াই প্রস্তুতি নিতে হলো। ভরসা কেবল অডিও ফাইল। এ গ্রেড পেয়ে এইচএসসি পাশ করার পর প্রশ্ন জাগল, উচ্চশিক্ষার জন্যে কী বেছে নেব। আবদুস সামাদ স্যার সবসময় উৎসাহিত করতেন আমি যেন আইন নিয়ে পড়ি। আমি তেমন একটা আগ্রহ পেতাম না।

কিন্তু ভর্তি প্রস্তুতির সময় মনে হলো আইন পেশায় গিয়েও তো মানুষের সেবা করা সম্ভব যদি কারো সদিচ্ছা থাকে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে পড়ার সুযোগ পেলাম।

যথারীতি সামনে হাজির হলো পুরনো সমস্যা। ব্রেইলে রচিত বই বাংলাদেশে নেই। অনেক টাকা খরচ করে অর্ডার দেয়ার তিন মাস পর আসে সেই বই। মনে হলো, অন্য শিক্ষার্থীরা তো অনেক দ্রুত পড়ে ফেলে। তাদের সাথে কীভাবে তাল মেলাব আমি।

মাথা খাটিয়ে বের করে ফেললাম সমাধান। বই স্ক্যান করে ল্যাপটপে নিই। তারপর বিশেষ সফটওয়্যার সেটি রিড আউট করে। এভাবেই চলছে আমার আইন অধ্যয়ন। ফার্স্ট ক্লাস মার্কস পেয়ে আসছি।

তবে শুধু ভালো গ্রেড পাওয়াই একজন শিক্ষার্থীর মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত না। সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ মেধাবিকাশে অত্যন্ত সহায়ক বলে আমি মনে করি। আইন শিক্ষার্থীদের 'মুট' নামে একটি প্রতিযোগিতা হয়। সত্যিকারের আদালতের অনুরূপ আবহ তৈরি করা হয়। দুটি দল নির্দিষ্ট বিষয়ে এডভোকেসি করে।

দ্বিতীয় বর্ষে উঠে ইচ্ছা হলো আমিও মুটার হবো। একবছর প্রস্তুতি নেয়ার পরে অংশ নিলাম একটি প্রতিযোগিতায়। প্রেজেন্টশন খুব ভালো হলেও বেশ কয়েকটা বড় ভুল ছিল আমাদের। হেরে গেলাম। সবাই খুব হতাশ হয়ে গেল। তবে আমি হাল ছাড়ি নি। মনে হলো, আগামী প্রতিযোগিতাগুলোতেও যাব। হয়তো আবার হারব। তবে হারেরও তো শেষ আছে। একদিন নিশ্চয়ই উঠে দাঁড়াব।

কিছুদিন পর চট্টগ্রামের নামকরা সব বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে 'ব্লাস্ট' একটি মুট প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট তিনটি

দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন ডিপার্টমেন্টের স্যাররা। মুটার হিসেবে একটি দলে আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করলেন তারা।

আল্লাহর রহমতে আমাদের দলটি চ্যাম্পিয়ন হয়। যখন পুরো প্রতিযোগিতার বেস্ট এডভোকেট হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করা হলো ভীষণ আনন্দ হলো। সেই আনন্দের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এই বিজয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছি আরো বড় অর্জনের। আগামী মাসে ভারতে হিউম্যান রাইটস বিষয়ক একটি আর্ন্তজাতিক মুট প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাচ্ছি।

এতকিছু করার সাহস পাচ্ছি, কারণ কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। কোয়ান্টাম আমাকে শিখিয়েছে–আত্মবিশ্বাস যদি থাকে ও মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারি তাহলে যে-কোনো কাজ আমি করতে পারব।

আগে স্বপ্ন দেখতাম বহুজাতিক কোম্পানিতে লিগ্যাল কাউন্সেলর হিসেবে কাজ করব। এখানে এসে উপলব্ধি করেছি মানুষের জন্যে কাজ করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। আমি সেটাই করব।

বর্তমানে জাতিগত সংঘাতের দরুন পৃথিবীজুড়ে শরণার্থী সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। সে-সব ঘরহারা অসহায় বঞ্চিত মানুষগুলোর সেবায় আমি আমার জ্ঞানকে কাজে লাগাতে চাই। লক্ষ্য অনেক বড় হলেও আমি আশাবাদী যে, গন্তব্যে পৌঁছতে পারব।



বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও 'বাঁচতে শেখা'র প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক এঞ্জেলা গোমেজ। ১৯৯৯ সালে তিনি এশিয়ার নোবেলখ্যাত র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কারে ভূষিত হন। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৪২ ব্যাচে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

সমাজের কল্যাণে ভালো মানুষদের একত্রিত করতে হবে

এঞ্জেলা গোমেজ

তখন আমরা যশোরে থাকি। গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করার পর সে-সময়টাতে আমি সিস্টারদের সাথে যশোরের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে যেতাম।

একদিন দেখি এক মহিলাকে তার স্বামী মাছ ধরার কোঁচ দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করছে। মেয়েটার গা থেকে রক্ত ছিটকে ছিটকে পড়ে দেয়ালে গিয়ে লাগছে। মেয়েদের ওপরে এরকম নানা নির্যাতনে এক অব্যক্ত কষ্ট অনুভব করতাম। ভীষণ অপমানিত বোধ করতাম। মনে হতো এই আঘাত যেন আমাকে করা হচ্ছে। সিস্টাররা এসব নির্যাতিত মহিলাদের ওষুধ দিতেন, সেবা দিতেন। কিন্তু আমি ভাবতাম–এই ওষুধ দেয়া, মালিশ দেয়া তো কোনো সমাধান নয়। এর কি কোনো সমাধান হতে পারে না?

গ্রাজুয়েশনের পর সিদ্ধান্ত নিলাম, এই অসহায় মহিলাদের জন্যে কিছু করব। কিন্তু সিস্টারদের কনভেন্টে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করাটা কঠিন। আবার অবিবাহিত মেয়ে হিসেবে সমাজের চোখরাঙানি তো আছেই। এদিকে বাবাও বললেন, এখন আমার বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি শুধু জীবন থেকে একটা বছর চাই। একবছর পরে আমি ঠিক করব, আমি নান হবো, নাকি বিয়ে করব, নাকি চাকরি করব।

শুরু হলো আমার নতুন করে পথচলা। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরতাম। মেয়েদের যে কী নিদারুণ কষ্ট দেখেছি! মানুষের সীমাহীন অভাব দেখেছি। সবসময় শুধু ভাবতাম–এই অভাব, দারিদ্র্য, নির্যাতন কী করে সমাজ থেকে দূর করা যায়।

খুব অল্প সময়ে গ্রামে গ্রামে মেয়েদের সাথে সখ্য গড়ে উঠল। মেয়েরা আমার কাছে কাজ চাইত। দরিদ্র মেয়েদের আয়ের পথ করে দেয়ার জন্যে পাটের দড়ি দিয়ে ম্যাট বানানোর কাজ শিখলাম, হস্তশিল্পের কাজ শিখলাম।

পরবর্তীতে সেরিকালচার বোর্ডে কাজ শেখার সুযোগ পেলাম। অনেক ধরনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে মেয়েরা কাজ শিখতে লাগল। বিচ্ছিন্নভাবে নানা জায়গায় ঘুরে কাজ করে যাচ্ছিলাম।

আমাদের কাজ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল ১৯৮১ সালে। নাম দেয়া হলো *বাঁচতে শেখা*। মেয়েদের স্বনির্ভরতা আর সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই *বাঁচতে শেখা*-র সকল কার্যক্রম। মেয়েদের হস্তশিল্পের কাজ বাইরে বিক্রি হতে লাগল। আমরা আয় করতে শুরু করলাম। আমাদের হস্তশিল্পের কাজ জাতীয় প্রতিযোগিতায় চার বার প্রথম হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দিতে লাগলাম মেয়েদের। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতন করতে গান রচনা করে তাদের শেখাতাম, নাটক করতাম, ফলে সহজে বোঝাতে পারতাম। সমাজের স্বার্থান্বেষী মানুষ নানারকম অপপ্রচার চালিয়ে গেছে সবসময়। আমি কখনো ভয় পাই নি। সবসময় মনে হয়েছে, আমি তো অন্যায় কিছু করি নি। কে কী বলল তাতে কখনো প্রভাবিত হই নি। কখনো প্রতিশোধ নেয়ার কথাও ভাবি নি।

বর্তমানে প্রায় ৪০টি অফিস নিয়ে বাংলাদেশের হাজারেরও বেশি গ্রামে *বাঁচতে শেখা* কাজ করে যাচ্ছে। আমরা লিগ্যাল এইড আর হিউম্যান রাইটস নিয়ে কাজ করছি। গ্রামে গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী অধিকার ও স্বনির্ভরতা সৃষ্টিতে কাজ করছি। যদি হিসেব করতে যাই তাহলে এ-পর্যন্ত অন্তত এক কোটি মানুষকে আমরা বিভিন্নভাবে সেবা দিতে পেরেছি।

এত কাজ করা সত্যিই দুঃসাধ্য হয়ে যেত যদি নিজেদের একটা জায়গা না থাকত। আজও মনে পড়ে এই জায়গা কেনার ঘটনা। আমাদের কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে চাইত না। অনেক খুঁজে একটা পরিত্যক্ত বাড়ি ভাড়া নিলাম। যেখানে শুরু হলো আমাদের কার্যক্রম। হঠাৎ শুনি এই জায়গা বিক্রি হয়ে যাবে। আর আমাদের কাছেও জায়গা কেনার মতো কোনো টাকাপয়সা নেই। মেয়েরাও তখন আমাকে বলতে লাগল আমরা কি জায়গাটা কিনতে পারি না?

মনে সাহস আর বিশ্বাস নিয়ে ঢাকায় গেলাম বাড়ির মালিকের কাছে। ভদ্রমহিলা মুসলিম এবং বিধবা, তাকে সবকিছু খুলে বললাম। উনি সব শুনলেন, কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন প্রায় আধাঘণ্টা পরে। আমার হাতে এই ১৭ বিঘা জায়গার দলিল তুলে দিয়ে বললেন, তুই এটা নে। জমির টাকা তুই কিস্তিতে শোধ করবি তোর সুবিধামতো। সম্ভব হলে আমি তোর কাছ থেকে কোনো টাকাই নিতাম না। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্যে টাকার প্রয়োজন।

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। তার পা ধরে বসে থাকলাম অনেকক্ষণ। বর্তমানে *বাঁচতে শেখা*-র মূল অফিস এ জায়গাটাতেই। আমি বিশ্বাস করি, সমাজে এরকম ভালো মানুষ অনেকেই আছেন এবং তাদের একত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে সমাজের কল্যাণেই। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সেই প্রয়োজনীয় কাজটিই করছে।

কোয়ান্টাম কোর্স সম্পর্কে একটি কথাই আমি বলতে পারি–'অসাধারণ'। প্রশান্তিময় একটি পরিবেশ এখানে সবসময় বিরাজমান। 'মানুষ শ্রেষ্ঠ'–চারদিনের কোর্সের মাধ্যমে এ কথাটিই গুরুজী আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। আমাদের উপলব্ধি করাতে চেয়েছেন।

মানুষের ব্রেনে হাজার হাজার কোটি নিউরোন রয়েছে। তারপরও আমরা ব্রেনকে কাজে লাগাচ্ছি না, আমরা জেগে উঠতে পারছি না–এটিই গুরুজী আমাদের দেখিয়ে দিতে চাচ্ছেন যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, আমরা অভাবী নই, আমরা নির্বোধ নই। আমরা বুদ্ধিমান। আমাদের সম্পদ ও সম্ভাবনার কোনো অভাব নেই।

আমি এখানে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। আমি গুরুজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, কারণ এ কোর্সের মাধ্যমে আমি আরো অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমরা প্রতিটি মানুষই যেন এভাবে এগিয়ে যাই।

আমি মনে করি, ধ্যান হলো স্রষ্টাকে উপলব্ধি করার প্রকৃত পথ। তাই ধ্যান ও কোয়ান্টামের বাণীকে যদি সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে সমাজে এত হিংসা লোভ হানাহানি থাকবে না। এটা এমন এক প্রক্রিয়া যে, মানুষকে ভালো হয়ে যেতেই হবে।

আমি খুব আশ্চর্য হয়ে দেখেছি, কোয়ান্টামে কোনো ধর্মবর্ণের ভেদাভেদ নেই। অথচ মানুষ ধর্ম নিয়ে কত বিবাদ করে! কোনো ধরনের কুপ্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে কাজ করতে পারবে না যদি সে এই জ্ঞানকে রপ্ত করে, অনুসরণ করে।

আমার খুব ভালো স্মরণশক্তি ছিল। কিন্তু একটা সময় দেখলাম, আমি অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার কিছুদিন পরে আমাকে নিয়ে লেখা একটা কবিতা খুব মন দিয়ে পড়লাম মাত্র একবার, মুখস্থও করি নি। কদিন পর হঠাৎ সেই কবিতার কথা ভাবতেই দেখলাম, পুরো কবিতাটা আমার মনে আছে! আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম নিজের এই স্মরণশক্তি দেখে।

কোয়ান্টাম রোগ নিরাময়ে বার বার বিশ্বাসের কথা বলেছে, যা আমি নিজের জীবনেও দেখেছি। আমার যখন ক্যান্সার ধরা পড়ল ততদিনে সেটা সেকেন্ড স্টেজ পার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এতে আমার কর্মোদ্দীপনায় ভাটা পড়ে নি একেবারেই। আমি ভীত হই নি; কারণ আজকে মরলেও মরব, কালকে মরলেও মরব। সবসময় হাসিখুশি থেকেছি। কেমোথেরাপি নেয়ার পর খুব বমি করতাম, তারপরই হেসে দিতাম।

এই সময়টাতে আত্মপর্যালোচনা করেছি যে, সারাজীবন কারো ক্ষতি করেছি কিনা, কখনো লোভ করেছি কিনা। আমি অনেকের ঘর গড়ে দিয়েছি, অনেক মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। এটা আমার একটা আনন্দ, যা আমাকে সে-সময় বেশ সাহস জুগিয়েছে। ভেবেছি, সারাজীবন যে-রকম হেসে হেসে কাজ করেছি তেমনি হেসে হেসে মরব। ক্যান্সার তাই আমার কিছু করতে পারে নি। ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি প্রশান্ত মন নিয়ে, সাহসিকতার সাথে।

একটা বছর দেখতে চেয়েছিলাম যে, সমাজের জন্যে মানুষের জন্যে কিছু করতে পারি কিনা। তারপর এক বছর করে করে পেরিয়ে এসেছি অনেকটা পথ। এমন একটা সমাজ গড়ার স্বপ্নে কাজ করে গেছি, যেখানে মানুষ সম্মানের সাথে বেঁচে থাকবে। আমি বিশ্বাস করি, কোয়ান্টামের সাথে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা ও একাত্মতা এরকম সুন্দর একটা সমাজ গড়তে এবং পৃথিবীতে শান্তি আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।



প্রখ্যাত লালন সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন। গত চার দশক ধরে শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ফকির লালনের বাণী ও সুরকে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে তার অবদান বহুল স্বীকৃত। সংগীতে বিশেষ অবদানের জন্যে একুশে পদকসহ দেশে-বিদেশে বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন তিনি। বিশিষ্ট এ সংগীতব্যক্তিত্ব কোয়ান্টাম মেথডের ৩৬৮ ব্যাচে অংশ নেন।

লালনের মানবপ্রেমের বাণীর মর্মার্থ উপলব্ধি করেছি কোয়ান্টামে এসে

ফরিদা পারভীন

গান নিয়ে আমার জীবনে রয়েছে অসংখ্য স্মরণীয় ঘটনা আর আনন্দের স্মৃতি। ১৯৮৪ সালে একবার সুইডেন গিয়েছি, রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে। সুইডেনের রানী আমাদেরকে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমি সেখানে লালনের একটা গান করলাম–*খাঁচার ভিতর অচিন পাখি...*। আমি গাইছি, আর রানী হাউমাউ করে কাঁদছেন। অনুষ্ঠানে অন্য সবার চোখও অশ্রুসিক্ত।

আমি খুব অবাক হলাম, রানী তো আমার গানের ভাষা বুঝতে পারছেন না। গানটা শেষ হলে তিনি কেবল একটা কথাই বললেন, 'আমি ওর ভাষা জানি না। কিন্তু ওর গায়কি আর সুরের যে অতল গভীরতা–তাতে আমার মনে হলো, ওর কণ্ঠের মধ্যে ঈশ্বর বাস করছেন। ওর সুরের মধ্যে একটা কষ্ট লুকিয়ে আছে, যা আমার কষ্টের সাথে মিলে গেছে।'

ছোটবেলা থেকেই গানের প্রতি আমার গভীর প্রেম। আমি যখন খুব ছোট, আমার মা ঘুম-পাড়ানোর সময় গুনগুন করে গান শোনাতেন। সেই থেকেই বুঝি গানটা আমার ভেতরে ঢুকে গেছে। গান সবসময় আমার মুখে লেগেই

থাকত। পড়ছি, খেলছি, কোনো কাজ করছি, কিন্তু সুরটা ভেতরে আছেই।

আমার বয়স তখন চার/ পাঁচ বছর, আমরা মাগুরায় থাকি। পার্শ্ববর্তী কয়েকটা বাড়িতে হারমোনিয়াম আছে, তার সুর আমাকে খুব টানে। একরাতে আমাকে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এক বাড়িতে হারমোনিয়াম বাজছে, আর আমিও আত্মবিস্মৃত হয়ে ওই রাতের বেলা ঝোপঝাড়-জংলা পেরিয়ে ওদের জানালার কাছে গিয়ে চুপচাপ শুনছি।

এদিকে, কোথাও খুঁজে না পেয়ে মা ঠিকই বুঝলেন–ওদিক থেকে হারমোনিয়ামের শব্দ আসছে, আমি ওখানেই গেছি। বাবাকে পাঠালেন। দেখা গেল, আমি যথারীতি ওখানেই!

একসময় মনে হলো, আমি তো গান ভালবাসি, একটা হারমোনিয়াম পেলে কত ভালবেসেই না বাজাতাম! কিন্তু আমার হারমোনিয়াম নেই। ভীষণ অভিমান হলো। বাবাকে বললাম, একটা হারমোনিয়াম আমার চাই-ই চাই। ওটা না পাওয়া পর্যন্ত আমি পড়াশোনা খাওয়া গোসল কিছুই করব না। অগত্যা কী আর করা! বাবা কলকাতা থেকে যন্ত্রপাতি আনিয়ে কারিগর দিয়ে একটা হারমোনিয়াম বানিয়ে দিলেন। যদিও আমি তখন এতই ছোট যে, হারমোনিয়ামের একদিক ধরলে অন্য দিকটার নাগাল পাই না।

সেই হারমোনিয়ামটা আমার এখনো আছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাড়ি থেকে চলে যেতে হয়েছিল, তখন সাথে আর কিছুই নিই নি, শুধু হারমোনিয়ামটা ছাড়া। একসময় মাটির নিচে পুঁতেও রেখেছিলাম, ওটা দেখে পাকিস্তানি মিলিটারি যদি আবার আমাকে রেডিওতে গান গাইতে নিয়ে যায়, সেই ভয়ে!

শৈশবে আমি নজরুলগীতি করতাম। পাশাপাশি আধুনিক গান, উচ্চাঙ্গ সংগীতেরও চর্চা ছিল। '৬৮ সাল থেকে রাজশাহী বেতারের তালিকাভুক্ত নজরুল সংগীতশিল্পী হিসেবে গান করেছি। দেশাত্মবোধক গানও করতাম, যার মধ্যে *এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদী তটে...* গানটি আজও খুব জনপ্রিয়।

বাবার ছিল বদলির চাকরি। একসময় আমরা কুষ্টিয়ায় এসে স্থায়ী হলাম। কুষ্টিয়াকে তখন বলা হতো বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎসবে গাইতাম। কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ায় ছিল লালন সাঁইজির আখড়া। তার জীবদ্দশায় প্রতিবছর দোল পূর্ণিমাতে সব শিষ্যদের নিয়ে তিনি একটি মহাসমাবেশ করতেন, সেটাই এখন লালন মেলা হিসেবে পরিচিত।

১৯৭৩ সালের কথা। আমি তখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি। সে বছর লালন মেলায় গান করার প্রস্তাব পেলাম। আমার খুব একটা আগ্রহ ছিল না, তবু

বাবার উৎসাহে গাইতে রাজি হলাম। কিন্তু লালনের গান গাওয়ার আগে তো শিখতে হবে। মোকছেদ আলী সাঁইয়ের কাছে তালিম নিতে শুরু করলাম, তিনি আমাকে একটা গানই শেখালেন–*সত্য বল সুপথে চল, ওরে আমার মন/ সত্য সুপথ না চিনিলে পাবিনে মানুষের দরশন ...*।

উৎসবের দিন গানটা গাইলাম। শ্রোতারা সবাই খুব পছন্দ করলেন। অনুরোধ করলেন আরো গাইতে। ওদের বললাম, 'লালনের এই একটা গানই আমি শিখেছি, পরের বছর আরো শিখে এসে গাইব'। সংগীতের সাথে আমি কোনো প্রতারণা করতে চাই নি, তাই সত্য কথাটাই সহজভাবে বললাম– লালনের আর কোনো গান আমি জানি না।

সেদিন অনুষ্ঠানে যখন লালনগীতিটা গাইছিলাম, এর কথাগুলো আমাকে খুব আলোড়িত করছিল। একটা শিহরণ অনুভব করছিলাম। কেউ যেন আমার ভেতর থেকে বলছিল–'তুমি এই গানই করো'। রাতে বাড়ি ফিরে, ঘুমুতে গিয়েও মনের মধ্যে সেই একই অনুরণন, একই ইঙ্গিত–'তুমি লালন সাঁইজির গান করলে ভালো করবে, এটাই করো।'

আজ মনে হয়, এর সবই বুঝি পরম করুণাময়ের ইচ্ছা। এ হয়তো তাঁরই অভিপ্রায় যে, আমি লালনের গান করব। কারণ, একটি গানই আমি শিখলাম, তার কথাগুলো আমাকে এতটা প্রভাবিত করল! সেই থেকে আমি মূলত লালনের গানই করছি।

সাঁইজির গান গেয়ে আমি পেয়েছি আমার দেশের মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা আর সম্মান। এছাড়াও ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর বহু দেশে লালনের গান করেছি, নানা বর্ণের নানা ভাষার অগণিত মানুষ তন্ময় হয়ে শুনেছেন তার গান। আমি চেষ্টা করেছি মাত্র, বাকিটা স্রষ্টার করুণা।

আমার এক জাপানি ছাত্রীর আমন্ত্রণে একাধিকবার জাপানে গিয়েছি। সেখানে ওরা *ফরিদা পারভীন প্রজেক্ট কমিটি* নামে একটি কার্যক্রম শুরু করেছে, যার আওতায় জাপানের বিভিন্ন শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি লালনের গান শুনিয়েছি, লালন-দর্শনের বৈচিত্র্যময় দিক নিয়ে কথা বলেছি।

এর স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৮ সালে আমাকে *ফুকুওকা এশিয়ান কালচার অ্যাওয়ার্ড*-এ ভূষিত করা হয়, যা এর আগে পেয়েছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আমজাদ আলী খান, নুসরাত ফতেহ আলী খানের মতো প্রখ্যাত সংগীত-ব্যক্তিত্বরা।

লালনের গানে আছে মানবপ্রেমের কথা, ক্ষমার দৃষ্টিভঙ্গি, আছে আত্মশুদ্ধির প্রেরণা–কোয়ান্টামে এসেও আমি এই চিরায়ত সত্য আর

আলোকিত জীবন-দর্শনের প্রতিধ্বনি খুঁজে পেলাম। গুরুজীর কথায় আমি খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের পুরোটা সময় দেখেছি, গুরুজী প্রতিটি দিন সময়মতো সবকিছু করেছেন। আমার মনে হলো, তিনি যেন আমাদের বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, মানুষের জীবনে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস– লালন যেমন বলেছেন, *সময় গেলে সাধন হবে না...*।

সহজ মানুষ, ভজে দেখনারে মন দিব্যজ্ঞানে/ পাবি রে অমূল্যনিধি বর্তমানে ॥/ ভজ মানুষের চরণ দু'টি/ নিত্যবস্তু হবে খাঁটি/ মরিলে সব হবে মাটি/ ত্বরা এই ভেদ লও জেনে। কোয়ান্টামে এসে লালনের এ কথাগুলোর মর্মার্থ আমি বার বার উপলব্ধি করেছি। আসলে 'সহজ' মানুষ হওয়াটা কিন্তু অনেক কঠিন। কোয়ান্টামের শিক্ষা এই কঠিন কাজটিকেই অনেক সহজ করে দিতে পারে।

অদম্য জীবনযাত্রী ফয়সাল রহমান। শৈশবে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় চলাফেরার শক্তি হারালেও তিনি থেমে যান নি। এগিয়ে চলেছেন একের পর এক বাধা জয় করে। পড়াশোনা, পেশা, সংগঠন সবদিকেই তার সাফল্য উল্লেখযোগ্য। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বনির্ভরতায় এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ঝালকাঠিতে গড়ে তুলেছেন প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা। বিভিন্ন সময়ে জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক এবং জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে পুরস্কৃত হন তিনি। বর্তমানে ঝালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা-র নির্বাহী প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। অক্লান্ত কর্মোদ্যমী ফয়সাল কোয়ান্টাম মেথডের ৩৫৬ তম ব্যাচে অংশ নেন।



আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছব

ফয়সাল রহমান

১৯৮৭ সাল। আমি তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। স্কুল থেকে ফেরার পথে একদিন এক আকস্মিক ট্রেন দুর্ঘটনার শিকার হই। আঘাত পাই মাথায়, মেরুদণ্ডে। শরীরের নিচের দিকটা ধীরে ধীরে প্যারালাইজড হতে শুরু করে।

সময়টা ছিল ভীষণ কঠিন। চলৎশক্তি হারিয়ে দুঃসহ বিষণ্নতায় ভুগছিলাম। একা একটা অন্ধকার ঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতাম দিনরাত। টানা নয় মাস সূর্যের আলো দেখি নি। আলো চোখে পড়লে, মানুষ দেখলে চিৎকার-চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তুলতাম। মা ছাড়া আর কেউ আমার ঘরে ঢুকতে পারত না।

যেদিন প্রথম হুইল চেয়ারে বসলাম, মনে হয়েছিল পৃথিবীটা কী সুন্দর! তারপর দেশে-বিদেশে চিকিৎসার পর ১৯৮৮ সালে সিআরপি-তে ভর্তি হই। আমাদের সাত জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী নিয়ে সাভারে একটা ছোট্ট টিনের ঘরে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

সিআরপি-র প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়ক মহীয়সী ভ্যালরি টেইলরের মাতৃস্নেহময় শুশ্রূষা পেলাম ওখানে। সেই স্নেহ আজও অটুট আছে। তিনি বেশ সাহস দিতেন। একসময় বললেন, তুমি আবার পড়াশোনা শুরু করো।

মা আর স্কুলের প্রধান শিক্ষক কাজী ইমদাদুল হকও পড়াশোনা শুরু করতে উৎসাহ দিলেন। স্যার বললেন, হতে পারে তুমি হুইল চেয়ারে

চলাফেরা করো, কিন্তু তোমার দ্বারা অনেক বড় কিছু করা সম্ভব।

হেলেন কেলার, আইনস্টাইন, হোমারের উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, শৈশবে এদের সবারই নানারকম সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি ও কাজ দিয়ে তারা সেটি জয় করেছেন। তুমিও পারবে। তারপর তিনি নিজেই একদিন স্কুলে নিয়ে গেলেন।

স্কুলে অন্যদের মতো পায়ে হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে ক্লাসে যেতে পারতাম না। রেলিংয়ের ওপর হাতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে অনেক সময় নিয়ে উঠতে হতো। ফলে প্রায়দিনই হাতের নিচের নরম চামড়া ছিলে যেত। বাড়ি ফিরলে মা সেখানে মলম লাগিয়ে দিতেন আর কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, তোমার আর স্কুলে যাওয়া লাগবে না। এত কষ্ট করার দরকার নেই। আমার যা সম্পত্তি আছে, তোমাকে দিয়ে যাব। ভালোভাবে খেয়ে-পরে চলতে পারবে। এখন না হয় আমি দেখছি, আমি মারা গেলে তোমাকে কে দেখবে?

কিন্তু আমার মনে হতো, কেন আমি পারব না? চেষ্টা তো করে দেখি। একটা জেদ কাজ করত সবসময়–আমাকে পড়াশোনা করতে হবে। আমার জীবন গড়ে নিতে হবে আমাকেই। তাই কখনোই বলি নি–আমি পারব না।

আমার আত্মবিশ্বাস দেখে সহপাঠী-বন্ধুরাও কখনো বলে নি যে, তুমি পারবে না। আর মা সবসময় একটা কথা বলতেন, আমি তোমার জন্যে দোয়া করি, তুমি একদিন অনেক বড় হবে। মা-র এ কথাটা আমাকে প্রতিনিয়ত শক্তি জোগায়। একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছব।

১৯৯৮ সালে মা মারা যান। তখনই আমি জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খাই। এর আগে মা-ই ছিলেন আমার সব। হঠাৎই তাকে হারিয়ে রীতিমতো দিশেহারা হয়ে যাই আমি।

এর আগে অবশ্য আমি প্রথম বিভাগে এসএসসি, তারপর এইচএসসি এবং ঢাকা কলেজ থেকে সমাজবিজ্ঞানে অনার্স, মাস্টার্স করেছি। পরবর্তীতে বিএড, এমএড, এলএলবি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ সম্পন্ন করি। আরো দুটো মাস্টার্স করেছি শিশু-বিকাশ ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে। বর্তমানে পিএইচডি করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রে।

অংশ নিয়েছি শতাধিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে। জেন্ডার, ডিজ-অ্যাবিলিটি, এইচআইভি ইত্যাদি বিষয়ে আমি নিজেও প্রশিক্ষণ দেই এবং সৃজনশীল পদ্ধতিসহ আরো কিছু বিষয়ে আমি একজন মাস্টার ট্রেইনার।

এছাড়াও পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং পরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছি। মাঝে একবার বিসিএস

লিখিত পরীক্ষা পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়েছিলাম, ইচ্ছে ছিল প্রশাসন ক্যাডারে যোগ দেবো, মৌখিক পরীক্ষায় গিয়ে তা আর হয় নি।

২০০০ সালে ভ্যালরি টেইলরের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ শুরু করি। সবার সহযোগিতায় গড়ে তুলি প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা। আমার বিশ্বাস, একটুখানি সুযোগ করে দিলে প্রতিবন্ধীরা নিজেরাই নিজেদের জীবন গড়ে নিতে পারে। সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আর তারা তো সমাজেরই অংশ, কেন তাদেরকে নিয়ে কেউ ভাববে না?

এ সংগঠনের সদস্যরা আমাকে তাদের পরিবারের সদস্য বলেই মনে করে, আমার ওপর তাদের অভূতপূর্ব আস্থা। বছর কয়েক আগে সড়ক দুর্ঘটনায় কিছুটা আহত হয়েছিলাম। একজন প্রতিবন্ধী, যার পা নেই, তিনি হাতের ওপর ভর দিয়ে আট মাইল পথ হেঁটে আসেন আমাকে দেখতে!

ওদের এই ভালবাসাটা আমি সবসময় অনুভব করি। আর এ কাজটা আমি করি সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে, যদিও বিভিন্ন প্রকল্পে আমার জন্যে বেতন নির্ধারিত থাকে; তবু নিই না, যেহেতু সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করি।

২০০৬ সাল থেকে ঝালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি। একসময় বিভিন্ন জায়গায় বদলির কারণে সংগঠনের কাজে অসুবিধা হচ্ছিল। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম চাকরি ছেড়ে দেবো।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে একটা অনুষ্ঠানে কথাটা জানালে তিনি বিশেষভাবে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি চাকরিটা করো, ছেড়ো না। এমনিতেই আমাদের সমাজে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, প্রতিবন্ধীদের কোনো কাজ দিলে তারা সেটা করতে পারে না। তুমি চাকরি ছেড়ে দিলে এ ভুল ধারণাটাই আরো প্রতিষ্ঠিত হবে।'

সেই থেকে শিক্ষকতা এবং এর পাশাপাশি সংস্থা-র কাজ করে যাচ্ছি। আমার এ নানামুখী কর্মকাণ্ডে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্মতা আমাকে উদ্যম যোগায়। ২০১৩ সালে ঝালকাঠির তৎকালীন জেলা প্রশাসক অশোক কুমার বিশ্বাস ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এ কে এম সোহেল স্যারের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সহযোগিতায় আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিই। জীবনের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা তারপর থেকে অনেক প্রসারিত হয়েছে। ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে আমার খাদ্যাভ্যাস ও সামগ্রিক জীবনাচারে।

মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড ব্যথা আর ঘুমের সমস্যার কারণে একসময় প্রচুর ওষুধ খেতে হতো। মরফিন, প্যাথেডিন পর্যন্ত নিতাম। এছাড়াও শারীরিক কিছু অসুবিধার কারণে প্রতিদিনই এন্টিবায়োটিক খেতে হতো। কিন্তু নিয়মিত

মেডিটেশন শুরু করার পর থেকে এযাবৎ কোনো ওষুধ খাই নি, এমনকি একটা প্যারাসিটামলও নয়। এখন আমি সত্যিই আগের চেয়ে অনেক সুস্থ ও কর্মময় জীবনযাপন করছি।

এখন সবসময় শুকরিয়া অনুভব করি ভেতর থেকেই। মনে হয়, স্রষ্টার কাছ থেকে প্রতিনিয়ত কত যে আনুকূল্য পাচ্ছি! আজ স্বপ্ন দেখি যে, আমি হাঁটছি, হেঁটে ফাউন্ডেশনের কাজ করছি। হেঁটে হেঁটে কোয়ান্টামের কল্যাণবাণী পৌঁছে দিচ্ছি মানুষের কাছে।

আর আমি বিশ্বাস করি, ফাউন্ডেশন আজ যেভাবে সমাজের দুস্থ বঞ্চিত নিগৃহীত মানুষের জন্যে ভাবছে, কাজ করে যাচ্ছে, প্রতিবন্ধীদের সুস্থ কর্মময় স্বনির্ভর জীবনযাপনের জন্যেও একদিন ঠিক সেভাবে ভাববে। উদ্যোগী হবে। গ্রহণ করবে সুচিন্তিত ও কার্যকর পদক্ষেপ। যাতে প্রতিবন্ধীরাও একদিন অনুভব করতে পারেন যে, তারাও মানুষ। সবকিছুতেই তাদেরও রয়েছে সমান অধিকার।



ড. সরকার আমিন। বাংলা একাডেমির উপ-পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরাধিকার'-এর তিনি সহযোগী সম্পাদক। এছাড়াও কবিতা প্রবন্ধ স্মৃতিকথা অনুবাদ মিলিয়ে তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০টিরও বেশি। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৬১ ব্যাচে অংশ নেন।

তরুণদের জীবনকে আনন্দময় করে মেডিটেশন

ড. সরকার আমিন

বছর দশেক আগের কথা। যুক্তরাজ্য প্রবাসী একজন কবি-বন্ধু একটি বই উপহার দেন আমাকে। লাওৎ'স-এর *তাও তে চিং*। হঠাৎ ইলেকট্রিকের ভেজা তারে হাত পড়লে যে দশা হয়, বইটি পড়তে গিয়ে আমার অবস্থা হলো তা-ই। আমি পুরোপুরি সম্মোহিত হয়ে গেলাম। এত সুন্দর কথা, এ-তো সব আমার কথা! মনে হলো, লাওৎ'স আমার ওপর ভর করেছেন। বইয়ের কথাগুলো যেন তিনি বলছেন না, বলছি আমি!

ধারণা করা হয়, আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে প্রাচীন চীনে লাওৎ'স-এর আবির্ভাব ঘটে। অনেকের মতে, তিনি ছিলেন মহান চীনা-দার্শনিক কনফুসিয়াসের সমসাময়িক। লাওৎ'স শব্দের অর্থ 'বৃদ্ধ-তরুণ'। তিনি ছিলেন এক সহজসরল নির্ভেজাল জীবনবোধের প্রবক্তা। অন্তর্গত সজ্ঞা আর হৃদয়বোধ দিয়েই কেবল অনুভব করা যায় তাঁর 'তাও' দর্শনকে।

'তাও' দর্শনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে অন্তরে প্রশান্তি অর্জন। দেহের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে এসে একটি আসক্তিমুক্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা। আর সে-লক্ষ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, সুস্থির, সমাহিত চিত্ত রচনা করাই 'তাও' দর্শনের মূল কথা। 'তাও' মানুষকে জীবনের দিকে উদ্বুদ্ধ করে।

একসময় সিদ্ধান্ত নিলাম, বইটি অনুবাদ করব। যেই ভাবা সেই কাজ। সবমিলিয়ে আমি তখন ভীষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম–রাস্তায় হাঁটছি, অফিসে কাজ করছি, বাজার করছি–প্রতিনিয়ত বইটা আমার মনের ভেতর ঘুরছে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে আমার অনুবাদে *দর্শন-কাব্য তাও তে চিং ॥ সহজিয়া পথ* নামে বইটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়।

আড়াই হাজার বছর আগে প্রচারিত তাও দর্শনের কথাগুলো আজকের দিনের সাথেও অদ্ভুতভাবে সাযুজ্যপূর্ণ। যেমন, বইটির এক জায়গায় আছে–*দেশ ডুবে গেলে নৈরাজ্যে, জন্ম নেয় দেশপ্রেম।* এর চেয়ে আশার কথা আর কিছু হতে পারে না। অর্থাৎ দেশে যখন এক সর্বগ্রাসী নৈরাজ্য আর অস্থিরতার কাল শুরু হয় তখন কোথাও না কোথাও একদল মানুষ জেগে ওঠে, তারা তৈরি হয়, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আলোকিত জীবনের স্বপ্ন দেখে আর সে লক্ষ্যে কাজ করে চলে নীরবে।

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে–*নিয়ন্ত্রণ করো তোমার আকাঙ্ক্ষাকে, তাহলে তুমিই সবচেয়ে ধনী লোক*। এদিক থেকে তাও দর্শনের সাথে বুদ্ধবাণী ও ইসলামের সুফিবাদী ধারার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে লাওৎ'স-এর বইটি যে আমাকে এতখানি প্রভাবিত করেছে, সেটি একদিনে হয় নি। এর অনেক আগেই একজন সত্যিকারের বড়মাপের সাধক আমার ভেতর সুফিবাদের বীজটি বপন করে দিয়েছিলেন।

সময়টা সম্ভবত ১৯৯৫ সাল। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ স্যার একদিন বললেন, আমাকে তার পীরের কাছে নিয়ে যাবেন। মনে অনীহা, কিন্তু স্যারকে 'না' বলার সাহস নেই, তাই গেলাম।

মতিঝিলের একটা অফিস। বেশ বড়সড় একটা এসি রুমে ঢুকলাম। কিন্তু পীর কোথায়? সুদৃশ্য সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে রিভলবিং চেয়ারে বসে আছেন একজন চকচকে কৃষ্ণবর্ণ মানুষ। পরনে কালো জোব্বা, মাথায় ঈষৎ রূপালি কারুকাজ করা টুপি। স্মিত স্বর্গীয় হাসিতে তিনি আমাদের স্বাগত জানালেন। জানলাম, ইনিই স্যারের পীর। খুব অবাক হলাম।

তিনি হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৈনপুরী। আমার দেখা এক আলোকিত দার্শনিক ও সুফিবাদী পীর। তিনি মূলত সাধক। কিন্তু নিজে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কোনো দান-দক্ষিণা গ্রহণ করেন না। ইন্টারন্যাশনাল বুক এজেন্সি নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। *টাইম, নিউজউইক, ইকনোমিস্ট*-এর মতো বিশ্বখ্যাত সব সাময়িকীগুলোর এদেশে

সোল-এজেন্ট তিনি। কর্মময় জীবন তার, প্রতিদিন মোটর-সাইকেল চালিয়ে অফিসে যান। যদিও তার বয়স তখন একশর কাছাকাছি, কিন্তু দেখে মনে হয় বড়জোর ৬০।

প্রথম আলাপেই তাকে আমার খুব ভালো লেগে গেল। তিনিও খুব স্নেহ করতেন আমাকে। অগাধ ছিল তার পাণ্ডিত্য আর জ্ঞানের পরিধি। কোরআন-হাদীস থেকে শুরু করে পোস্ট-মডার্নিজম, এমনকি মার্ক্সিজম–সবটাই ছিল তার আলাপের বিষয়। উর্দু আরবি বাংলা ইংরেজি সব ভাষাতেই তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। সেই সাথে বিস্তর তার পড়াশোনা।

অসাধারণ এই মানুষটি গত হয়েছেন বছর কয়েক আগে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা ও সুফিবাদের মানবীয় জীবনদর্শনটি তিনি আমার সামনে উন্মোচন করে দিয়ে গেছেন, দীর্ঘ আলাপের পথ ধরে। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে বিষয়গুলো আমি আরো উপলব্ধি করেছি, অনুপ্রাণিত হয়েছি।

অবশ্য মেডিটেশনের সাথে আমার পরিচয়টা ঘটে আরো আগেই। বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে একটা সময় থাইরয়েডজনিত অসুস্থতার কারণে আমি তীব্র বিষণ্নতায় ভুগছিলাম। সেইসাথে প্রচণ্ড অস্থিরতা, ঘুমাতে পারতাম না। নানারকম ফোবিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তখন হলে থাকতাম, আমার রুমমেটকে দেখতাম মেডিটেশন করছেন। তিনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন। পরে ১৯৯৩ সালে কোয়ান্টামের শিথিলায়ন ক্যাসেট প্রকাশিত হলে ওটা শুনে শুনে মেডিটেশন করতাম।

মেডিটেশন সেই সময়টাতে আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছে। টেনশন-অস্থিরতা-ভয়ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে আমি তখন ঘুমাতে পারছিলাম। সত্যি বলতে কী, ভয়াবহ বিষণ্নতার আগ্রাসন থেকে আমাকে তখন বাঁচিয়ে দিয়েছিল আমার স্ত্রী লেখক-সাংবাদিক শাহ্নাজ মুন্নীর সাহচর্য, আমার কবিতা আর মেডিটেশন। বিষণ্নতা-জয়ের সেই অনুভূতিগুলো নিয়ে আমি কিছু কবিতা লিখেছিলাম, যা পরে সংকলিত হয়েছে আমার *আত্মহত্যার পরিবর্তে এক কাপ চা খাও* কাব্যগ্রন্থে।

আসলে মনের কষ্টের চেয়ে তীব্রতর কষ্ট বোধহয় পৃথিবীতে আর কিছু নেই। শারীরিক কষ্টও একটা পর্যায় পর্যন্ত সহ্য করা চলে, কিন্তু মনটা যদি বিষণ্ন কিংবা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে কোনো কারণে, এর চেয়ে অধিকতর যন্ত্রণা আর কীসে? আমি মনে করি, কোয়ান্টাম এই জায়গাটায় মানুষকে শুশ্রূষা দিচ্ছে, একটা মানসিক নিরাপত্তা যোগাচ্ছে।

মেডিটেশন বিষয়ে আমি বইপত্র-ইন্টারনেটে কিছু পড়াশোনা করেছি।

আমার মনে হয়েছে, কোয়ান্টাম মেডিটেশন পদ্ধতিটি অনেক বেশি পরিকল্পিত ও গোছানো। সবচেয়ে বড় কথা, এখানে মেডিটেশনের সাথে একটি সুন্দর জীবনদর্শন গেঁথে দেয়া হয়েছে। মানুষ এখানে এসে জীবনের একটি সুন্দর অর্থ খুঁজে পায়।

আমাদের তরুণদের অনেকে আজ নানারকম হতাশা-বিষণ্নতায় আক্রান্ত। তারা চায় আনন্দ, কিন্তু আনন্দের বদলে চারপাশে কেবলই বিভ্রান্তি আর উত্তেজনা। আনন্দ আর উত্তেজনা কখনো এক নয়। আনন্দ মানুষকে প্রশান্তি দেয়, চিন্তাশক্তিকে বিকশিত করে। অন্যদিকে, উত্তেজনা তাকে শেষ পর্যন্ত করে তোলে অবসন্ন। যার ফলে তরুণদের একটা অংশ আজ অবসাদগ্রস্ত, হতাশাচ্ছন্ন। এক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও সুস্থ বিনোদনচর্চার পাশাপাশি মেডিটেশন একটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তরুণদের জীবনকে আনন্দময় করে তুলতে পারে মেডিটেশন।

কিছুদিন আগে বান্দরবান লামার কোয়ান্টামম-এ গিয়েছিলাম। দেখেছি, কোয়ান্টাম সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে কী অসাধারণ কাণ্ড ঘটে চলেছে ওখানে। ২০০১ সালে মাত্র সাতটি মুরং শিশুকে নিয়ে যাত্রা শুরু করা কোয়ান্টাম শিশুকাননে এখন একসাথে থাকছে বিচিত্র ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর আট শতাধিক শিশু। যে যার ধর্ম ওরা স্বাধীনভাবে পালন করছে আর গড়ে উঠছে আলোকিত মানুষ হিসেবে।

লামায় একদিন ওদের অভূতপূর্ব প্যারেড দেখছিলাম। ব্যান্ডের তালে তালে যেন মহাকাল এগিয়ে যেতে লাগল আমাদের সামনে দিয়ে। দৃশ্যটা আমাকে এতটাই অভিভূত করেছিল যে, আমি চশমা খুলে বার কয়েক চোখ মুছে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

আর এই লামা-কাণ্ডের ড্রিমার, আর্কিটেক্ট ও ইঞ্জিনিয়ার হলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। আত্মপ্রচারের অশ্লীলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে যিনি প্রবলভাবে আগ্রহী। মনে হলো, ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে পিঁপড়া যেমন নীরবে হেটে চলে, ঠিক তেমনি তিনিও একটি স্বপ্নের মানচিত্র দিয়ে নিমগ্ন সাধকের মতো নিরন্তর হেঁটে যাচ্ছেন।

সবমিলিয়ে লামায় যা দেখলাম তা চেতনার স্থাপত্য যেন। আমার চোখ তৃপ্ত হয়েছে, সঙ্গে মনও তৃপ্ত হয়েছে। দর্শন, সৌন্দর্যবোধ, পরিকল্পনা ও পরিমিতিবোধের মধ্যস্থতায় ওখানে যা গড়ে উঠছে তা অবিশ্বাস্য। খুব ভালো। সত্যিই খুব ভালো।



বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী ড. মো. আজমত উল্লাহ। দীর্ঘ দু-যুগের গবেষণায় তিনি উদ্ভাবন করেছেন বিভিন্ন ফলের একাধিক উন্নত জাত। এছাড়াও তিনি দেশি-বিদেশি নানা সংস্থায় ফল-গবেষক ও প্রশিক্ষক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফল উৎপাদনের বিভিন্ন দিক নিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার পাশাপাশি বর্তমানে তিনি বংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) ফল গবেষণা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এর প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জনাব আজমত উল্লাহ কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৬৯ ব্যাচে সস্ত্রীক অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের ফলভাণ্ডার পুষ্টিবৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ

ড. মো. আজমত উল্লাহ

একটা জার্নাল পড়ছিলাম কিছুদিন আগে। প্রাচীন নেপালের একটা গল্প ছিল তাতে। সবাই জানেন, আগেকার দিনে গ্রামের কবিরাজরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করতেন, ওষুধ দিতেন। তেমনি এক কবিরাজ একটা গ্রামে গেছেন। বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন রোগীর খোঁজে। কিন্তু অসুস্থ কাউকে পেলেন না। কবিরাজ কিছুটা অবাক! পুরো গ্রামে কোনো অসুস্থ মানুষ নেই? সবাই সুস্থ! একপর্যায়ে তিনি দেখতে পেলেন, গ্রামে প্রতিটা বাড়ির পেছনেই একটা করে লেবু গাছ। এতক্ষণে কবিরাজ রহস্যটা বুঝলেন। এবং গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন।

লেবুতে আছে ভিটামিন সি। এর রয়েছে রোগপ্রতিরোধী গুণ। ত্বক সুস্থ ও উজ্জ্বল রাখা এবং তারুণ্য ধরে রাখার ক্ষেত্রেও এটি বিশেষ ভূমিকা রাখে। একজন মানুষের প্রতিদিন ৭৫ মিগ্রা ভিটামিন সি গ্রহণ করা প্রয়োজন। আর একবারে বেশি পরিমাণ গ্রহণ করে একে দেহে মজুদ করে রাখার ব্যবস্থা নেই। কারণ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলেই এটি দেহ থেকে মূত্রের সাথে বেরিয়ে যায়। তাই প্রতিদিনই ভিটামিন সি গ্রহণ করা চাই।

লেবুর চেয়েও ভিটামিন সি বেশি আছে বাতাবি লেবু অর্থাৎ জাম্বুরা (১০০-

১০৫ মিগ্রা/ ১০০ গ্রাম), পেয়ারা (২০০-২০৫ মিগ্রা/ ১০০ গ্রাম) ইত্যাদি ফলে। সবচেয়ে বেশি আছে আমলকিতে (৬০০-৬৫০ মিগ্রা/ ১০০ গ্রাম)। আর এ সবই কিন্তু আমাদের দেশীয় ফল এবং খুব সহজলভ্য।

প্রতিদিনকার খাদ্যতালিকায় আমরা খুব সহজে এসব ফল রাখতে পারি। যদিও কার্বাইড ফরমালিন ইত্যাদি জটিলতায় অনেকেই এখন বেশ ভীত। আসলে এ দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেতে যথাযথ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি চাই কিছু ব্যক্তিগত সতর্কতা ও সচেতনতা।

যেমন, বাতাবি লেবু বা জাম্বুরা। এতে ফরমালিন বা অন্য কোনো রাসায়নিক সচরাচর প্রয়োগ করা হয় না; আর করলেও তা ফলের ভেতরের মূল ভক্ষণযোগ্য অংশে পৌঁছায় না। কারণ এর আবরণটা বেশ পুরু, তাই এটি নিরাপদ। এ ফলটি আরেকটি কারণে বিশেষভাবে উপকারী, এতে রয়েছে ক্যান্সার প্রতিরোধী একটি অ্যালকালয়েড উপাদান *নারিঞ্জিন*, যে-জন্যে এটি কিছুটা তেতো স্বাদযুক্ত।

এছাড়াও আছে কলা। দেশি কলা বা বাংলা কলা হিসেবে যেটি বাজারে পাওয়া যায়, তার আবরণটিও মোটামুটি পুরু। আবার সাগর কলার ক্ষেত্রে বোঁটার দিকটা একটু সবুজাভ হলে বুঝতে হবে, সেটা পাকানো হয়েছে কৃত্রিমভাবে।

আর আম যদি কার্বাইড দিয়ে পাকানো হয় তবে বাইরের রঙটা পাকা ফলের মতো হলেও, কাটলে দেখা যাবে ভেতরটা কাঁচা এবং সাদাটে বর্ণের। এমন হলে এগুলো ফেলে দিতে হবে, কিনলেও খাওয়া যাবে না।

কোন ফল কখন কী অবস্থায় খেতে হবে, সেটা জানাও সমানভাবে জরুরি। যেমন, কদ্‌বেল খেতে হবে পাকা। কাঁচা খেলে গলার স্বর পর্যন্ত বিকৃত হতে পারে। জামও তা-ই, কাঁচা খেলে কারো কারো হজমের গোলমাল ঘটতে পারে।

সার্বিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্যেই আসলে আমাদের সবার প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের ফল খাওয়া উচিত। আমার একজন বন্ধু-সহকর্মী আছেন, তিনি কলার ওপর গবেষণা করছেন। তিনি আবার ধূমপায়ী। আমি তাকে মজা করে বলি, তোমার যেমন প্রতিদিন সিগারেট না হলে চলে না, কলা না খেলে আমারও তেমনি চলে না। তুমি কলা নিয়ে গবেষণা করো, আর আমি কলা খাই। এমনও হয়েছে, রাত ন'টার সময় বাসায় ফিরে দেখি কলা নেই; তখন আবার বের হই কলার খোঁজে।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে গুরুজী আমাদের জাতীয় ফল কাঁঠালের কথা বলেছেন। আমার পিএইচডি গবেষণার বিষয় ছিল কাঁঠাল। সব দিক থেকেই অত্যন্ত পুষ্টিকর এ ফলটি নিয়ে আমার দীর্ঘ গবেষণা রয়েছে, যার ফলাফল বারি কাঁঠাল-১ নামে একটি উন্নত জাতের কাঁঠাল উদ্ভাবন। ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে এ নিয়ে আরো উচ্চতর গবেষণার। সহজে বহনযোগ্য ছোট আকারের সুমিষ্ট কাঁঠালের জাত উদ্ভাবনই এর উদ্দেশ্য।

একজন ফল-গবেষক হিসেবে সুদীর্ঘ কর্মজীবনে আমি এ পর্যন্ত ১৫টি দেশি-বিদেশি ফল নিয়ে গবেষণা করেছি, যার মধ্যে কাঁঠাল পেয়ারা লিচু আম লটকন পানিয়াল কামরাঙা আনারস লেবু কমলা মাল্টা রাম্বুটান ও বিলাতি গাব এবং বাতাবি লেবুর উন্নত জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছি। বাজারে থাই পেয়ারা নামে যে মাঝারি আকারের সুমিষ্ট পেয়ারাটি পাওয়া যায়, সেটি আমার উদ্ভাবিত একটি নতুন জাতের পেয়ারা। বারি পেয়ারা-২।

কর্মজীবনের শুরুতে ২২টি বছর আমি কাটিয়েছি মৌলভীবাজার জেলার আকবরপুরে, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে। সে-সময় বিভিন্ন ধরনের ফলের চাষ ও এর উন্নত জাত উদ্ভাবন নিয়ে গবেষণা ও কাজ চালিয়ে গেছি। নিজের কাজটি নীরবে করে যেতেই আমি পছন্দ করি এবং আমার কাজে আমি আনন্দ পাই। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাই কিছুটা নিভৃতচারী ও প্রচারবিমুখ।

আমি নিজেকে সবসময় কৃষকের একজন বন্ধু বলে মনে করি। গবেষণা ও কাজের সূত্রে দেশের বহু প্রত্যন্ত গ্রামে আমি গিয়েছি। কৃষক, কৃষি বিভাগের কর্মী ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। চেয়েছি আমার গবেষণালব্ধ জ্ঞান তাদের কাছে পৌঁছে দিতে।

এজন্যে ওরা আমাকে ভালবাসে, তাদেরই একজন মনে করে। আমি চিনি না, কোনোদিন দেখাও হয় নি, এমন অনেক সাধারণ কৃষক দেশের দূরদূরান্ত থেকে আমাকে ফোন করে। ফল চাষ করতে গিয়ে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা জানতে চায়। আমি আমার সাধ্যমতো ওদের সাহায্য করতে চেষ্টা করি।

কিছুদিন আগে একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বরিশাল গিয়েছিলাম। দূরের একটি গ্রাম থেকে একজন কৃষক আমার সাথে দেখা করতে এলেন। জানালেন, বছর কয়েক আগে তিনি বাণিজ্যিকভাবে ফল উৎপাদনের উদ্যোগ নেন। সেই সূত্রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফল চাষ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রায়ই আমার কাছ থেকে ফোনে জেনে নিতেন। এভাবে ফল চাষ করে এখন তিনি আগের চেয়ে সচ্ছল ও স্বাবলম্বী। তাই ধন্যবাদ জানাতে এসেছেন।

এমন অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনা আমাকে প্রতিনিয়িত উদ্বুদ্ধ করে ও অনুপ্রেরণা যোগায়। আমার যাবতীয় কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শেষপর্যন্ত একটাই–কৃষককে কৃষি সম্পর্কিত আধুনিক তথ্য-উপাত্ত-জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে যথাসম্ভব উৎপাদন বাড়ানো। আমরা ফলের গুণ আর পুষ্টির কথা বলব, কিন্তু উৎপাদনের কথা যদি না বলি, তবে তো মূল লক্ষ্য অর্থাৎ জাতির পুষ্টিচাহিদা কখনোই পূরণ হবে না; সুস্থ ও বিকশিত জাতি গঠনে যা অত্যন্ত জরুরি।

তাই অন্যান্য কৃষিভিত্তিক উপাদানের পাশাপাশি আমাদের ফলভাণ্ডারের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। সচেতন করে তুলতে হবে সবাইকে। কারণ, নিয়মিত ফল খাওয়া যে কেবল শারীরিক সুস্থতার জন্যেই দরকার, তা নয়; আমাদের সর্বাঙ্গীন মনোদৈহিক সুস্থতা ও বিকাশের জন্যেও এটি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

একজন ফলবিজ্ঞানী হিসেবে বলতে পারি, কোয়ান্টাম মেথড কোর্স আমার কাজে নতুন উদ্যম যোগাবে। কর্মজীবনে আমি নিজেও অনেক প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং নিয়েছি; কিন্তু গুরুজী যেভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, পুষ্টিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি সবকিছুকে সমন্বয় করেছেন তার আলোচনায়, তা অভাবনীয়। আমি যে বিশ্বাস ও লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি, গুরুজীর আলোচনায় দেখেছি তারই প্রতিফলন। গভীর বিশ্বাসে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন–জাতি হিসেবে একটি উন্নততর অবস্থানে পৌঁছানোর সবরকম যোগ্যতাই আমাদের রয়েছে।

আমিও তা-ই বিশ্বাস করি। অনেক দিক থেকেই আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। যেমন, বাংলাদেশের ফলভাণ্ডার পুষ্টিবৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও দারুণ সম্ভাবনাময়। আর সামগ্রিকভাবে কৃষিক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া নীরব বিপ্লব আমাদের এনে দিয়েছে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা।

আমি বিশ্বাস করি, যে দীক্ষা আমি এ কোর্স থেকে পেলাম, তার আলোকে বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অগ্রযাত্রার একজন সৈনিক হিসেবে ভবিষ্যতে আমার দায়িত্বগুলো আরো সুন্দর ও কার্যকরভাবে পালন করতে পারব।



বিশিষ্ট কবি, গীতিকার ও লেখক নাসির আহমেদ। কবিতা গান নাটক উপন্যাস শিশুসাহিত্য ও কলামসহ সাহিত্যের নানা মাধ্যমে তিনি লিখছেন গত চার দশক ধরে। তার রচিত গানগুলো গীত হয়েছে দেশের প্রধান শিল্পীদের কণ্ঠে। সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ তিনি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। পেশায় তিনি একজন সাংবাদিক। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের পরিচালক (বার্তা) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৯০ ব্যাচে অংশ নেন।

বিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তোলে মেডিটেশন

কবি নাসির আহমেদ

আমার শৈশব কেটেছে দ্বীপজেলা ভোলা-র প্রত্যন্ত গ্রামে। ধারেকাছে কোনো স্কুল ছিল না। কয়েক মাইল দূরের আলীনগর প্রাইমারি স্কুলে যেতে হতো কাদামাখা পথ আর খাল পাড়ি দিয়ে। বাবার আয় ছিল সামান্য, তার ওপর সাত ভাইবোন একত্রে পড়াশোনা করতাম। সবমিলিয়ে নানারকম প্রতিকূলতা ছিল নিত্যসঙ্গী।

আজ এই পরিণত বয়সে এসে বুঝতে পারি, সেই দারিদ্র্য আর সংগ্রাম আমাকে জীবনে কষ্টসহিষ্ণু ও আত্মপ্রত্যয়ী হতে সাহায্য করেছে, ফলে পরবর্তীতে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতাগুলোকে আমি জয় করতে পেরেছি।

সে-সময় আমাদের গ্রাম থেকে ঢাকা যেতে লাগত দুদিন। পত্রিকা আসত দু-তিন দিন পরে। চারপাশের চরম অসহায়ত্ব আর কষ্টপীড়িত জীবন দেখে মনে হতো, এ আমার জন্যে নয়। জীবনটাকে বদলাতে হবে। স্বপ্ন দেখতাম, একদিন ঢাকায় যাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করব। বড় কিছু করতে হবে আমাকে।

ভোলা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করে ষাটের দশকে ঢাকায় আসি। ঢাকা তখন ছোট্ট শহর। জগন্নাথ কলেজে বাংলায় অনার্সে ভর্তি হই।

মূলত আর্থিক অনটন ঘোচাতেই পড়াশোনার পাশাপাশি সাংবাদিকতায় যোগ দিয়েছিলাম। *সাপ্তাহিক গণমুক্তি* পত্রিকায় দু শ টাকা বেতনে কাজ শুরু করি।

খ্যাতিমান কবি ও সাহিত্যিক আহসান হাবীব তখন *দৈনিক বাংলা*-য় কর্মরত। এক কবিবন্ধুর মাধ্যমে তার কাছে দুটো কবিতা পাঠালাম। কবিতা দুটো তিনি ছাপলেন। একদিন দেখা করতে বললেন তার সাথে।

গেলাম। বললেন, কবিতা দুটো তার ভালো লেগেছে। গদ্য কেমন লিখি জানতে চাইলেন। তারপর দুটো বই দিয়ে বললেন রিভিউ লিখে নিয়ে যেতে।

সে-রাতেই বই দুটো পড়ে ফেললাম। সকালে রিভিউ লিখে দুপুরে নিয়ে গেলাম কবি আহসান হাবীবের কাছে। তিনি বিস্মিত! বলেই ফেললেন, এ-ও কি সম্ভব? এক রাতের মধ্যে দুটো বই পড়ে তার রিভিউ লিখে আনা?

যা-হোক, লেখা দুটো তার ভালো লাগল। পত্রিকায় ছাপলেন। একসময় তার সস্নেহ আহ্বান ও আমার আগ্রহে সাহিত্য সম্পাদকের সহকারী হিসেবে যোগ দিলাম *দৈনিক বাংলা*-য়। কবি শামসুর রাহমান তখন ওখানে সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।

এভাবে সাংবাদিকতাই হয়ে উঠল আমার পেশা। একসময়, অনার্স সম্পন্ন করার প্রায় ১৩ বছর পর, বিশেষ ব্যবস্থায় ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে, মাস্টার্সের ছাত্র হিসেবে। নিয়মিত ছাত্রদের সাথে পরীক্ষা দিয়ে এবং প্রতিযোগিতা করে আমি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করলাম।

সবাই খুব অবাক হয়েছিলেন এ ঘটনায়। কারণ একে তো পড়াশোনায় দীর্ঘ বিরতি, তার ওপর আমি তখন একসাথে তিনটা চাকরি করি।

আসলে এর পেছনে ছিল আমার একটা জেদ। মাস্টার্স করি নি বলে যারা চাকরিতে আমার পদোন্নতি আটকে রেখেছিল, তারা দেখুক আমি কী পারি! আসলে আমার জীবনে আঘাত, উপেক্ষা, অপমানগুলোর কাছে আমি ভীষণ ঋণী। এগুলোই আমাকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে সবসময়।

কেউ আঘাত পেয়ে আত্মহত্যা কিংবা ধ্বংসের পথ বেছে নেয়। একই আঘাতে কেউ জেদের বশে জীবনকে আরো বিকশিত করে। আরো আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। আমি তা-ই করতে চেয়েছি।

এ বিশ্বাসেরই অনুরণন আমি অনুভব করলাম কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে। চারটি দিন মন্ত্রমুগ্ধের মতো এখানে কাটিয়ে মনে হয়েছে, এ সত্যিই এক আনন্দজগত!

গুরুজী কী এক অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটাচ্ছেন চারপাশের মানুষের মধ্যে। ২০১৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীরা

ঢাকা স্টেডিয়ামে যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করল, তা সবাই দেখেছে টিভিতে কিংবা ভিডিও-তে। পেশাগত দায়িত্বের কারণে আমার সেটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে মাঠে বসে, খুব কাছ থেকে।

দেখেছি, কী গভীর প্রত্যয়, বিশ্বাস আর উদ্যম ওদের চোখেমুখে, দেহভঙ্গিতে। দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে দুর্গম অঞ্চলের এই শিশুরাই দৃপ্ত পদক্ষেপে প্রথম স্থান অধিকার করে নিল!

আমি বিশ্বাস করি, সৃশৃঙ্খল বিকাশের পাশাপাশি মেডিটেশনের নিমগ্নতাই ওদের দিয়েছে এমন গভীর প্রত্যয় আর বিশ্বাস। জীবনের যে-কোনো পর্যায়ে, যে-কোনো অর্জনের জন্যে চাই এ নিমগ্নতা। এটি মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তোলে।

আধুনিক বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার, সেটি এসেছে এ নিমগ্নতার পথ ধরেই। কোরআনও তা-ই। রসুল (স) লোকালয় ছেড়ে হেরা পাহাড়ে কেন গেলেন? গিয়েছিলেন একটা নৈঃশব্দ্যময় জগতের সন্ধানে, যেখানে তিনি এক গভীরতর নিমগ্নতায় স্রষ্টার বাণী অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

সুফিরাও এই আত্মনিমগ্নতার কথা বলেছেন। সুফিজম নিয়ে আমি কিছু পড়াশোনা করেছি। এর শাশ্বত কল্যাণকর শিক্ষাগুলোই ভিন্ন আঙ্গিকে এবং আধুনিক ভাষায় ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুজী আমাদের বলছেন। এটি মানবসভ্যতাকে জাগিয়ে দেয়ার কাজ।

জীবনের শুরু থেকে আমি একজন আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ হলেও মাঝখানে স্পন্ডিলাইটিস, লিভার সিরোসিস এবং পর পর তিন বার হার্ট অ্যাটাকে মানসিক শক্তি কিছুটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে সেই শক্তিটা আমি আবার ফিরে পেলাম। এছাড়াও ঘুম হতো না, ডান হাতটা ওপরে তুলতে পারতাম না ইত্যাদি কিছু অসুবিধা ছিল। এখন হাত ওপরে তুলতে পারছি। আর প্রথমদিন থেকেই বেশ ভালো ঘুম হচ্ছে। এতদিন নামাজ পড়তাম চেয়ারে বসে, এখন সেজদা দিয়ে নামাজ পড়ছি! এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা! প্রতিটা মুহূর্ত আমি এখানে উপভোগ করেছি।

কোয়ান্টাম মেথডকে আরো ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ইংরেজি ফরাসি-সহ বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষায় এ কথাগুলো অনূদিত হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তাতে পৃথিবীজুড়ে আরো বেশি মানুষ এ থেকে কল্যাণ ও নিরাময় লাভ করতে পারবে। আর গুরুজীর এ শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে দেশের ১৭ কোটি মানুষকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব।



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের অক্লান্ত কর্মোদ্যমী সদস্য ইঞ্জিনিয়ার তৈয়বুর রহমান। বার্ধক্যকে জয় করে অবসর-পরবর্তী জীবন তিনি যাপন করছেন একের পর এক নতুন নতুন কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩০৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

অবসরের পর হয়ে উঠেছি আরো কর্মব্যস্ত

ইঞ্জিনিয়ার তৈয়বুর রহমান

সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৩৪ বছর সুনামের সাথে চাকরি করেছেন তিনি। অতঃপর ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের (বিসিআইসি) ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। সফল পেশাজীবন নিঃসন্দেহে। গল্পটা শেষ হতে পারত এখানেই। কিন্তু গল্পটা যে ইঞ্জিনিয়ার তৈয়বুর রহমানের–বয়স এখন যার ৭৯। অন্যরকম গল্পের শুরুটা তাই এখান থেকেই।

অন্য আর দশজনের মতো অবসরের পর ঝিমিয়ে পড়েন নি তৈয়বুর রহমান; বরং আরো কর্মব্যস্ত ও উদ্যমী হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিংবা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন গত ২১ বছর ধরে। একটি দিনের জন্যেও তাকে কর্মহীন থাকতে হয় নি। বর্তমানে তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ (আইআইবি)-এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি বোর্ডের সচিব এবং একই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সম্প্রতি বিদেশ থেকে সার আমদানি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে তিনি সাভারে একটি মিশ্র সার কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন।

জীবনের শুরু থেকে তৈয়বুর রহমান একজন কর্মোদ্যমী মানুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর যোগ দেন পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থায়। ১৯৬০ সালে জাপানে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে তরুণ এই প্রকৌশলী লক্ষ করেন, সে দেশের শিল্প কারখানাগুলোতে সম্ভাব্য যে-কোনো দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উন্নত নিরাপত্তা পরিকল্পনা রয়েছে। অথচ তখন পর্যন্ত আমাদের দেশে এসব ব্যাপারে ন্যূনতম প্রস্তুতি তো দূরের কথা, কোনো ধরনের নিরাপত্তা নীতিমালাই ছিল না। দেশে ফিরে তিনি অকুপেশনাল সেফটি বোর্ড গঠনের জন্যে সরকারের কাছে সুপারিশ করেন।

অবশেষে ১৯৭০ সালে তৎকালীন সরকার তার প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তিনি ন্যাশনাল সেফটি কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা-সচিব পদে নিয়োগ লাভ করেন। শিল্প কারখানায় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দীর্ঘ পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতা তাকে এক্ষেত্রে দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় ও প্রথমসারির বিশেষজ্ঞে পরিণত করেছে।

১৯৩৭ সালে জন্ম নেয়া তৈয়বুর রহমানের বয়স এখন আশি ছুঁই ছুঁই, কিন্তু এখনো যে-কোনো কাজে তিনি তারুণ্যের উদ্দীপনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন, এ বয়সেও তার সুস্থতা আর বহুমুখী কর্মোদ্যমের নেপথ্যে কোয়ান্টাম মেথডের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আইআইবি-র একজন সতীর্থ-সদস্যের অনুপ্রেরণায় তিনি ২০১০ সালে কোয়ান্টাম মেথড ৩০৯ ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন। এরপর থেকে প্রতিটি কোর্স রিজুভিনেশন, জালালি, আলোকায়ন, সাদাকায়নসহ সব কার্যক্রমে তার সহাস্য উপস্থিতি প্রায় অনিবার্য।

ফাউন্ডেশনের হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম 'কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব'-এরও তিনি একজন সক্রিয় সদস্য।

মেডিটেশন ও নিত্যদিন হাঁটার পাশাপাশি সর্বতোভাবে অনুসরণ করেন সুস্থ জীবন-অভ্যাস। তাই-তো তিন-চারতলা পর্যন্ত ওঠানামার জন্যে এখনো লিফটে চড়েন না তিনি, স্বচ্ছন্দে সিঁড়ি ব্যবহার করেন। আর স্বপ্ন দেখেন মানুষের জন্যে আরো আরো কাজ করার। করেন নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা।



গলফার সিদ্দিকুর রহমান। গলফের বিশ্ব আসরে নিজেকে এবং সেইসাথে নিজের দেশকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন তিনি। বাংলাদেশ থেকে একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে তিনিই প্রথম অংশ নিয়েছেন এশিয়ান গলফ ট্যুর ও গলফ বিশ্বকাপে। দেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান এই গলফার কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৮৭ ব্যাচে অংশ নেন।

এ আত্মবিশ্বাস আমাকে বহুদূর এগিয়ে নেবে

সিদ্দিকুর রহমান

আমরা তখন থাকতাম ঢাকার অদূরে ধামালকোটে। নিত্য-অভাবের সংসার। স্কুল থেকে ফিরে অধিকাংশ দিনই দেখতাম ঘরে কোনো খাবার নেই। একে তো এই অবস্থা, তার ওপর বাবার দিনরাত একটাই দুশ্চিন্তা–এলাকাটা তখন সন্ত্রাস আর মাদকের জন্যে কুখ্যাত, কুসঙ্গে পড়ে আবার বখে না যাই!

এর মধ্যে একদিন পাশের বাড়ির একটি ছেলে আমাকে ডেকে নিয়ে যায় কুর্মিটোলার সেনাবাহিনী গলফ ক্লাবে। জানা গেল, ওখানে 'বল বয়' হিসেবে কাজ করলে কিছু উপার্জন হতে পারে।

সেনা অফিসার আর শৌখিন গলফাররা খেলতেন ওখানে। দূরদূরান্ত থেকে বল কুড়িয়ে দিনে ৩০ টাকার মতো পাওয়া যেত। নিজের পড়াশোনার খরচ চালানোর পাশাপাশি তা দিয়ে পরিবারকেও সাধ্যমতো সহযোগিতা করার চেষ্টা করতাম। আমার বয়স তখন আট বছর। পড়ি ক্লাস টু-তে।

তখন ভাবতাম আরেকটু বড় হলে 'ক্যাডি' (খেলোয়াড়দের গলফ স্টিক এবং অন্যান্য সরঞ্জাম বহনকারী) হতে পারব, উপার্জন কিছুটা বাড়বে। কিন্তু কাজটা খুব সহজ ছিল না, ১৮/২০ কেজি ওজনের একেকটা ব্যাগ নিয়ে খেলোয়াড়দের সাথে গলফ মাঠে হেঁটে বেড়ানো বেশ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার।

এর পাশাপাশি অবসরে মাঝেমধ্যে গলফ খেলতাম। আনন্দের জন্যেই খেলতাম। এভাবেই খেলাটা একসময় খুব ভালো লেগে গেল। কিন্তু গলফ খেলতে যে টাকা লাগে অনেক! দামি জুতা আর গলফ স্টিক কিনে দেয়ার সামর্থ্য তো আমার বাবার নেই। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি এলো। লোহালক্কড় ঝালাইয়ের দোকানে গিয়ে লোহার রড দিয়ে কোনোরকম একটা স্টিক তৈরি করলাম, ওটা দিয়েই শুরু হলো আমার গলফ প্র্যাকটিস।

১৯৯৯ সালে একটি সুযোগ আসে আমাদের জন্যে। তৎকালীন সেনাপ্রধান ও গলফ ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের উদ্যোগে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলো থেকে আসা বল বয় আর ক্যাডিদের নিয়ে একটি গলফ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। একশ জনের মধ্যে তাতে প্রথম হই আমি।

এভাবেই শুরু। একসময় জাতীয় দলে সুযোগ পাই। মন-প্রাণ দিয়ে অনুশীলন শুরু করি। অনেকে ভেবেছিল, আমি খুব বেশিদূর যেতে পারব না। কারণ আমার উচ্চতা কম। কিন্তু অনুশীলনে আমার একাগ্রতা দেখে কোচ বাবু আহমেদ স্যার বিশ্বাস করতেন, ভালো করলে আমার পক্ষেই সম্ভব। অনুশীলন শুরু হতো সকাল আটটায়। কেউ আসত সকাল ন-টায়, কিংবা তারও পরে। আমি মাঠে উপস্থিত হতাম সকাল সাড়ে সাতটায়।

কঠোর অনুশীলনের পথ ধরে একসময় দেখা মেলে আরো বড় সাফল্যের। পরবর্তী সাত বছরে দেশে ও বিদেশে অপেশাদার গলফের একে একে ১২টি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন এবং ১৮টি-তে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি। ২০০৯ সালে পেশাদার গলফের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আসর এশিয়ান ট্যুরে কোয়ালিফাই করি। বাংলাদেশ থেকে আমিই প্রথম এ সুযোগ পাই।

পরের বছর অর্থাৎ ২০১০ সালে ব্রুনেই ওপেন-এ অংশ নিই এবং ২০টিরও বেশি দেশের খেলোয়াড়দের সাথে প্রতিযোগিতা করে চ্যাম্পিয়ন হই। ওটা ছিল আমার টার্নিং পয়েন্ট। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ব গলফ আসরে সম্মানজনক অবস্থান লাভ করে বাংলাদেশ। পরবর্তীতে গলফের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আসর ২০১৩ সালে 'হিরো ইন্ডিয়া ওপেনে' চ্যাম্পিয়ন হই।

তারও আগে থেকেই আমার একটাই স্বপ্ন–একদিন বিশ্বকাপে যাব। টাইগার উডস-সহ বিশ্বসেরা গলফারদের সাথে খেলব। তখন বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়া যেত দলগত পারফরমেন্সের ভিত্তিতে। আমার নিজের তা ছিল, কিন্তু দলগত নৈপুণ্যের অভাবে সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল বার বার।

২০১৩ সালে নিয়মটা পাল্টে গেল। খেলোয়াড় নিজস্ব পয়েন্টের ভিত্তিতে বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারবে। এবার আমার সুযোগ ঘটে গেল। বাংলাদেশ

থেকে প্রথমবারের মতো আমি গলফ বিশ্বকাপে অংশ নিই। আসলে জীবনে যে-কোনো ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্যে লক্ষ্যটা সুস্পষ্ট থাকতে হবে। এ চাওয়াটা হতে হবে সৎ। অধিকাংশ মানুষের লক্ষ্যটা নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। প্র্যাকটিস করছে তো করছেই, কেন করছে নিজেও হয়তো জানে না।

এছাড়াও সব কাজেরই একটা ব্যাকরণ আছে, মৌলিক কিছু নিয়ম আছে। গলফের ক্ষেত্রেও আমি এখনো সেটাই আয়ত্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ক্রমাগত এ চেষ্টার সাথে চাই একাগ্র মনোযোগে নিজের কাজটি করে যাওয়া।

আশ্চর্য মনে হলেও সত্যি, গত ১৮ বছরে আমি দেশে কিংবা বিদেশে কোথাও বেড়াতে যাই নি। দেশে থাকলে বাসা থেকে গলফ কোর্ট আর গলফ কোর্ট থেকে বাসা। আর দেশের বাইরে খেলতে গেলে হোটেল থেকে গলফ কোর্ট, আবার গলফ কোর্ট থেকে হোটেল। প্রতিদিন ১২/১৪ ঘণ্টা প্র্যাকটিস করেছি। ঘুমে-জাগরণে সবসময়ই আমার সারা চেতনা জুড়ে ছিল গলফ।

আমার সাফল্যের পথটা একেবারে নিষ্কণ্টক ছিল না। ব্রুনেই ওপেনের আগের সময়টাতে আমার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যেতে বসেছিল প্রায়। এশিয়ান ট্যুরে অংশ নিতে গিয়ে আগের দু-বছরে আমার সমস্ত জমানো টাকা শেষ। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল এভাবে আর চলতে পারে না।

তখন সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাকে জেতার জন্যে খেলতে হবে। গলফে টিকে থাকতে হলে এবার সামনে যাওয়া ছাড়া আর পথ নেই। রক্ষণাত্মক ভঙ্গি পাল্টে আক্রমণাত্মক খেলতে শুরু করলাম। গতি বেড়ে গেল। আমি শিরোপা জিতলাম সে টুর্নামেন্টে। আত্মবিশ্বাসও বেড়ে গেল বহুগুণ।

সেই আত্মবিশ্বাসটাই আবার নতুন করে ফিরে পেলাম কোয়ান্টামে এসে। ২০১৪-তে ভারতে অনুষ্ঠিত একটা টুর্নামেন্টে আমার পারফরমেন্স খুব একটা ভালো হয় নি। মনে হচ্ছিল, এটা একটা দুর্যোগ। কোর্সে গুরুজীর কথা শুনে ও মেডিটেশন করে আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলে গেছে। এখন মনে হচ্ছে, ওটা ছিল আমার জন্যে শিক্ষা। ইতিবাচকভাবে ভাবতে পারছি পুরো বিষয়টা।

এছাড়াও সম্প্রতি একটা ইনজুরির শিকার হয়েছি। অনেক চিকিৎসা নিয়েছি, তবু ব্যাকপেইনের জন্যে একঘণ্টার বেশি বসে থাকতে পারতাম না। কিন্তু কোর্সে প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা ধরে বসে ছিলাম। ব্যথাটাই এখন আর অনুভব করছি না। সবমিলিয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি যে, আমি কোয়ান্টামে আসতে পেরেছি। গুরুজীর প্রতিটি কথায় আমি আমার শক্তিটা অনুভব করেছি। উপভোগ করেছি কোর্সের প্রতিটা মুহূর্ত। বিশ্বাস করি, এ শক্তি ও আত্মবিশ্বাস আমাকে আরো বহুদূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।



আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান ও সুপরিচিত বাংলাদেশি জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী ড. রুবাব খান। সম্প্রতি মহাকাশে সূর্যের চেয়েও অতিকায় পাঁচটি তারকার (সুপারস্টার) অস্তিত্ব আবিষ্কারকারী দলের নেতৃত্ব দেন তিনি। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'নাসা'-র গোডার্ড ফ্লাইট সেন্টারে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে কর্মরত আছেন। রুবাব খান কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৪২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

মনছবিই আমাকে দিয়েছে আজকের এ সাফল্য

ড. রুবাব খান

৬ জানুয়ারি ২০১৬। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির ২২৭ তম বার্ষিক সভা। বাঘা বাঘা সব মহাকাশ বিজ্ঞানীরা হাজির। একপর্যায়ে মঞ্চে উঠলেন এক তরুণ গবেষক। তিনি ঘোষণা দিলেন, তার দল মহাকাশে নতুন পাঁচটি সুপারস্টার বা অতিতারকার অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজে পেয়েছে! যার মধ্য দিয়ে প্রায় পৌনে দুশ বছরের পুরনো একটি মহাজাগতিক সমস্যার সমাধান মিলল। চমকে উঠলেন সবাই। পৃথিবীজুড়ে বিজ্ঞানীদের মাঝে হইচই পড়ে গেল। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এত বড় সাফল্যের আর কোনো নজির নেই।

এ সাফল্য বাংলাদেশেরও সাফল্য। কারণ, তিনি এ দেশেরই সন্তান। তার নাম ড. রুবাব মো. ইমরোজ খান সৌরভ। তার এই বিরল কৃতিত্ব কোয়ান্টাম পরিবারের জন্যেও অত্যন্ত আনন্দের। তিনি একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট।

ফিরে যাওয়া যাক ২০ বছর আগে। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৪২ তম ব্যাচে অংশ নিতে এসেছে ক্লাস সিক্সে পড়ুয়া দুরন্ত কিশোর রুবাব। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি তার দুর্নিবার আকর্ষণ। অত্যন্ত মেধাবী হলেও তার দুরন্তপনা ও জেদী মনোভাবের কারণে তাকে নিয়ে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

কোর্সের দ্বিতীয় দিনে গুরুজীর দিক-নির্দেশনামূলক আলোচনা শুনে ও

মনছবির মেডিটেশন করে সে তার লক্ষ্য ঠিক করে ফেলল। গ্রহ-নক্ষত্রই যেহেতু তার ভালবাসা, ভবিষ্যতে সে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে পড়বে। আর দশটা কিশোরের সাথে এই কিশোরটির তফাত এখানেই। জীবনের একেবারে শুরুতে সে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল–সে কী করতে চায়। সেই থেকে প্রতিটি মুহূর্তে সে তার লক্ষ্যে অবিচল থেকেছে। কারণ, জীবনের লক্ষ্য যদি থাকে স্পষ্ট তবে আপাত অনেক অসম্ভবও যে সম্ভব হতে পারে।

সেদিন যে কিশোর স্বপ্ন দেখেছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানী হবার, তিনিই আজকের ড. রুবাব। কাজ করছেন পৃথিবীখ্যাত মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার গোডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারে। মনছবি গাইডেড মিসাইলের মতো লক্ষ্যভেদ করে, তিনি তা আরেকবার প্রমাণ করলেন। তার মহাকাশ জয়ের সাফল্যগাথা আসলে লক্ষ্য অর্জনে নিবেদিত একজন মানুষের বৃত্ত ভাঙার গল্প।

সন্তানকে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে ভর্তি করার যে বৃত্তে আমাদের দেশের অভিভাবকরা বন্দি, তারই উল্টো স্রোতে পা বাড়ান রুবাবের মা-বাবা। রুবাব বরাবরই বাংলা মাধ্যমে পড়ালেখা করেছেন। অনেকেই তাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেছে এই বলে যে, বাংলা মাধ্যম থেকে পড়াশোনা করে আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে বিদেশে স্কলারশিপ পাওয়া যায় না। এর আগে কেউ পায় নি। কিন্তু রুবাব এসব নেতিবাচক কথায় প্রভাবিত হন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আগে কেউ পায় নি তাতে কি? আমাকে দিয়েই শুরু হবে।

ঢাকার উদয়ন স্কুল থেকে এসএসসি ও নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি-তে ভালো ফলাফল করে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে তিনি ভর্তি হন যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে। সে বছর ছয় জন বিদেশি শিক্ষার্থী ফুল স্কলারশিপ পেয়েছিল। যাদের একজন ছিলেন রুবাব। বিস্ময় এখানে নয়। অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে তার ব্যাচে একমাত্র তিনিই পেয়েছিলেন ডিপার্টমেন্টাল অনার্স। তার এই সাফল্যের অন্যতম কারণ, আন্ডার-গ্রাজুয়েট ছাত্র থাকাকালীন ৫০০ গবেষকের নামের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় তার নাম। গ্রাজুয়েশন শেষ করার পর রুবাব মনছবি করলেন– 'এবার আমাকে নয়, বরং আমিই বেছে নেব পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়।'

তার রেজাল্টের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় তাকে আমন্ত্রণ জানাল। তাদের নিজস্ব উদ্যোগে ক্যাম্পাস ঘুরে তিনি বেছে নিলেন ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি-কে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী হবার মনছবি দেখার ১৬ বছর পর তা বাস্তবে পরিণত হলো। ২০১৪ সালে ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাস্ট্রোনমিতে তিনি পিএইচডি সম্পন্ন করেন। অধিকাংশ মানুষ

সাধারণত তাদের পিএইচডি থিসিস মা-বাবাকে উৎসর্গ করেন। কিন্তু রুবাব উৎসর্গ করলেন তার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে।

২০১৪-তে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে তিনি যোগদান করেন নাসায়। পরবর্তী প্রজন্মের মহাকাশ পরিদর্শক জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন ড. রুবাব ও তার দল। তাদের মূল কাজ ছিল হাবল, স্পিটজার ও হার্শেল এই তিনটি টেলিস্কোপ থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে মহাকাশে নতুন সুপারস্টার বা বিশালাকার তারার অস্তিত্ব খুঁজে বের করা।

অতিতারকা আসলে কী? পৃথিবীসহ মোট নয়টি গ্রহ নিয়ে গঠিত আমাদের সৌরমণ্ডলে সূর্যই একমাত্র নক্ষত্র। অথচ আমরা যে গ্যালাক্সিতে বাস করি, তাতে রয়েছে অন্তত ৪০ হাজার কোটি নক্ষত্র। আর এই বিশাল গ্যালাক্সিতে এমন একটি সৌরমণ্ডল রয়েছে যার আছে দুটি অতিকায় নক্ষত্র। তার একটি সূর্যের চেয়ে নব্বই গুণ বড়, আরেকটি ৩০ গুণ।

এই সৌরমণ্ডলের নাম 'ইটা কারিনা'। এটি পৃথিবী থেকে ১০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এবং সূর্যের চেয়ে প্রায় ৫০ লক্ষ গুণ বেশি উজ্জ্বল। ১৮৩৮ সালে রহস্যময় এক বিস্ফোরণে ইটা কারিনা থেকে সূর্যের চেয়ে ১০ গুণ বেশি শক্তি নির্গত হয়। এই বিস্ফোরণ কেন হয়েছিল বিজ্ঞানীরা তা এতদিন উদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি। কারণ এটি বুঝতে হলে প্রয়োজন অনুরূপ নক্ষত্র নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা। ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দুবছর সাতটি গ্যালাক্সিতে অনুসন্ধান চালিয়েও নাসার একদল বিজ্ঞানী দ্বিতীয় কোনো অতিতারকা খুঁজে পান নি।

তাই এবার একসাথে পাঁচ পাঁচটি সুপারস্টার বা অতিতারকা আবিষ্কারের ঘোষণা বিজ্ঞানের জগতে শোরগোল ফেলে দিয়েছে বেশ জোরেশোরেই। নাসার বিজ্ঞানীরা তো বটেই পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা উচ্ছ্বসিত ভাষায় অভিনন্দন জানিয়েছেন ড. রুবাব ও তার দলকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম ফলাও করে প্রচার করে এই আবিষ্কারের খবর। এর মাঝে ডিসকভারি নিউজ, দি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস টাইমস, দি স্কাই এন্ড টেলিস্কোপ ও অ্যাস্ট্রোনমি ম্যাগাজিন অন্যতম।

সদ্য আবিষ্কৃত অতিতারকাগুলোর অবস্থান পৃথিবী থেকে দুই কোটি ৬০ লাখ আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যে। নতুন নক্ষত্রগুলোকে 'ইটা কারিনার যমজ' হিসেবেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ড. রুবাব ও তার দল। বিশ্বের প্রথম সারির জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই আবিষ্কার মহাকাশ গবেষণায় নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।

ড. রুবাব খান বলেন, 'ইটা কারিনার মতো অতিতারকা সবসময়ই দুর্লভ। যে গ্যালাক্সিতে এদের অবস্থান, তার রাসায়নিক ও ভৌত বিবর্তনে অতিতারকার ভূমিকা অপরিসীম। আমরা শুরুতে আশা করেছিলাম, একটি অতিতারকার সন্ধান হয়তো পেতে পারি। কিন্তু পরবর্তীতে একাধিক অতিতারকার খোঁজ পেলাম। তবে একসাথে পাঁচটি সুপার স্টারের সন্ধান পাওয়ায় আমরা সত্যিই বিস্মিত।'

ড. রুবাব খানের মতোই বিস্মিত দুনিয়ার জাঁদরেল মহাকাশবিজ্ঞানীরাও। তবে প্রতিটি সাফল্যের পেছনেই থাকে কঠোর নিরলস পরিশ্রম আর নীরব সাধনা। রুবাব খানের ভাষায়, 'যেদিন আমি সফল হচ্ছি সেদিন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া অনেক সহজ, কিন্তু যখন ব্যর্থতা আসে তখনো একই উদ্যম নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া অনেক কঠিন। মেডিটেশন সেখানেই আমাদেরকে শক্তি দেয়, উদ্যম জোগায়। আমার জীবনে মেডিটেশনের সবচেয়ে বড় প্রভাব এখানেই। বিদেশে পরিবার, বন্ধুবান্ধব সবার কাছ থেকে দূরে গিয়ে একদম একা হয়ে গেলে কাজে সফল হওয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে একই লক্ষ্যে স্থির থেকে যে আমি কাজ করে যেতে পারছি, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রতি, গুরুজীর প্রতি।'

পরিবারের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন সাহস যুগিয়েছে ড. রুবাবকে লক্ষ্যপানে অটল থাকতে। তার পরিবারকে বলা যেতে পারে একটি কোয়ান্টাম পরিবার। তার মা-বাবা, বোন ও স্ত্রী সবাই কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। বাবা ড. নূরুর রহমান খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ও সংস্কৃত বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মা সেন্ট্রাল উইমেন্'স ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন অধ্যাপক ফিক্‌রিয়া বেগম। একমাত্র বোন সুমাইয়া ফারাহ্ খান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণারত। তার স্ত্রী ফাইজা ফারিয়া খান ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এমবিবিএস পাশ করে এখন আমেরিকাতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন মেডিকেল লাইসেন্সিং এক্সামিনেশনের জন্যে।

ড. রুবাব মো. ইমরোজ খানের গবেষণা কপাট খুলে দিক মহাকাশের আরো অনেক অজানা রহস্যের। তাকে দেখে অনুপ্রাণিত হোক এদেশের নতুন প্রজন্ম। বেরিয়ে পড়ুক বিশ্বজয়ের অভিযাত্রায়। কোয়ান্টাম পরিবারের এই কৃতী সদস্যকে আমাদের অভিনন্দন।

মানুষ বদলে যাচ্ছে।
হতাশা বিষণ্নতা নেতিবাচকতার মতো
আত্মঘাতী সব আবেগের শৃঙ্খল ভেঙে
বিশ্বাস ও উদ্যমের শক্তিতে জেগে
উঠছে চারপাশের লক্ষ মানুষ।
ধ্যান ও ইতিবাচকতার পথ ধরে
ব্যক্তিমানুষের এ পরিবর্তনই ক্রমশ
ছড়িয়ে পড়ছে সমাজ ও দেশে।
যার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে
আমাদের জাতিগত পরিবর্তনের
শুভসম্ভাবনা।

প্রিয় সুহৃদ!
মানুষ বদলাচ্ছে, জাতি বদলাচ্ছে।
আপনি কেন পিছিয়ে থাকবেন?
জীবন বদলের এ অনন্য অভিযাত্রায়
আপনাকে স্বাগতম।
লাখো মানুষের মতো
আপনিও বলে উঠুন–
সারা পৃথিবী আমার।
যেখানে দরকার সেখানে যাব।
যা প্রয়োজন তা-ই নেব।
যা চাই তা-ই পাব।
আমি পারি আমি করব।



আধুনিক মানুষের জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম।
সঠিক জীবনদৃষ্টি প্রয়োগ করে মেধা ও প্রতিভার পরিপূর্ণ
বিকাশের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে অনন্য মানুষে রূপান্তরিত
করাই এর লক্ষ্য। স্ব–উদ্যোগ, স্ব–পরিকল্পনা ও স্ব–অর্থায়নে
সৃষ্টির সেবায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করে বাংলাদেশকে বিশ্বের
নেতৃস্থানীয় জাতিতে রূপান্তরিত করাই এর মনছবি।
দু–যুগের এ অক্লান্ত সাফল্যযাত্রায় অনুষ্ঠিত হয়েছে
কোয়ান্টাম মেথডের ৪০০টি কোর্স! দেশ কালের সীমানা ছাড়িয়ে
মেডিটেশনের বিশ্ব–ইতিহাসেও এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা।
কোয়ান্টাম মেথড অনুশীলন করে সমাজের সর্বস্তরের
লাখো মানুষ অশান্তিকে প্রশান্তিতে, রোগকে সুস্থতায়,
ব্যর্থতাকে সাফল্যে, অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন।
কোয়ান্টাম চর্চার মাধ্যমে আপনিও বদলে দিতে পারেন
আপনার জীবন।